আত্ম-শুদ্ধি বিষয়ে সাড়াজাগানো ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার
রিক্লেইম
ইয়োর
হার্ট
ইয়াসমিন মুজাহিদ
আত্ম-শুদ্ধি অর্জনে বাস্তবসম্মত ও যুগান্তকারী নির্দেশনা

রিক্লেইম ইয়োর হার্ট *(আত্মার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিন)*

মূল রচনা: ইয়াসমিন মুজাহিদ; বাংলা অনুবাদ: এহসানুল কবীর ও ইমদাদ খান; সম্পাদনা: এহসানুল কবীর; প্রকাশক: মুহাম্মদ মামুন বেপারী।

আইএসবিএন নং: ৯৭৮-৯৮৪-৯৪২৫৮-৩-০;

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০২০, মাঘ-১৪২৬, জমাদিউস সানি-১৪৪১।

প্রকাশনায় : মুসলিম ভিলেজ
(২২৯, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫,
Email: mvillagebd@gmail.com,
মোবাইল: ০১৭১১১৭৮৩১৪, ০১৯১৫২২১৯৭৫)।

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদ্রাসা মার্কেট),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৯৯৮৪২১৫০৫

মুদ্রণ: মদিনা প্রিন্টার্স।
মূল্য: ৩৫০ টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক: www.muslimvillagebd.com
/Muslimvillagebd

মহাকাল রকমারি.com বইবাজার.com অন্যরকম প্রকাশনী

Bangla translation of "Reclaim Your Heart" by Yasmin Mogahed. Translated by Ahsanul Kabir & Emdad khan, Edited by Ahsanul Kabir, Cover designed & Published by Muhammad Mamun Bpari, Under the Publication "Muslim Village".

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

পুস্তক পরিচিতি:

Reclaim Your Heart পাশ্চাত্যে একটি বেস্ট সেলার বই। সেখানে এর বহু অনুমোদিত এবং অনুনোমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি অনূদিতও হয়েছে বহু ভাষায়। এটি মূলতঃ ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে লিখিত মোটিভেশনাল বা *Self- help* ধাচের একটি বই। তবে এতটুকুনের মধ্যে এর পরিচিতি সীমাবদ্ধ রাখাটা বইটির প্রতি অবিচার করা হবে। এর আবেদন আরও ব্যাপক। এটি তার পাঠককে সমকালীন প্রেক্ষাপটে জীবন সম্পর্কে ইসলামের শ্বাশত শিক্ষার সাথে পরিচিত করে। পাঠককে আত্মজিজ্ঞাসায় ও নিজ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে।

মূলতঃ পাশ্চাত্য পরিবেশে একজন মুসলিম মহিলা কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন, কি তার কারণ এবং তার সমাধানই বা কি- এ মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তরের খোঁজেই এ বই লেখা। পাশ্চাত্য পেক্ষাপটে লেখা হলেও এ বইয়ের আবেদন সার্বজনীন। সব সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষের জন্যই এ বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। সবাই এ বই হতে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি।

বস্তুবাদ ও সেক্যুলার চিন্তাধারা বর্তমান সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সৃষ্টি করেছে আত্মিক শূন্যতা। যে শূন্যতার কারণে মানুষ ছুটছে ভোগবাদীতার পেছনে। নিজের জীবনকে নিত্য-নতুন খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ফার্নিচার, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, ঘুরে-বেড়ানো ইত্যাদি দিয়ে ভরে তুলতে চাইছে। চাইছে গান-বাজনা, কনসার্ট, খেলা–ধুলা, পার্টি-ফুর্তি ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। কিন্তু আত্মার এই শূন্যতা বৈষয়িক কোনো জিনিস দিয়ে পূরণ হওয়ার নয়। কারণ সৃষ্টি লগ্নেই সে তার মূল মালিকের আনুগত্যের সাক্ষী দিয়ে এসেছে। তাই যতক্ষণ না সে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করছে, ততক্ষণ সে প্রশান্তি লাভ করে না।

একইরকম আরেকটি চিন্তার বিষয় হলো জীবনধারা পরিবর্তনে তাড়াহুড়ার প্রবণতা। অনেকেই ভোগবাদী জীবনে হতাশ হয়ে দ্বীনদারীর দিকে ফিরে আসেন। কিন্তু সহসাই গোটা জীবনকে পরিবর্তন করে ফেলতে চান। কিন্তু তা বাস্তব সম্মত নয়। ফলে বিপুল উৎসাহে নামাজ, হিজাব ইত্যাদি আমল শুরু করলেও তা ধরে রাখতে পারেন না। শয়তান তাকে নতুন হতাশায় নিমজ্জিত করে। একপর্যায়ে তাদের অনেকেই প্রচলিত স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন।

এভাবেই সত্যের পথে, সুন্দর জীবনের পথে, ঈমান ও ইসলামের পথে চলার সময় বাধা-প্রতিবন্ধকতাগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে এর সঠিক সমাধান এ বইয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবন সংগ্রামে বারবার হোচট খাওয়া ও হতাশায়-নিপতিত ভাই-বোনেরা এ বই পাঠে নিজেদের জন্য আশার আলোর সন্ধান পাবেন। *ইনশাআল্লাহ*!

সেই সাথে উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে যারা চিন্তা করেন, তাদেরকে ঘটনার অন্তরালে শিক্ষার জন্য আহবান জানাবে ও উদ্ধার করবে এ গ্রন্থখানি। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় ইয়াসমিন তার এ গ্রন্থে আত্মার পুনর্জাগরণের যে আওয়াজ তুলেছেন, তাতে যথাযথভাবে সফল হয়েছেন। *আলহামদুলিল্লাহ*।

অনুবাদ পরিচিতিঃ

বক্ষমান অনুবাদটি গোটা বইটিরই একটি অবিকৃত অনুবাদ প্রয়াস বলা যায়। কোনো অনুবাদ-কর্মই হুবহু নয়। তবে "A translator ought to the endeavour not only to say what his author has said, but to say it as he has said it." -
John Conington.

অর্থাৎ: অনুবাদককে কেবল লেখকের বক্তব্য যথাযথভাবে অনুবাদ করলেই চলবে না, বরং লেখক যেভাবে বলেছেন সেভাবে অনুবাদ করতে হবে। সমসাময়িক কালে দেশে অনেক ইসলামি বই আরবি-ইংরেজি হতে অনুবাদ হচ্ছে। অনেক সময়ই অনুবাদক যা বুঝেছেন, তাই লেখকের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে লেখকের বক্তব্য ও চিন্তাধারার স্থলে অনুবাদকের চিন্তাধারাই প্রকাশিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই যথাযথ নয়। অন্যের নাম ব্যবহার করে নিজের নাম ও পরিচিতি বৃদ্ধি এবং শুধুই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই করা এসব কাজ ইনসাফ ও নৈতিকতাসম্মত কিনা এবং তাতে কতটুকু *বারাকা* লাভ করা যাবে, তা ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ রইলো।

যাহোক মূল বক্তব্যে ফিরে আসি, এটি গোটা বইটির একটি অনুবাদ প্রয়াস। ইয়াসমিনের লেখায় কিছুটা সুফিবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদের সময় সর্তকতা অবলম্বন করা হয়েছে। কতক স্থানে বিষয়বস্তু, পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত পরিভাষা, বক্তব্য বা ঘটনা ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য পাদটীকার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্রকাশিত "আল-কুরআনুল করীম"-এর অনুসরণ করা হয়েছে এবং আল-কুরআনের অন্যান্য বাংলা অনুবাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যথাসম্ভব উদ্ধৃত হাদিসসমূহের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে।

লেখিকার নামের উচ্চারণ নিয়ে কিছুটা বিভ্রাট তৈরি হয়– ইয়াসমিন মোগাহেদ না মুজাহিদ । লেখিকা মিসরীয় বংশোদ্ভূত। মিসরীয়রা আরবি 'জিম বা জ-কে 'গ'-এর মতো উচ্চারণ করেন। যেমন, জামাল আব্দুন নাসের-কে গামাল আব্দুন নাসের। তাই সম্ভবতঃ মোগাহেদ উচ্চারণ করা হয়। অথবা ইংরেজি 'G'-এর উচ্চারণে মোগাহেদ বলা হয়। তবে লেখিকা নিজের নাম ইয়াসমিন মুজাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায়। তাই আমরা লেখিকার নাম ইয়াসমিন মুজাহিদ হিসেবে উল্লেখ করছি। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

বইটির প্রথমিক অনুবাদ কর্ম করেন জনাব ইমদাদ খান। এর প্রুফ দেখে দিয়েছেন ডা. হাফসা বিনতে এহসান। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা উপযুক্ত জাযা দান করুন। বইটি প্রকাশনার জন্য মুসলিম ভিলেজের সত্ত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ মামুন বেপারী কে আল্লাহ তা'আলা রহম করুক এবং তার কাজে-কর্মে বরকত দান করুন। তার অবিরাম লেগে থাকাতেই আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে কাজটি শেষ অবধি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

বইটির কাজ শেষ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কার্যতঃ গোটা বইটি পুনঃঅনুবাদ করতে হয়। এসময় কাজটা শেষ করার জন্য অবিরাম পাশে থেকে ধৈর্য ও পরামর্শ দিয়েছেন আমার সহধর্মিনী। আমার প্রতি তার যাবতীয় এহসানের উপযুক্ত বিনিময় মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করুন। সেই সাথে বিভিন্ন সময় অনুবাদ কর্মে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে আমার মেয়ে হাফসা এবং দুই ছেলে হামযা ও যাঈদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহম করুন এবং উত্তম জাযা দান করুন।

বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য চেষ্টার অভাব ছিল না। তথাপি তাতে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠক তা ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেওয়া হবে।

পরিশেষে সকল তাওফিকের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি এবং এর কবুলিয়াত কামনা করছি –

"হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১]

"হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরগুলিকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদের করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।"[২]

গ্রন্থটির অনুবাদে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানান রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে 'কি / কী'-এর ব্যবহারে পূর্বের বানান রীতি তথা 'কি'-কে বহাল রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহকে বোঝানোর জন্য যেখানেই 'তার / তাকে' শব্দ এসেছে, সেখানেই আমরা 'তাঁর / তাঁকে' ব্যবহার করেছি এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে 'তার / তাকে' ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য চন্দ্রবিন্দু (ँ) যুক্ত তাঁর/ তাঁকে/ যাঁর-কে কেবল মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা।

– সম্পাদক।

[১] কুরআন, বাকারা, ২:১২৭।

[২] কুরআন, আলে-ইমরান, ৩:৮।

Reclaim Your Heart

Personal Insights on Breaking Free from Life's Shackles

আত্মার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিন

(জীবনের শৃঙ্খলসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বকীয় অন্তর্দৃষ্টি)

সাম্প্রতিক পোস্ট এবং প্রশংসামালা

Reclaim Your Heart গ্রন্থটি ইসলামের আধ্যাত্মিক বার্তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে: সহজ, সুগভীর ও উন্নততরভাবে। নিজের ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ যাত্রার সূত্র ধরে ইয়াসমিন মুজাহিদ তার পাঠকদের সাথে এক বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলে গেছেন: নিজ আত্মার গভীর অনুভূতি পাঠকের হৃদয়ের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আত্মাকে প্রশমিত করতে সফল হয়েছেন। এই গ্রন্থের সাফল্য ছিল প্রত্যাশিত এবং (চারটি নতুন অধ্যায়ের সংযোগে তৈরি) এই নয়া সংস্করণ এক কথায় অনন্য উপহার, যা আশা ও আলোতে পূর্ণ। এই গ্রন্থটি আমাদের প্রত্যেককে সেই মহান সত্তা (তথা সৃষ্টিকর্তার) আরও কাছে এবং প্রত্যেককে নিজ অন্তরের নিকটবর্তী করতে সহায়ক। প্রেম ও শান্তির পথ ধরে *Reclaim Your Heart* গ্রন্থটি বাস্তব ও রুহানি পুনর্মিলন ঘটায়। আমাদের সবারই তা জরুরি।

–তারিক রমাদান, প্রফেসর

"এই গ্রন্থটি অন্তরকে আশা ও আলোতে আলোকিত করে –সত্যই আশ্চর্যময় এক আশীর্বাদ এটা। অনিশ্চয়তার চাদরে ঘেরা এ জীবনের যাত্রাপথে *Reclaim Your Heart* গ্রন্থটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভ্রমণ সঙ্গীর মতো। ইয়াসমিনের চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা এবং তার বলা গল্পগুলো দুনিয়া জুড়ে বহু পাঠককে করেছে উদ্বুদ্ধ।"

–পিটার গোল্ড, পুরস্কার বিজয়ী ডিজাইনার

"সহজভাবে বললে এই গ্রন্থের বার্তা অত্যন্ত অর্থবহ যুক্তিগ্রাহ্য। [আমাদের জীবনে] প্রতিনিয়ত ঘটে চলা সকল অন্তর্বেদনা, দুঃখ, হতাশা এবং পরাজয়কে তাদের উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়েছে ... তাই সাহসের সাথে আমি বলতে পারি, [এই গ্রন্থ] পাঠের পর আপনি কষ্ট ও বেদনাকে আগের দৃষ্টিতে দেখবেন না।"

–সাহিল, যুক্তরাজ্য

"মুজাহিদের লেখা পড়তে গেলে মনে হবে এটা এক বিজ্ঞ পরামর্শক বা বিশ্বস্ত বন্ধুর উপদেশ, জীবনের ভারে ভারাবনত পাঠককে এটা প্রবোধ ও স্বস্তির সাথে পাতা উল্টানোর সুযোগ করে দেবে। স্পষ্টত, প্রতিটি মুসলিম নারীর গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থটি থাকা বাঞ্ছনীয়।"

–Aziza ম্যাগাজিন

"এই গ্রন্থের শব্দমালার মধ্যে এমন এক শক্তি রয়েছে, যা পাঠকের অশ্রুসিক্ত করার ক্ষমতা রাখে, যে অশ্রু সত্যকে জানার ও উপলব্ধি করার এবং নিজের সত্তার মাঝে সে সত্যকে খুঁজে পাওয়ার ফলে বেরিয়ে আসে। এই গ্রন্থ ... পাঠককে আলোকিত এক যাত্রার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সত্য সত্যই সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।"

–Muslim Women Exposed

"... জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে *Reclaim Your Heart* গ্রন্থটি আমাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি। এই গ্রন্থ পাঠ করে কোনো পাঠক এটার প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হবেন না, আমি এমনটি মনে করি না।"

–SISTERS Magazine

অসাধারণ বললেও কম হবে ... অসাধারণ এই গ্রন্থের জন্য ইয়াসমিন আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি বদলে দিয়েছেন আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভ্রান্তিকর যে মায়াজালে আমরা বাস করি তা কিভাবে উপেক্ষা করতে হয়, তা আপনি আমাকে শিখিয়েছেন, আর দিয়েছেন আমাকে আখিরাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার শিক্ষা। প্রত্যেকের জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ আসে, এ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জানি আমি নিখুঁত নই, তথাপি নিজেকে আরও উত্তম মানুষের পরিণত করার জন্য চেষ্টা করছি। আপনার শব্দমালা সত্যই প্রশান্তিদায়ক এবং তা আমাকে জীবনের বিপর্যস্থ রাতগুলোতেও হাসিমাখা মুখে ঘুমানোর প্রেরণা দিয়েছে। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

–ডালিয়া ই. এন.

[এই গ্রন্থটি] নিজের নামকে স্বার্থক করেছে। এটা আমাকে দারুনভাবে সহায়তা করেছে। এই গ্রন্থ আমি বারবার পাঠ করতে চাই। জীবনে কষ্টের সময় যারা পার করছেন, সেসব ব্যক্তির জন্য এই গ্রন্থটি খুবই উপকারী হবে। গ্রন্থটি পাঠ করা আবশ্যক।

–আবু এফ.

মুহতারামা মুজাহিদ তার এই গ্রন্থে, অপূর্ব অলংকারপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন এবং উপস্থাপন করেছেন কালোত্তীর্ণ ও জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। তিনি কলম চালিয়েছেন, যেন একজন বন্ধুর সাথে কথা বলছেন আর নিজের চিন্তাগুলোও সেভাবেই পেশ করেছেন। আমি এই গ্রন্থকে হাত থেকে নামাতেই পারছি না ...। যারা নিজেদের জীবনে 'কিছু একটার হাহাকার' বোধ করেন এবং নিজেদের জীবনকে অসম্পূর্ণ মনে করেন, আমি তাদেরকে এই গ্রন্থটি পাঠের জন্য সুপারিশ করছি। যদিও আমি সামগ্রিকভাবে আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থের তেমন পক্ষপাতী নই, তবুও আমি বিশ্বাস করি এই গ্রন্থ সমস্যার মূলে হাত দিয়েছে। যদি মনে করেন, আপনি জীবনে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন, কিংবা নিশ্চিত জানেন যে, আপনি লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন, তবে এই গ্রন্থে ওই সম্ভাব্য উপাদান রয়েছে, যা আপনাকে আপনার যথার্থ স্থানে নিয়ে আসবে। গ্রন্থটি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও এর উপস্থাপনা বেশ সরল।

–ড্রু (*Drew*)

(এই গ্রন্থ) আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমার পড়া অন্যতম সেরা গ্রন্থ এটি। প্রথমত, এটা আমাকে নিজের দিকে তাকাতে সাহায্য করেছে, নিজেকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে এবং আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে যে, এই দুনিয়াতে স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী নয় এবং কেবল তাঁরই ওপর সবকিছুর জন্য নির্ভর করা যায়। গ্রন্থটি পড়া কখনো কখনো বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কেননা, নিজের সত্তার গহীনে ডুব দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে সব মিলিয়ে বললে, পুরো গ্রন্থটি বেশ অর্থবহ।

–আমিরা জি.

বোন ইয়াসমিনের বক্তব্য উপস্থাপনের ঢং-টিই এমন, যা আপনার হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে এবং (আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে) এটা আপনার মেধা ও মননকে করবে আন্দোলিত। জীবনে সচেতনভাবে চলতে গেলে আমরা যেসব প্রশ্ন নিয়ে হিমশিম খাই, এই গ্রন্থ সেগুলোর উত্তম জবাব। তার বলার ধরন মাধুর্যে ভরা, ব্যবহার করেন সরল যুক্তি এবং সবকিছুকে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। এসব কারণ এবং এমন আরও বহু কারণে এটা এমন এক গ্রন্থ, যা আমি বারবার পাঠ করি এবং আমি আমার কাছের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দেরকে এই গ্রন্থ উপহার হিসেবে দিয়েছি।

–Mommy22

আমরা কিভাবে চিন্তা করবো এবং জীবন কাটাবো, এ ব্যাপারে এ গ্রন্থটি একটি মূল্যবান স্মরণিকা। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে [এই গ্রন্থের] উপদেশ প্রযোজ্য। ইয়াসমিনের লেখার ধরন সহজবোধ্য। এটা এমন এক গ্রন্থ, যা আপনি খুব দ্রুতই পড়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি একটু বসেন এবং নিজের জীবনে কিভাবে এসব উপদেশের বাস্তবায়ন করবেন, সেটা নিয়ে চিন্তায় মশগুল হন, তবে সেটা আপনার জন্য উপকার নিয়ে আসবে। কিছু দিন পরপরই আমি এই গ্রন্থটি পড়ি।

–Julie408

এই গ্রন্থ আমার জীবন দর্শন বদলে দিয়েছে। এই গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ পাঠের সময় বহু 'আহা!' মুহূর্ত এসেছে। এই গ্রন্থে যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো উপলব্ধি করা, পড়া এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা বেশ সহজ। *Reclaim Your Heart* এমন এক গ্রন্থ, যা আপনার গ্রন্থাগারে থাকা আবশ্যক। প্রতিদিন আমরা যেসব কষ্টের মধ্য দিয়ে যাই, এই গ্রন্থ সেগুলোকে লাঘব করতে সাহায্য করে। কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং নবি মুহাম্মদ (ﷺ) ও তার সাহাবিগণের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনের কষ্ট, ব্যর্থতা, প্রেম ও বিরহকে উপলব্ধি করতে এবং সেগুলোকে মেনে নিতে গ্রন্থখানি আমাদের সাহায্য করে।

–অ্যামাজনের এক ক্রেতা

অনুপ্রেরণামূলক পাঠ! সুচারুভাবে লেখা গ্রন্থটি আমাদেরকে জানায় যে, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি হওয়া দরকার মহান আল্লাহতায়ালার সাথে। এই গ্রন্থে পেশ করা চিন্তাধারাসমূহ কুরআন ও নবি (ﷺ)-এর শিক্ষা দ্বারা সমর্থিত। এটা সবার জন্য একটা অসাধারণ গ্রন্থ হলেও বিশেষতঃ আমার মতো যারা জীবনের প্রত্যাশা ও সম্পর্কের দাবি নিয়ে হিমশিম খান, এই গ্রন্থ তাদের জন্য বেশ উপকারী। আমাদের মনোযোগকে কোথায় নিবদ্ধ করবো, এই গ্রন্থ সে ব্যাপারে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দেয়। গ্রন্থটি যখন পড়তে শুরু করেছি, তখন তা রেখে দেওয়াটা আমার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল, সত্যই অনুপ্রেরণাদায়ক!

–ডানা এম.

চমৎকার একটি লেখা, যার সাথে আমি তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। বিবাহ বিচ্ছেদের দু'বছর পরও আমি যা করতে ব্যর্থ হয়েছি, *আল-হামদুলিল্লাহ*, এই গ্রন্থ এক সপ্তাহের মধ্যে তার অবসান ঘটানোর পথ করে দিয়েছে। ধন্যবাদ, বোন ইয়াসমিন।

–রাইফা বি..

আস-সালামু আলাইকুম ... এ এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। কোনো এক আলোচনা সভায় লেখিকাকে আমি বক্তব্য দিতে শুনি এবং সেখান থেকে এই গ্রন্থ কিনে ফেলি। আমি এটাকে এতটাই ভালোবেসে ফেলি যে, আমার কন্যা এবং আমার আরেক বোনের জন্য এই গ্রন্থটি কিনে আনি! আমি বেশ জোরের সাথে এটা পড়ার জন্য সুপারিশ করবো –ইয়াসমিন মুজাহিদ অন্তরের বিষয়গুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এতে করে *ইনশাআল্লাহ* আপনার অন্তর প্রশস্ত হয়ে তা আল্লাহ (ﷻ)-এর (চিন্তায়) পূর্ণ হবে, কোনো বস্তু বা মানুষ দিয়ে নয়। এ গ্রন্থে এছাড়া আরও বহু জিনিস রয়েছে, *মাশাআল্লাহ*। আপনার সুন্দর চিন্তাগুলি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, আমাদেরকে শেখানোর জন্য এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য বোন ইয়াসমিনকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন (*জাযাকাল্লাহা খাইরান*)।

–কে. পোলমেন

(যেকোনো বয়সের) সকলের জন্য আমি গ্রন্থটি সুপারিশ করছি। গ্রন্থটি আমি ইতোমধ্যেই পড়ে ফেলেছি, তারপরও প্রতিদিন আমি এর থেকে প্রবন্ধ পড়ে ফেলি, যা মিনিট পাঁচেকের মতো লাগে। এটা আমাকে দৈনন্দিন জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বইখানি অসাধারণ এক স্মরণিকা এবং এই দুনিয়াতে আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই, তা মোকাবেলার সহায়িকা। আর তা দান করে আখিরাতের জন্য আসল ভরসা। এটি একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ, [কারণ এটা খুবই] অনুপ্রেরণাদায়ক।

–রেগিনা ও.

এক বছর আগে আমার হবু স্বামী আমার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয় এবং আমি ভীষণভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ি। আমি হয়ে পড়ি দ্বিধাগ্রস্থ, দুঃখ ভারাক্রান্ত, হতাশাগ্রস্থ –আপনি যেভাবে চান বলতে পারেন। তা সত্ত্বেও *আল-হামদুলিল্লাহ*, কারণ এ ঘটনাই আপনার লেখার সাথে আমাকে পরিচিত করে তোলে। গত বছরটি ছিল আমার জন্য বেশ আবেগময়, তথাপি আমার অন্তরকে ঠিক মতো মেরামতের জন্য এটা ছিল চমৎকার এক শিক্ষা প্রক্রিয়া। আমি শিখেছি আমাদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহতায়ালাকে স্থান দিতে হবে, আর বাকি সব *হালাল* হলেও, সেগুলো উপহার মাত্র, যার স্থান আমার হাত। আপনার লেখা আমাকে এমনভাবে সহায়তা করেছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তিন সপ্তাহ আগে আমার পিতা আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন, *আল্লাহু ইয়ারহামুহু* (আল্লাহর তার প্রতি রহম করুন)। আমার গোটা পরিবার ও পরিচিত জনেরা এতে ভীষণভাবে বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও প্রথম আমার যা মনে আসে, তা হলো: *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন* –আমরা আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো; এবং *ইনশাআল্লাহ* আমার বাবা নিজ আবাসেই ফিরে গেছেন। হতাশা হওয়ার পরিবর্তে আমি সত্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, যেহেতু আল্লাহ তাকে আমার পিতা হিসেবে বাছাই করেছেন এবং যতদিন তাকে কাছে পাওয়ার ছিল, আল্লাহ তার অনুমোদন আমাকে দিয়েছেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তমটাই বাছাই করেন, তাই আমি মনে করি আমার পিতার চলে যাবার জন্য এটাই ছিল উত্তম সময়।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারন আমি যদি আপনার লেখার সাথে পরিচিত না হতাম এবং তা উপলব্ধি না করতাম, তাহলে আমি এখন যা আছি, তা হতে পারতাম না এবং জীবনের সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষকে হারানোর ক্ষতি আমি সামলে উঠতে পারতাম না। আমার বলতে ইচ্ছে করে যে, আপনার লেখার বিশেষ কোনো একটা অংশ আমায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়, বরং প্রকৃত কথা হলো আপনার সমগ্র লেখাটিই আমায় অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আপনাকে অশেষ পুরস্কারে ধন্য করেন, সর্বদা আপনাকে রাখেন উজ্জীবিত এবং আপনি যে কাজ করে যাচ্ছেন, আল্লাহ যেন তা চলমান রাখেন। আল্লাহ যেন আপনার ভালোবাসার মানুষদের রহম করেন এবং নিরাপদ রাখেন। আমার বাবার জন্য দয়া করে দু'আ করবেন।

–আলা

আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, প্রিয় বোন। আমি আমার জীবনের কঠিনতম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, পাড়ি দিচ্ছিলাম আঁধার, হতাশা, শূন্যতা এবং সব ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি। এ সবকিছু আমাকে গ্রাস করেছিল। অতঃপর সহসা আপনার প্রবন্ধগুলো আমার সামনে এলো। আমি এখন আলোকিত, *আল-হামদুলিল্লাহ*। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি লিখে যান, যেহেতু 'মহান' আল্লাহতায়ালা আপনাকে এই গুণে ভূষিত করেছেন।

আমি আপনার জন্য যত দু'আ করি, মহান আল্লাহতায়ালা যেন তার সবই কবুল করেন ... বস্তুত আমি কেবল এতটুকুই বলতে পারি, যেহেতু আমার কাছে বলার মতো আর উপযুক্ত শব্দ নেই!

—মারইয়াম আই.

আপনার লেখা শব্দমালা আমাকে এমনভাবে বিদ্ধ করেছে যে, (নিজেকে সংবরণ করার জন্য) আমাকে আমার পড়ার গতি ধীর করে শ্বাস নিতে হয়েছে। নিজেকে অগভীর ও বস্তুবাদী নই মনে করে আমি বেশ গর্ব অনুভব করতাম, যদিও সারাটি সময় নিজেকে সুখী রাখার জন্য আমার ভালোবাসার মানুষদের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু তারা যখন আমাকে হতাশ করতো, কিংবা আমাকে ছেড়ে চলে যেতো, তখন আমার গোটা দুনিয়াটা কেঁপে উঠতো, এমনকি পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত। নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভালোবাসা পাওয়া মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা এবং সে ভালোবাসা থেকেই আমি শান্তি লাভ করি। তবে সেই ভালোবাসা আসতে হবে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক হতে, মানুষের সাথে সম্পর্ক হতে নয়, এটা উপলব্ধি করতে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছে। একজন আদর্শবাদী মানুষ, আমি দিতে ভালোবাসি এবং অন্যকে সুখী করতে পারলে আমি আনন্দ পাই, তথাপি এটা উপলব্ধি করতে ও স্মরণে রাখতে আমার কষ্ট হয়েছে যে, এই লোকজন ও এই দুনিয়া থেকে কিছুই প্রত্যাশা করতে নেই। *আল-হামদুলিল্লাহ*, আপনার বক্তব্যগুলো পাঠ করার অর্থ যেন নিজের দিকে ভালো করে তাকানো, যেটা করার জন্য আসলে আমি প্রস্তুত ছিলাম না ... কিন্তু এটা আমাকে দারুনভাবে সহায়তা করেছে। সত্য প্রকাশে আন্তরিক হওয়ার জন্য আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

—মেহার।

আমি বলতে চাই, আমি আপনার গ্রন্থের অধ্যায়গুলোকে ভালোবেসে ফেলেছি। আট বছর বয়স থেকেই আমি বইয়ের পোঁকা। বইয়ের দোকানগুলোর আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থের বিভাগগুলি আমি কেবল গোগ্রাসে আত্মস্থ করেছি। আমি রুমি, গাজ্জালি, ইকবাল এবং আত্মার সাথে কথা বলে এমন বিস্ময়কর লেখকদেরকে ভালোবাসি। কেন আপনাকে আমি এটা বলছি – কারণ বহু মেধাবী লেখকের লেখা পাঠের পর আপনার লেখাতে আমি আমার হৃদয় ও মনকে আবিষ্কার করেছি। নিশ্চিতভাবে আপনি আমার একজন প্রিয় লেখিকাদের একজন। যখনই আমার অনুপ্রেরণার দরকার হয়, তখনই ফিরে যাই আমি আপনার প্রবন্ধগুলোতে এবং সেইসাথে আমি এমন একজনকে পেয়েছি, যাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। তাকে আমি আমার আত্মার সাথি মনে করি এবং তার প্রতি আমার ভালোবাসা আমাকে তার প্রতি অনুরক্ত করেছে। আপনার লেখার মাধ্যমে আমি সেই মহান সত্তার প্রেমে পড়তে শুরু করেছি, যাঁর নেই কোনো লয় ও ক্ষয় এবং যাঁর বন্ধনকে আঁকড়ে ধরলে, তা ভেঙে যাবার কোনো আশংকা থাকে না। সত্যিকার প্রেম যে কি জিনিস, সেটা আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন। আমি আপনার কাজকে ভালোবাসি। আপনি আমাকে অনুপ্রাণিত হতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছেন। আর হ্যাঁ, আমার ভাইও আপনার কাজ পছন্দ করে; আর আমার বন্ধুবান্ধবও। আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাকে সবকিছুতে বরকত দান করেন এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আপনাকে যেন সর্বদা আমাদের অনুপ্রেরণাস্থল বানান। আপনার প্রতি রইলো অনেক অনেক ভালোবাসা, আলিঙ্গন ও অনেক অনেক দু'আ।

–মুহসিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা

এইতো বেশিদিন হবে না, হঠাৎ করেই আপনার ওয়েবসাইট ও ভিডিওগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আগে থেকেই আমি আমার "আত্মার খোরাকের" খোঁজে ছিলাম। আমি ওই শব্দমালার সন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, যা আমার বিক্ষিপ্ত অন্তরকে করবে শান্ত। এরপর পরই আমি আপনার ব্লগ ও ভিডিওগুলোর সাথে পরিচিত হই। *মাশাআল্লাহ*, আপনার লেখা কিভাবে আমার অন্তর ও আত্মার ওপর প্রভাব ফেলেছে, তা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। আপনার লেখা প্রতিটি শব্দ ছুঁয়ে দিয়েছে আমার অন্তর, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমার নফসানিয়াত তথা আমিত্বকে এবং আমাকে করেছে অশ্রুসিক্ত।

এমন অনুপ্রেরণার কাজের জন্য এবং প্রতিনিয়ত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, তা আমার সাধ্যের বাহিরে। আল্লাহ (ﷻ) আপনাকে জান্নাতের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাকে পুরস্কৃত করুন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এবং শুধুই ধন্যবাদ আপনাকে।

—মুনিরা, সিঙ্গাপুর

তাওয়াক্কুল কামরান আমায় ইয়াসমিন মুজাহিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথমজন বাহ্যিক বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ তৈরি করেন, আর অপরজন সৃষ্টি করেন আত্মিক বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ।

—mA

ইয়াসমিন, না আপনি আমাকে চিনেন, আর না আমি আপনাকে চিনি। এরপরেও আমি আপনাকে আমার একান্ত কাছের ভাবি! আপনার লেখা প্রতিটি শব্দ আমার অন্তরকে গভীরভাবে ছুঁয়েছে।

—নুর

আমি মনে করি, এতদিন আমি এক ধরনের মুনাফিকির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলাম, যেখানে মুখে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি বললেও আমার কাজ সেটার প্রতিফলন ঘটায় না। আমার জীবনের সত্যিকার পরিবর্তন তখনই আসতে শুরু করে, যখন আপনার লেখা ও বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় সত্যিকার মর্ম ও তাৎপর্য বুঝতে শুরু করি। *আল-হামদুলিল্লাহ*, এরপর থেকে আমার জীবনের "সবকিছু" গুছিয়ে আসতে শুরু করে ...।

—নাযির

মাশাআল্লাহ, মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা, সেটাকে আন্দোলিত করা এবং সেটাকে কাজের উপযুক্ত করে তোলার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন! ইয়াসমিন মুজাহিদের মতো মানুষের জন্য আল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ।

—গাজি এ.

আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনাকে সুরক্ষিত রাখুন, চিরকাল ও চিরজীবন। কামনা করি আপনি জান্নাতে যান এবং সেখানে সুখে শান্তিতে জীবন কাটান। আপনার লেখা যতগুলো জীবনকে নাড়া দিয়েছে, সেটাকে কখনো ছোট ভাববেন না। [আমি প্রার্থনা করি] আজ রাতে আল্লাহ যেন আপনার দিকে সন্তুষ্টির নজরে তাকান। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর কোনো স্থান যদি থেকে থাকে, তবে আপনার এ কাজ সম্ভবত সেখান থেকেই উৎসারিত। আপনাকে জানাতে চাই যে, মুসলিম সমাজ বিশেষতঃ এর যুব সমাজের জন্য আপনি এক মূল্যবান ও অনুপ্রেরণামূলক উপহার। আপনি হয়তো তা অবগত আছেন, কিংবা অবগত নন। এই দুনিয়াতে আমরা যেসব সমস্যার মোকাবেলা করি, সেগুলোর মধ্য থেকে বহু সমস্যাকে আপনি চিহ্নিত করেছেন এবং সরাসরি সেগুলোর একেবারে মূলে হাত দিয়েছেন।

বর্তমান এই বিশ্বে যেখানে মনে হচ্ছে সবকিছু অধঃপতনের অতলে যাচ্ছে, সেখানে আপনি একজন "ভালো লেখক" কিংবা "ভালো বক্তার" চেয়েও বেশি কিছু, আসলে আপনি আশার আলোর প্রতিনিধি! আশার কথা যে, দুনিয়াতে এখনো প্রকৃত ও খাঁটি মানুষ রয়েছে। এটা হয়তো আপনি জানেন না যে, লোকজন আপনার ব্যাপারে সাধারণত বলে থাকে যে, আপনার উপস্থিতি স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দের একটা পরিবেশ উপহার দেয়, যার কারণ তারা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এর কারণ হলো: সৎ ও সত্যতা। যখন কেউ আপনার সামনে এমন সত্য বক্তব্য রাখে, তখন অন্তর প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পারে না।

আপনি বহু মানুষকে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় পাড়ি দিতে সাহায্য করেছেন এবং এই কারণে [আমি প্রার্থনা করি], আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আপনি বহু মানুষকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যা তারা আগে করতো না এবং এজন্য আমি কামনা করি, আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। *ইনশাআল্লাহ*, আপনার *হাসানাত* (তথা সৎ কর্মগুলো) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, যেমনিভাবে মিলিনিয়রের অর্থ কেবল বাড়তেই থাকে, তবে বিচার দিবসে তাদের সাথে আপনার পার্থক্য তৈরি হবে। *ইনশাআল্লাহ*, বিচার দিবসে আপনি তাদের থেকে হাজার-কোটি গুণ ধনী হবেন এবং আমি সেটার সাক্ষ্য দেওয়ার আশা রাখি। আমি আশা করি, নবি মুহাম্মদ (ﷺ) আপনাকে হাসি মাখা বদনে উষ্ণভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন, যেহেতু আপনি তার উম্মতের সেইসব মানুষের একজন, যে এই দুনিয়াতে পার্থক্য তৈরির সত্যিকার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং আপনি সত্য সত্যই সেই পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমার এ বক্তব্য যদি কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার লেখাতে আমি আমার দুর্বলতম মুহূর্তগুলোতে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার শক্তি পেয়েছি। আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমার বেড়ে ওঠার সময় আপনার মতো একজন দৃঢ় ঈমানের মানুষকে বন্ধু হিসেবে পেতাম। আমার এ অনুভূতি সুদূর লন্ডনের সেইসব হাজারো লোকের পক্ষ হতে, যারা আপনার মাধ্যমে হয়েছে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

জাযাকা আল্লাহ আল্‌ফ আল্‌ফ খাইর ইনশাআল্লাহ।

আমার মনে হয় এখন আমার থেমে যাওয়াটাই উত্তম, না হলে আমি কেবল বলেই যাবো। *সালামুন আলাইকুম*।

–মুহাম্মদ এ.

এক বছর পর আমি আপনার এ প্রবন্ধখানি পাঠ করছি আর ভাবছি যে, এই লেখাটিই সত্যিকার অর্থে আমাকে বদলে দিয়েছে। না আমি সত্যিকারভাবে ইসলামে ছিলাম, আর না আমি তা ভালো মতো পালন করছিলাম। আমার জীবন ছিল আঁধারে পূর্ণ। আমি ছিলাম এমন লোকদের সাথে, যারা আমাকে এমন মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনতো, যা আমি প্রকৃতপক্ষে ছিলাম না। ফলে আমি পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াদারিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। আমি এমনসব কাজ করেছি, যেগুলোর জন্য আমি মোটেও গর্বিত নই। (নৈতিকভাবে) আমি কেবল ব্যর্থই হয়েছি, কেবলই ব্যর্থ হয়েছি। প্রতি পদে পদে আমি কেবল হোঁচটই খেয়েছি এমন এক পর্যায় পর্যন্ত, যখন আমি আর নিজেকে চিনতে পারতাম না, যতক্ষণ না এক রাতে আমার সাথে ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটে। আমি তখনই উপলব্ধি করলাম যে, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমার সাথে আছেন, কিন্তু এই আমিই তাঁকে বারবার উপেক্ষা করেছি। উপেক্ষা করেছি আমার স্রষ্টাকে। ওই রাতে আমি নিজেকে বলি, অনেক হয়েছে, আর না। তখনই আমি ইসলামে আবার ফিরে আসি। আমি ফিরে আসি তাঁর কাছে। ওই রাতের পর আমি জীবনকে বদলে দেওয়ার অভিযাত্রা শুরু করি। ওই যাত্রাতে আল্লাহ ছিলেন আমার পথ প্রদর্শক এবং এই যাত্রার মাধ্যমেই আমি সক্ষম হয়েছি আমার জীবনকে একেবারে ৩৬০ ডিগ্রিতে পাল্টে ফেলতে। আজ হিজাব ছাড়া আমি আমার জীবনকে ভাবতে পারি না। দৈনিক সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া ছাড়া কিংবা প্রতিদিনের হালাকাগুলোতে অংশ নেওয়া ছাড়া আমি এখন আমার জীবনকে কল্পনা করতে পারি না।

ইয়াসমিন, এই প্রবন্ধ পোস্ট করার জন্য আমি আপনাকে উপযুক্ত ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতে পারবো না। এটাকে সত্যই প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আপনি যা বলেছেন, আমি সেটা শুনেছি; দুনিয়ার কাছ থেকে চাবির গোছা নিয়ে আমি সেটা স্রষ্টার হাতে তুলে দিয়েছি। আসলেই আপনি অনুপ্রেরণাময় এক নারী এবং আমি আপনাকে আমার আদর্শ বিবেচনা করি। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

–হুমায়রা

আল্লাহ (ﷻ) আপনাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান তথা ফিরদাউস দান করে পুরস্কৃত করুন। *আমিন*। আপনি যে কত বড় এক আশীর্বাদ, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আপনার লেখার বদৌলতে আমার জীবনে আপনার প্রবেশ, যা আমার ঈমানকে প্রতিনিয়ত কেবল বলিষ্ঠই করেছে, *আল-হামদুলিল্লাহ* (সকল প্রশংসা আল্লাহর) এবং সেটা আমার অসংখ্য বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষ, যাদের সাথে প্রায়শই আমি আপনার কাজ শেয়ার করি, তাদেরকে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে! আপনি যদি [মুসলিম] উম্মাহের জন্য হেদায়তের একটা মাধ্যমে পরিণত হওয়ার জন্য [মহান আল্লাহর কাছে] দু'আ করে থাকেন, তবে আল্লাহ (ﷻ) আপনার দু'আ সত্যই কবুল করেছেন!

–হাজেরা এম.

উৎসর্গ

মায়ের গর্ভে থাকার বহু আগেই যিনি আমাকে লালন করেছেন, এই গ্রন্থের পুরোটাই সেই মহান সত্তার জন্য নিবেদিত। যিনি আমাকে শিখিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং জীবনভর যিনি আমাকে সুপথ দেখিয়েছেন, এটা তাঁর জন্যই উৎসর্গিত। এই বিনীত প্রচেষ্টাটুকু আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি এবং আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও আমি দু'আ করি, হয়তো এটা [মহান আল্লাহর দরবারে] কবুল হবে এবং সেইসাথে আমি আমার পরিবারের জন্য দু'আ করি, যারা আমাকে [জীবনের] এই যাত্রায় সহায়তা করে গেছেন।

প্রারম্ভিকা

Reclaim Your Heart শুধুমাত্র একটা আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থ নয়। বরং এটা জীবন সমুদ্রের ভেতর ও বাহিরে আত্মার সফরের জন্য এক ম্যানুয়েল। এই সাগরের গভীরে আপনার অন্তর যাতে নিমজ্জিত না হয়ে যায়, তার পথ বাতলে দেবে এই গ্রন্থ। আর যদি সেরকমটিই ঘটে, তখন কি করা দরকার তাও বলে দেবে। এই গ্রন্থ মুক্তির কথা বলে, আশার কথা আর বলে জীবনকে নবায়নের কথা। প্রতিটি অন্তরই সেরে উঠতে সক্ষম এবং প্রতিটি মুহূর্তকে বানানোই হয়েছে আমাদের পরিবর্তিত পরিবর্তনের কাছে নিয়ে যেতে। সবকিছু যখন থমকে দাঁড়ায়, মনে হয় হঠাৎ সব বদলে গেছে, তখন পরিবর্তনের ওই মুহূর্তটি খুঁজে পাওয়াই হলো নিজের অন্তরকে পুনরুদ্ধার করা –*Reclaim Your Heart*। নিজের জাগরণকে খুঁজে পাওয়ার মতোই এটা। এরপর নিজের অধিকতর সমৃদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ এবং মুক্ত রূপের কাছে ফিরে আসা।

আবেগ-অনুরাগ-আসক্তি

এই দুনিয়া আপনাকে ভাঙতে পারে না, যদি না আপনি তাকে সেটার অনুমতি দেন। দুনিয়া আপনাকে আয়ত্ত করতে পারে না, যদি না আপনি নিজে থেকে চাবির গোছা তার হাতে তুলে দেন, যদি না আপনি নিজের আত্মাকে দুনিয়ার কাছে বন্ধক রাখেন। যদি তেমনটিই হয়ে থাকে, যদি আপনি নিজের ওই চাবিগুলো কিছু সময়ের জন্য তুলেই দিয়ে থাকেন দুনিয়ার হাতে, তবে সেটা ফিরিয়ে নেন। এটাই শেষ নয়। এ অবস্থাতেই আপনাকে মরতে হবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। নিজের আত্মাকে পুনরুদ্ধার করুন এবং এটাকে তার উপযুক্ত মালিকের হাতে সমর্পণ করুন, আর সেই মালিক হলেন —আল্লাহ।

মানুষ কেন অপরকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়?

আমার বয়স তখন ১৭। আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা মসজিদের ভিতর এবং ছোট্ট একটা মেয়ে ছুটে এসে আমাকে প্রশ্ন করে। তার প্রশ্ন ছিল, "মানুষ কেন অপরকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়?" যদিও প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু বেছে বেছে আমাকে এই প্রশ্ন কেন করা হলো, তা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

কারণ আমিই অনুরাগ ও আসক্তির মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমার এই মেজাজ বা স্বভাবটি আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। প্রিস্কুলে [বা কিন্ডারগার্টেনে] অন্য শিশুরা পিতামাতার অনুপস্থিতিকে খুব সহজেই মেনে নিতে পারতো, কিন্তু আমি পারতাম না। একবার আমার চোখের পানি বের হওয়া শুরু হলে, তা আর থামানো যেতো না। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে চারপাশের সবকিছুর সাথে কেমন করে যেন মায়ার এক বন্ধনে আটকে যেতাম। প্রথম গ্রেডে পড়ার সময় আমার প্রয়োজন ছিল একজন ভালো বন্ধুর। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যদি কোনো বন্ধুর সাথে ঝগড়া হতো, তবে সেটা আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো। কোনো কিছুর চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারতাম না। মানুষ, স্থান, ঘটনা, ফটোগ্রাফ, মুহূর্ত —এমনকি ফলাফলও আমার শক্ত আবেগ-অনুরাগের বস্তুতে পরিণত হতো। আমি যেভাবে চেয়েছি কিংবা যেমনটি ভেবেছি, বিষয়াদি যদি সেভাবে না হতো, তবে আমি বিধ্বস্ত হয়ে যেতাম। হতাশা আমার জন্য কোনো সাধারণ আবেগ ছিল না, বরং এটা ছিল আমার জন্য সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়। একবার ভেঙে পড়লে, সেখান থেকে পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারতাম না। আমি ভুলতে পারতাম না, তাই ভাঙন কখনো সারতো না। যেন টেবিলের কোণায় রাখা কাঁচের ফুলদানি, যদি একবার ভাঙ্গে, আর তা জোড়া লাগে না।

যাইহোক, ফুলদানি নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না, আর সেটার বারবার ভেঙে যাওয়াটাও মূল সমস্যা ছিল না। সমস্যাটা ছিল আমি সব সময় সেগুলোকে টেবিলের কোণাতেই রাখতাম। অনুরাগ ও আবেগের মাধ্যমে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে আমি আমার সম্পর্কগুলোর ওপর বেশ নির্ভরশীল ছিলাম। আমি সুযোগ করে

দিয়েছিলাম যেন আমার সম্পর্কগুলোই নির্ধারণ করবে আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার পূর্ণতা, আমার শূন্যতা, আমার নিরাপত্তা, এমনকি আমার নিজের সত্তার মূল্যমান। টেবিলের কোণায় ফুলদানি রাখলে যেমন সেটা পড়বেই ঠিক সেভাবেই। এসব নির্ভরশীলতার মাধ্যমে আমি নিজেকে হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার ব্যবস্থা করে রাখতাম। আর আমি তাই পেতামঃ এক হতাশার পরে আরেক হতাশা এবং একের পর এক ভেঙে পড়া।

তথাপি যারা আমার ভেঙে পড়ার পেছনে দায়ী, তাদেরকে দোষ দেওয়ার অর্থ হবে ফুলদানি পড়ে ভাঙার জন্য মধ্যাকর্ষণকে দোষারোপ করার মতো। আমাদের ভর দেওয়ার জন্য যদি গাছের নরম ডালটি ভেঙে যায়, তবে পদার্থবিদ্যার নিয়ম কি এর জন্য দোষী? গাছের নরম ডাল তো কখনো আমাদেরকে বহন করার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

স্রষ্টাই কেবল পারেন আমাদের অবলম্বন হতে। এজন্য কুরআনে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে: "... যে তাগুতকে[৩] প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ভাঙ্গে না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ।" (কুরআন, ২:২৫৬)

এই আয়াতটিতে নিহিত রয়েছে এক তাৎপর্যময় শিক্ষা, অর্থাৎ: এমন এক হাতল আছে যা কখনো ভাঙ্গে না। আছে এমন এক জায়গা, যার ওপর আমরা সর্বাবস্থায় নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি। কেবল একটি সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে আমাদের মূল্যমান, আর কেবল একজনই আছেন যাঁর কাছে চূড়ান্ত সুখের আশা করা যায়, আশা করা যায় পূর্ণতা ও নিরাপত্তার। সেই আশার ও ভরসাস্থল হলেনঃ আল্লাহ।

যাহোক, এই দুনিয়াটা এমনই যে, মানুষ এই সুখ, নির্ভরতা, পূর্ণতা এবং নিরাপত্তাকে খুঁজে ফিরে অন্য কোথাও। কেউ এগুলোকে খুঁজে ক্যারিয়ারের মাঝে, কেউ খুঁজে বেড়ায় ধনসম্পদের মাঝে, আবার কেউবা প্রতিপত্তির মাঝে এগুলো হাতড়ে বেড়ায়। আর আমার মতো কেউ এগুলো খুঁজে বেড়ায় সম্পর্কের মাঝে। এলিজাবেথ গিলবার্ট তার *Eat, Pray, Love* গ্রন্থে তিনি কিভাবে সুখের সন্ধান করেন, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া এবং সেগুলো থেকে বেড়িয়ে আসা এবং এমনকি এই সুখের সন্ধানে পৃথিবী ভ্রমণের আদ্যোপান্ত পর্যন্ত তিনি তুলে ধরেন। তিনি

[৩] তাগুতঃ আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার আনুগত্য করা হয় অথবা যে সত্তা শুধু নিজেই কুফরি করে না, অপরকে কুফরি করতে বাধ্য করতে চায় – (সম্পাদক)।

ওই সুখকে খুঁজে বেড়িয়েছেন তার সম্পর্কগুলোর মাঝে, ধ্যানের মাঝে, এমনকি খাবারের মাঝেও তিনি সুখ তালাশ করেছেন এবং সবই তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

ঠিক এগুলোর পেছনেই আমি আমার জীবনের বড় একটি অংশ ব্যয় করেছিঃ চেয়েছি নিজের আত্মিক শূন্যতা মেটানোর একটি পথ খুঁজে পেতে। তাই স্বপ্নের ওই ছোট্ট শিশু আমাকে যে এই প্রশ্নটি করেছে, সেটা তেমন অবাক করা কোনো ব্যাপার নয়। প্রশ্নটি হলো আশাহত হওয়া প্রসঙ্গে। প্রশ্নটা হলো কোনো কিছু খুঁজে ফেরা এবং দিনশেষে খালি হাতে ফেরা প্রসঙ্গে। যখন আপনি খালি হাতে চুন, সুড়কির কংক্রিটের মিশ্রণকে খুঁড়তে থাকেন, তখন কিন্তু আপনি কেবল শূন্য হাতেই ফিরেন না, সেইসাথে নিজের আঙ্গুলগুলোকে ভেঙে আনেন – এই প্রশ্ন ছিল এই রূঢ় বাস্তবতা প্রসঙ্গে। না কোনো কিছু পড়ে, আর না কোনো বিজ্ঞ দরবেশের কাছ থেকে শুনে আমি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। বারবার, বারবার এবং বারবার চেষ্টার মাধ্যমেই আমি এই প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি।

ওই ছোট্ট শিশুর প্রশ্ন আসলে ছিল আমার নিজের প্রশ্ন ... যে প্রশ্ন আমি নিজেকেই করেছি।

চূড়ান্তভাবে এ প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল, দ্রুত বয়ে চলা মুহূর্তগুলো এবং ক্ষণস্থায়ী অনুরাগ ও আসক্তির এই দুনিয়ার প্রকৃতি কেমন, তার স্বরূপ জানা। যেহেতু দুনিয়া এমন এক স্থান, যেখানে আজ যারা আপনার সাথে আছেন, তারা হয় আজ বা কাল চলে যাবেন কিংবা চলে যাবেন না ফেরার দেশে। কিন্তু এই বাস্তবতা আমাদের সত্তাকে আঘাত করে, যেহেতু এটা আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মানুষ হিসেবে যা কিছু পূর্ণ ও স্থায়ী তার অনুসন্ধান, তাকে ভালোবাসা এবং তার পিছে ছুটে বেড়ানোর স্বভাব দিয়েই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরকে বানানোই হয়েছে অসীমের পানে ছুটার জন্য। আমরা তো এগুলোই খুঁজে বেড়াই, যেহেতু আমরা এই দুনিয়ার জন্য সৃষ্ট হইনি। আমাদের প্রথম ও সত্যিকার নিবাস তো জান্নাত, যা একইসাথে পূর্ণতা ও স্থায়ীত্বের নিবাস। তাই এমন জীবনের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা আসলে আমাদের সত্তারই একটি অংশ। কিন্তু সমস্যা তখনই বাঁধে, যখন আমরা ওই জীবনকে এই দুনিয়াতে খোঁজার চেষ্টা করি। তাই আমরা মরিয়া হয়ে যৌবনকে ধরে রাখার জন্য ক্রিম ও কসমেটিক সার্জারির শরণাপন্ন হই – দুনিয়াকে আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে। এটা হলো দুনিয়াকে ওই ছাঁচে পরিণত করার প্রয়াস, বাস্তবে যা দুনিয়ার প্রকৃতি নয় এবং না কখনো দুনিয়া সেরূপ হবে।

ঠিক এই কারণে, যখন আমরা মন উজাড় করে দুনিয়াতে বাস করতে থাকি, তখন এটা আমাদেরকে দেউলিয়া করে দেয়। আসলেই এই দুনিয়া কষ্ট দেয়।

অস্থায়ীত্ব ও অপূর্ণতাই দুনিয়ার আসল মর্ম এবং যা কিছুর জন্য আমরা সৃষ্টিগতভাবে ব্যাকুল, এই দুনিয়া তার বিপরীত। আল্লাহ আমাদের মনে এমনই এক ব্যাকুলতা দিয়েছেন, যা অসীম ও পূর্ণতার ছোঁয়া ছাড়া কোনোভাবেই মিটে না। অস্থায়ী কোনো কিছুর মধ্যে পূর্ণতাকে খুঁজতে গিয়ে বস্তুতঃ আমরা একটা হলোগ্রাম ... তথা মরীচিকার পেছনেই ছুটছি মাত্র। আমাদের অবস্থা হয়েছে নাঙ্গা হাতে চুন, সুড়কির কংক্রিট খোঁড়ারই মতো। প্রকৃতিগতভাবে কোনো ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে অসীমে পরিণত করতে চাওয়া আগুন থেকে পানি বের করার মতই অসম্ভব। এতে আগুনে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। দুনিয়াকে যখন আমরা আর নিজেদের আশার কেন্দ্র বানাবো না, দুনিয়া যা নয় এবং যা কখনো হবে না অর্থাৎ দুনিয়াকে জান্নাত বানানোর চেষ্টা যখন আমরা থামাবো, কেবল তখনই দুনিয়ার এই জীবন আমাদের মন ভাঙা বন্ধ করবে।

উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুই ঘটে না, একেবারে কিছুই না – এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এমনকি ভগ্ন হৃদয় এবং দুঃখের পেছনেও নিহিত থাকে কোনো না কোনো হেতু। ওই ভগ্ন হৃদয়, ওই দুঃখ আমাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বার্তা নিয়ে আসে। কোথাও কোনো ভুল আছে, এরা আমাদেরকে এই সতর্কবার্তা দেয়। আমাদের পরিবর্তনের সময় হয়েছে, এগুলো আমাদের হুশিয়ার করে। যেমনিভাবে আগুনে হাত রাখলে আমরা যন্ত্রণাবোধ করি এবং এই যন্ত্রণা আমাদেরকে আগুন থেকে হাত সরাতে বলে। আবেগঘন যন্ত্রণা ও দুঃখ আমাদেরকে আত্মিক পরিবর্তনের জরুরি বার্তা দেয়। আমাদের প্রয়োজন হয় (যন্ত্রণার কারণ থেকে) সরে আসার। যন্ত্রণা আমাদেরকে সরে আসতে বাধ্য করে। ভালোবাসার মানুষ যেমন করে আপনাকে একের পর এক কষ্ট দেয়, তেমনি দুনিয়াও আমাদেরকে এভাবেই কষ্ট দিতে থাকে, ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমরা এর থেকে সরে আসি। দুনিয়া আমাদেরকে যতই বেদনাগ্রস্থ করবে, আমরাও অবধারিতভাবে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ততই কমাতে থাকবো।

এই দুঃখ ও বেদনা, আমাদের অনুরাগ ও আসক্তির একটি সূচক বা নির্দেশক। যা আমাদেরকে কাঁদায়, যা আমাদেরকে সবচেয়ে বেদনাগ্রস্থ করে, সেখানেই মূলত আমাদের মিথ্যা অনুরাগ ও আসক্তিগুলি বিরাজ করে। এগুলোর পরিবর্তে আল্লাহর সাথেই আমাদের গভীর সম্পর্ক থাকা দরকার। আর বস্তুতঃ যে জিনিসগুলোতে আমাদের অনুরাগ ও আসক্তি থাকে, সেগুলোই আল্লাহর পথে আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখ ও বেদনাই আমাদের মাঝে নিহিত থাকা মিথ্যা অনুরাগ ও আসক্তিগুলোকে দৃশ্যমান করে। বেদনা আমাদের জীবনে পরিবর্তনের মনোবৃত্তি তৈরি করে এবং নিজের অবস্থার মাঝে যদি অপছন্দনীয় কিছু পাওয়া যায়,

তবে সেটা পরিবর্তনের আল্লাহর দেওয়া ফর্মূলা রয়েছে। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ কখনো কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে।" (কুরআন, ১৩:১১)

একই ধরনের নৈরাশ্য ও মর্মবেদনার সাগরে বছরের পর বছর ডুবে থাকার পর, অবশেষে আমি গভীরভাবে কিছু জিনিস উপলব্ধি করতে থাকি। আমি সব সময় মনে করতাম, বস্তুগত জিনিসের মোহে আসক্ত থাকাই হচ্ছে দুনিয়ার প্রেমের আসল মর্ম। আর আমি বস্তুগত জিনিসের মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম না। আমার আসক্তি-অনুরাগ ছিল মানুষের সাথে। আমি আসক্ত থাকতাম ভালোবাসার মুহূর্তগুলো আর আবেগের সাথে। তাই মনে করতাম, দুনিয়া প্রেমের এই কথাটি অন্তত আমার বেলায় প্রযোজ্য নয়। মানুষ, সময়, আবেগ সবই যে দুনিয়ার একটি অংশ, এটা আমার মাথায় ছিল না। আমি উপলব্ধি করতে পারিনি যে, জীবনে আমি যত দুঃখ ও বেদনার সাক্ষী হয়েছি, সেগুলোর পেছনে যে কেবল একটি জিনিসই দায়ী, আর তা হলো: দুনিয়ার প্রেম।

বিষয়গুলো যখন আমি আত্মস্থ করতে শুরু করি, আমার চোখের থেকে পর্দার আবরণ তখন সরে যেতে থাকে। সমস্যার মূল উপলব্ধি করতে আমি শুরু করি। এই জীবনের কাছে সে যা নয়, যা কখনো হতে পারবে না, তাই আমি আশা করেছিলাম। আমি সেই [অপূর্ণ] জীবনটাকে নিখুঁত, পূর্ণ ভাবতাম। একজন আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে আমি আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে একে নিখুঁত বা পূর্ণ করার জন্য সংগ্রাম করতাম। একে নিখুঁত হতেই হবে, আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার সংগ্রাম বহাল রাখবো, এই ছিল আমার মনোভাব। আমি আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু, ঘাম ও অশ্রু দিয়ে চেয়েছি এই দুনিয়াকে জান্নাত বানাতে। আমি চাইতাম আমার আশেপাশের লোকগুলো নিখুঁত ও ত্রুটিহীন হোক। চাইতাম আমার সম্পর্কগুলোর পূর্ণতা। আমার চারপাশের মানুষ ও জীবন থেকে আমি অনেক বেশি আশা করতাম। প্রত্যাশা, প্রত্যাশা আর শুধুই প্রত্যাশা। আর অসুখী হওয়ার যদি কোনো শ্রেষ্ঠ রেসিপি থাকে, তবে তা হচ্ছে: প্রত্যাশা। আর এখানেই ছিল আমার সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। মানুষ হিসেবে প্রত্যাশাটা আমার ভুল ছিল না, বরং আমাদের সব সময়ই আশাবাদী থাকতে হবে। সমস্যা হলো: 'কোথায়' আমি ওই আশাকে রেখেছি এবং 'কোথায়' আমি আমার প্রত্যাশার ফানুস জ্বেলেছি। কেননা, দিন শেষে আমার আশা ও প্রত্যাশার ফানুস যে আমি আল্লাহর জন্য জ্বালিনি। আমার সকল আশা ও প্রত্যাশা ছিল মানুষদের ওপর, সম্পর্ক ও নানাবিধ অবলম্বনেরই মাঝে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই দুনিয়ার উপরেই ছিল আমার ভরসা।

আর তাই আমি এক চরম সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। আমার হৃদয় জুড়ে কুরআনের একটি আয়াত ঘুরপাক খেতে থাকে। ওই আয়াতটি আমি আগেও শুনেছি, কিন্তু প্রথমবারের মতো ওই আয়াত আমি উপলব্ধি করি। উপলব্ধি করে চমকে উঠি যে, আরে ওই আয়াত তো আমার কথাই বলছে: "যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, উল্টো তারা পার্থিব জীবন নিয়েই তুষ্ট এবং উৎফুল্ল, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহ থেকে আসলেই গাফেল।" (কুরআন, ১০:৭)

আমি এই দুনিয়াতেই সব পেতে পারি, এমনটি ভেবে আমি তো আমার আশাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিবেদিত করিনি। আমার আশা ও ভরসা তো কেবল দুনিয়া কেন্দ্রীক। কিন্তু নিজের আশা-ভরসাকে দুনিয়া কেন্দ্রীক করার তাৎপর্য কি? কিভাবে এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? অর্থাৎ আপনার বন্ধুবান্ধবরা আপনার শূন্যতা মেটাবে, অন্তত এই প্রত্যাশাটুকু করবেন না। বিবাহ করলে স্বামী বা স্ত্রী আপনার সকল প্রয়োজন মেটাবে, অন্তত এই প্রত্যাশা করবেন না। সক্রিয় আন্দোলন কর্মী হলে পরিণতির ওপর নির্ভর করবেন না। বিপদে পড়লে না নিজের ওপর আর না লোকজনের ওপর ভরসা করবেন, ভরসা শুধু আল্লাহর ওপরই করবেন।

হ্যাঁ, মানুষের কাছে সাহায্য চান –কিন্তু সেইসাথে মনে রাখবেন মানুষ (এমনকি আপনার নিজ সত্তা) আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়। কেবল আল্লাহই পারেন আপনাকে রক্ষা করতে। লোকজন তো শুধু উসিলা, যেটা আল্লাহ [আপনাকে রক্ষার জন্য] ব্যবহার করেন। কিন্তু তারা কখনো সাহায্য, আনুকূল্য ও নাজাতের উৎস নয়। কেবল আল্লাহই এসবের উৎস। আরে মানুষ তো একটি মাছির পাখা বানানোরও ক্ষমতা রাখে না (কুরআন, ২২:৭৩)। এজন্য যতই বাহ্যিকভাবে মানুষের সাথে লেনাদেনা করুন না কেন, আত্মিকভাবে নিজের অন্তরকে আল্লাহর কাছে নিবেদিত রাখুন। কেবল আল্লাহর মুখাপেক্ষী হন, যেমটি নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: "আমি স্বীয় মুখমণ্ডলকে তাঁরই পানে নিবেদিত করেছি, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (কুরআন, ৬:৭৯)

নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) কিভাবে এই সত্য উপলব্ধিতে উপনীত হলেন? চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ[৪] নিয়ে তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করেন এবং উপলব্ধি করেন এগুলোর কিছুই স্থায়ী তো নয়ই, বরং এগুলোর সবই অস্তশীল।

---

[৪] সব যুগেই এগুলোর পূজা করা হতো। মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে এদের বিবেচনা করা হয়। আজকের তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরাও রাশিচক্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, *Horoscope* ইত্যাদি নামে এগুলোকে কেন্দ্র করে শিরক করে চলেছে –(সম্পাদক)।

আসলে এগুলো আমাদেরকে কেবল হতাশই করে।

এসব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দিকে মুখ করেন। তার মতো করে আমাদেরও উচিত হবে আমাদের সকল আশা, আস্থা ও নির্ভরতাকে আল্লাহ এবং শুধু আল্লাহরই ওপর স্থাপন করা। শান্তির সন্ধান পাওয়া এবং অন্তরের স্থিরতা বলতে কি বুঝায়, সেটা আমরা তখনই বুঝতে পারবো, যখন নিজেদের সকল আশা, আস্থা এবং নির্ভরতাকে আমরা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে সফল হবো। কেবল তখনই বস্তুবাদীতার এই রোল্যার কোস্টার, যা আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটবে। কেননা, আমাদের আত্মিক অবস্থা যদি সংজ্ঞাগতভাবেই অস্থিতিশীল কোনো বস্তুর ওপর নির্ভর করে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আত্মিক অবস্থাও অস্থিতিশীল হবে। আমাদের আত্মিক অবস্থা যদি সদা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসের ওপর নির্ভর করে, তবে আমাদের আত্মিক অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই অস্থির, বিক্ষুব্ধ ও উতলা হবে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে এক মুহূর্তে আমরা হয়তো সুখী হবো, কিন্তু যখনই ওই বস্তুটি বদলে যাবে, যেটার ওপর আমার সুখ নির্ভর করছিল, তখনই আমাদের সুখও তেমন করে বদলে যাবে। আমরা বিষাদে মুষড়ে পড়বো। এক চরম অবস্থা থেকে প্রতিনিয়ত আমরা আরেক চরম অবস্থাতে ঘুরপাক খেতে থাকি এবং কখনো বুঝতে পারি না, কেন এমনটি হচ্ছে।

আমরা আবেগের এই রোলার কোস্টারে[*] চড়ার অভিজ্ঞতা লাভ করি, কারণ যে পর্যন্ত না আমাদের ভালোবাসা ও নির্ভরতা কোনো স্থিতিশীল ও মজবুত কোনো কিছুর ওপর স্থাপিত না হয়, সে পর্যন্ত আমরা স্থিতিশীল ও স্থায়ী শান্তি পেতে পারি না। কিভাবে আমরা স্থিরতা ও স্থায়িত্বের আশা করবো, যখন আমাদের আঁকড়ে ধরা জিনিসটিই অস্থির ও ক্ষীয়মান? আবু বকরের বক্তব্যে এই সত্যের সার্থকতা ফুটে উঠেছে। নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মৃত্যু সংবাদ লোকদের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং এই সংবাদ তারা সহ্য করতে পারছিল না। কেউই আবু বকরের মতো করে নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে ভালোবাসেনি, কিন্তু আবু বকর ঠিকই জানেন নিজের নির্ভরশীলতাকে কোথায় স্থাপন করতে হয়, তাই তো তিনি বলতে পারেন: "তোমরা যদি মুহাম্মদের উপাসনা করে থাকো, তবে জেনে রাখো, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করে থাকো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।"

[*] রোলার কোস্টার: এক ধরনের বিনোদনমূলক রাইড (*Ride*) যা বিশ্বের অধিকাংশ *Amusement Park* গুলোতে দেখা যায়। এর ট্রেনটি অনেক উচ্চতা থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিচে নেমে আসে, আবার খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠে। লেখিকা এখানে মানুষের সাথে সম্পর্কের চড়াই-উতরাইকে 'রোলার কোস্টারে'-এর সাথে তুলনা করেছেন – (সম্পাদক)।

যদি এমন মানসিক অবস্থায় উপনীত হতে চান, তবে আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছুকে কখনো নিজের পরিতৃপ্তির উৎস বানাবেন না। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছুকে কখনো সফলতা, ব্যর্থতা বা আত্মমর্যাদার মানদণ্ড বানাবেন না (কুরআন, ৪৯:১৩)। আর এমনটি করলে কিছুই আপনাকে ভেঙে চুরমার করতে পারবে না, কারণ আপনি এমন এক হাতল ধরে আছেন, যা কখনো ভাঙ্গে না। ফলশ্রুতিতে আপনি হবেন অজেয়, কারণ আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন এক অজেয় সাথি। আপনি কখনো শূন্য বোধ করবেন না, কারণ আপনার পরিতৃপ্তির উৎসের নেই কোনো লয় ও ক্ষয়।

১৭ বছর বয়সে দেখা ওই স্বপ্নের দিকে ফিরে তাকালে, আমার বড়ই অবাক লাগে। অবাক লাগে এই ভেবে, হয়তো ওই ছোট্ট বালিকাটি আমিই ছিলাম। অবাক লাগে, কারণ আমি যে জবাবখানা তাকে দিয়েছি, সেটা ছিল এক শিক্ষনীয় উপদেশ এবং এই শিক্ষা পেতে আমাকে পরবর্তীতে বহু যন্ত্রণাকাতর বছর কাটাতে হয়েছে। মানুষ কেন আরেকজনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়, তার করা এই প্রশ্নের উত্তরঃ [মানুষ আরেকজনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য], "যেহেতু এই দুনিয়ার জীবন পরিপূর্ণ নয়। আর দুনিয়ার জীবন যদি পরিপূর্ণ হয়েই থাকে, তবে আখিরাতের জীবনকে কি বলে সম্বোধন করতে হবে?"

মানুষ চলে যায়, কিন্তু তারা ফিরে আসে কি?

চলে যাওয়াটা কষ্টের। হারানোটা আরও বেদনার। 'মানুষ কেন আরেকজনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়?' কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি এই প্রশ্নটি করেছিলাম। এর উত্তর আমাকে আমার জীবনের গভীরতম কিছু উপলব্ধি ও চড়াই উতরাইয়ের ময়দান ঘুরিয়ে আনে। এদিকে এই প্রশ্ন আমাকে আরেকটি বিষয় নিয়ে ভাবিয়ে তোলো, আর তা হলোঃ চলে যাওয়ার পর মানুষ কি আবার ফিরে আসে? আমাদের ভালোবাসার বস্তুকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর, সেটা কি আবার ফিরে আসে? হারানোটা কি চিরস্থায়ী –কিংবা এটা উচ্চতর লক্ষ্য হাসিলের একটি মাধ্যম? হারানোটা কি স্বয়ং সমাপ্তি, নাকি এটা আমাদের আত্মিক অসুস্থতার এক সাময়িক চিকিৎসা?

এই জীবনের একটি অবাক করা দিক রয়েছে। এই দুনিয়ার যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে যন্ত্রণা দেয়, সেগুলোই আবার আমাদের যন্ত্রণা লাঘব করেঃ কেননা, এখানে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এটার মানে কি? আমার ফুলদানিতে থাকা নজর কাড়া সৌন্দর্যের গোলাপটি আগামীকালই শুকিয়ে যাবে। এটার মানে, আমার যৌবন এক সময় আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আবার এটার মানে, আজ আমি যে দুঃখ অনুভব করছি, কাল সেটা থাকবে না। আমার যন্ত্রণার মৃত্যু হবে। আমার হাসি যেমন চিরকাল থাকবে না, তেমনি আমার কান্নার অশ্রু চিরকাল বইবে না। আমরা বলি, এই জীবন পরিপূর্ণ নয়। আসলেই এটা পরিপূর্ণ নয়। না এটা সম্পূর্ণরূপে ভালো, আর না এটা একইভাবে পুরোপুরি মন্দ।

মহিমান্বিত আল্লাহ তাৎপর্যপূর্ণ এক আয়াতে আমাদেরকে বলে দিচ্ছেনঃ "বস্তুত কষ্টের সাথেই আসে সুখ।" (কুরআন, ৯৪:৫) বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বোধোদয় হয়, ভুলভাবে আমি এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করেছি। আমি ভাবতাম এটার মর্ম এরূপঃ কষ্টের পর আসে সুখ। একটু ভিন্নভাবে বললে, আমি ভাবতাম ভালো সময় ও মন্দ সময় দিয়েই জীবন গঠিত। মন্দ সময়ের পর আসে ভালো সময়। আমি ভাবতাম জীবন হয় সম্পূর্ণ ভালো আর না হয় জীবন সম্পূর্ণ মন্দ। কিন্তু আয়াতটি তা বলছে না। এই আয়াত বলছে, কষ্টের *সাথে* আসে সুখ। কষ্ট যে সময়ে আসে, সুখ ঠিক সে

সময়ে আসে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, এই পার্থিব জীবনে কিছুই সম্পূর্ণরূপে মন্দ না (আর নয় সম্পূর্ণরূপে ভালো)। আমাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি মন্দ অবস্থার মাঝেও এমন কিছু জিনিস আছে, যেটার মধ্যে সব সময় এমন কিছু থাকে, যার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। বিপদ-মুসিবতের সাথে সাথে সেসবকে সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্যও মহান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন।

আমরা যদি আমাদের কঠিন সময়গুলো পর্যালোচনা করি, তবে দেখবো, কঠিন পরিস্থিতিগুলোও বহু কল্যাণে পরিপূর্ণ। প্রশ্ন হচ্ছে –আমরা কোন বিষয়টার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো? আমার মনে হয়, আমরা যে ফাঁদে পা দেই, সেটার মূলভিত্তি এই মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই জীবন সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হবে –হয় একদম ভালো, আর না হয় একদম মন্দ। কিন্তু দুনিয়া (তথা এই জীবনের) প্রকৃতি এমন নয়। আখিরাতের প্রকৃতি এরূপ। আখিরাতকে বানানোই হয়েছে সকল জিনিস পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। জান্নাত পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে ভালো। এটাতে মন্দ বলে কিছুই নেই। অন্যদিকে জাহান্নাম পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে মন্দ। ভালোর ছিটে ফোঁটাও এটাতে নেই। (*মহান আল্লাহতায়ালা তা হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন*)।

এই বাস্তবতাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি না করার ফলশ্রুতিতে, নিজের জীবনের ক্ষণস্থায়ী পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর দ্বারা আমি আপ্লুত হয়ে পড়তাম (সেটা ভালোই হোক বা মন্দ)। প্রতিটি পরিস্থিতিকে আমি প্রবলভাবে অনুভব করতাম –যেন এটাই চূড়ান্ত, কিংবা এটা কখনো শেষ হবে না। ওই মুহূর্তে আমার আবেগের আতিশায্যে গোটা দুনিয়া ও এর সকল কিছুকে বদলে দিতো। আমি যদি ওই মুহূর্তে খুশি হতাম, তবে অতীত, বর্তমান, নিকট ও দূর তথা গোটা জগৎ ওই মুহূর্তে খুশিতে ভরে যেতো। যেন সেখানে বিরাজ করতো পূর্ণতা। মন্দ পরিস্থিতির বেলাতেও একই জিনিস ঘটতো। নেতিবাচকতা আচ্ছন্ন করে ফেলতো আমার সব কিছুকে। এটা পরিণত হতো আমার গোটা দুনিয়া, অতীত-বর্তমানে এবং ওই মুহূর্তে আমার জন্য গোটা বিশ্ব-সংসার মন্দে বদলে যেত। কেননা, এটাই যে আমার দুনিয়া, এর বাইরে যে আমি কিছুই দেখতে পেতাম না, ওই মুহূর্তে অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। আপনি যদি আমার সাথে আজ খারাপ আচরণ করেন, তবে সেটা এজন্য যে, আপনি আর আমাকে পছন্দ করেন না – এবং সেটা এজন্য নয় যে, অসীম সংখ্যক মুহূর্তের মাঝে একটি মুহূর্তে এমনটি ঘটে গেছে অথবা আপনি ও আমি এবং এই দুনিয়ার কোনোটাই নিখুঁত নয়। ওই মুহূর্তে আমার অনুভূতি হতো পূর্বাপর সম্বন্ধের সাথে সম্পর্কহীন। কেননা, এ ঘটনা আমার গোটা জীবন দর্শনকে বদলে দিতো।

আমি মনে করি, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অনেকে বিশেষভাবে এমন মনোভাব ধারণ করেন, সম্ভবতঃ এজন্যই আমরা *'আমি তোমার থেকে কখনো*

ভালোকিছু দেখিনি' ধরনের মনোভাবের শিকার হয়ে পড়তে পারি, যেটার ইশারা নবি (ﷺ) তার এক হাদিসে দিয়েছেন। আমাদের কেউ কেউ এমনটি বলে ফেলেন, কিংবা এমনটি অনুভব করেন, সম্ভবত এজন্য যে, কার্যত ওই মুহূর্তে আমরা ভালো কিছুই দেখতে পাই না। কারণ ওই মুহূর্তে আমাদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি সব কিছুকে প্রতিস্থাপিত ও সংজ্ঞায়িত করে এবং সেটাই সব কিছু বনে যায়। একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তখন অতীত ও বর্তমানের সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

এই জীবনের কিছুই সম্পূর্ণ নয়, এই সত্যের যথাযথ উপলব্ধি, জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। সহসাই কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা ক্ষণ আর আমাদের আচ্ছন্ন করতে পারে না। কিছুই এখানে সীমাহীন নয়, এখানে কিছুই *কামিল* (পূর্নাঙ্গ ও সম্পূর্ণ) নয়, এই [সত্য] উপলব্ধি করলে, আল্লাহ আমাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির বাইরে পা রাখার যোগ্যতা দান করেন এবং এগুলোর প্রকৃত যে রূপ, তা আমাদেরকে দেখতে সক্ষম করেন। এগুলো আসলেঃ না মহাবিশ্ব, না একমাত্র বাস্তবতা, না অতীত ও বর্তমান, বস্তুত এগুলো অসীম মুহূর্তের মাঝে একটি মূহূর্ত মাত্র ... এবং এগুলোও অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

আমি কাঁদি অথবা হেরে যাই বা আঘাতপ্রাপ্ত হই, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুই চূড়ান্ত নয়। যতক্ষণ আগামীকাল আছে, আছে পরবর্তী মুহূর্ত, ততক্ষণ আছে আশা, আছে পরিবর্তনের সুযোগ এবং রয়েছে উত্তরণের পথ। যা হারিয়ে গেছে, সেটা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়নি।

যা হারায়, তা ফিরে আসে কি আসে না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় চমৎকার সব উদাহরণ আমার অধ্যয়নে পাই। ইউসুফ (*আলাইহিস সালাম*) কি তার বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিলেন? মুসা (*আলাইহিস সালাম*) কি তার মায়ের কাছে ফিরে গেছেন? বিবি হাজেরা কি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর কাছে ফিরেছিলেন? স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তান কি আইয়ুব (*আলাইহিস সালাম*)-এর কাছে ফিরেছিল? এসব ঘটনা থেকে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ ও চমৎকার কিছু শিক্ষা পাই। তা হলোঃ আল্লাহ যা তুলে নেন, তা কখনো হারায় না। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সাথে যা থাকে সেটাই রয়ে যায়। বাকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

"তোমাদের সাথে যা কিছু আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আছে আল্লাহর কাছে, তা রয়ে যাবে চিরকালের জন্য। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে, তার থেকে উত্তম পুরস্কার দান করবো।" (কুরআন, ১৬:৯৬)

তাই, যা কিছু আল্লাহর সাথে আছে, সেগুলো কখনো হারায় না। প্রকৃতপক্ষে, নবি (ﷺ) বলেন:

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু তুমি ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার পরিবর্তে এমন কিছু দেন, যেটা তোমাদের কাছে থাকা ওই বস্তুর থেকেও উত্তম হয়।" [আহমদ]

আল্লাহ কি উম্মে সালমার স্বামীকে তুলে নিয়ে, [ওই স্বামীর] স্থলে নবি (ﷺ)-কে প্রতিস্থাপন করেননি?[৬]

কখনো কিছু দেওয়ার জন্য আল্লাহ কিছু জিনিস তুলে নেন। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যেভাবে চাই, তিনি আমাদেরকে সব সময় সেভাবে দান করেন না। কোনটা উত্তম, সেটা তিনিই ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন:

"হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করো, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হয়তো তোমরা কোনো জিনিস পছন্দ করো, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। বস্তুত আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জানো না।" (কুরআন, ২:২১৬)

কোনো জিনিসকে যখন এক রূপে বা অন্য রূপে ফেরতই দেওয়া হবে, তবে সেটা তুলে নেওয়া হয় কেন? সুবহানাল্লাহ। বস্তুত "হারানোর" এই প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে [কোনো কিছু] দেওয়া হয়।

আল্লাহ আমাদেরকে উপহার দান করেন এবং এরপর আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওই দানকৃত বস্তুর ওপর নির্ভর করতে শুরু করি। তিনি আমাদেরকে অর্থ দেন, আর আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অর্থের ওপর নির্ভর করতে শুরু করি। যখন তিনি আমাদেরকে আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-সহযোগী দিয়ে সাহায্য করেন, তখন তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা সেসব মানুষের ওপর নির্ভর করতে শুরু করি। যখন তিনি আমাদেরকে

[৬] উম্মে সালমা (রা.)-এর স্বামী আবু সালমার (রা.)-এর মৃত্যুর পর রসুল (ﷺ) উম্মে সালমা (রা.)-কে বিয়ে করেন। —(সম্পাদক)।

প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা দান করেন, তখন আমরা সেগুলোর ওপর ভরসা করি এবং সেগুলোর দ্বারা বিভ্রান্ত হই। যখন তিনি আমাদেরকে স্বাস্থ্য দেন, তখন আমরা প্রতারিত হই। ভাবতে শুরু করি, আমরা বুঝি কখনো মরবো না।

আল্লাহ আমাদেরকে উপহার দিয়ে ধন্য করেন, কিন্তু আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসা প্রয়োজন, আমরা সেটা না করে উল্টো ওই উপহারগুলিকে সেভাবে ভালোবাসতে শুরু করি। আমরা ওই উপহারগুলো গ্রহণ করি এবং সেগুলো নিজেদের হৃদয়ে গভীরভাবে স্থান দিতে থাকি, যতক্ষণ না আমাদের হৃদয় সেগুলি দিয়ে পূর্ণ হচ্ছে। শীঘ্রই অবস্থা এমন হয় যে, আমরা ওই জিনিসগুলো ছাড়া চলতে পারি না। আমাদের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত ওই জিনিসগুলোর চিন্তায় বিভোড় থাকি। সেগুলোর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি এবং সেগুলোর আরাধনা শুরু করি। যে মন ও অন্তরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, কেবল তাঁরই জন্য, সেটা তখন অন্য কিছুর বা অন্যের সম্পত্তি বনে যায়। এরপর আসে ভয়, হারানো ভয় আমাদেরকে যেন পঙ্গু করে ফেলে। যে উপহারের থাকার কথা ছিল আমাদের হাতে, আমাদের গোটা সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আর তাই সেটা হারানোর ভয় আমাদেরকে গ্রাস করে। এক সময়ের উপহার, শীঘ্রই একটা নির্যাতনের হাতিয়ার ও নিজেদের গড়া এক কারাগারে পরিণত হয়। কিভাবে আমরা এটার হাত থেকে মুক্তি পাবো? মাঝে মাঝে আল্লাহর অসীম করুণা বলে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দেন ... ওই উপহারটি তুলে নিয়ে।

ওই উপহার তুলে নেওয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। ওই হতাশা ও প্রয়োজনের সময় আমরা [তাঁর কাছে] প্রার্থনা করি, মিনতি করি এবং দু'আ করি। হারানোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা, বিনয় এবং তাঁর ওপর নির্ভর করার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছাই, অন্য কোনোভাবে যেখানে পৌঁছানো আমাদের জন্য সম্ভব ছিল না –যদি না সেই আরাধ্য প্রিয় বস্তুটি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া না হতো। হারানোর মাধ্যমে আমাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ মুখী হয়।

সন্তানকে যখন আপনি কোনো খেলনা বা নতুন কোনো ভিডিও গেম দেন, যেটা সে সব সময় চাইতো, তখন কি ঘটে? সারাদিন সে ওইসব নিয়েই পড়ে থাকে। শীঘ্রই তার আর কিছুই করতে মন চায় না। অন্য কিছু তার চোখে পড়ে না। সে তার জরুরি কাজগুলি এমনকি নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। নিজের ক্ষতির জিনিসটি নিয়ে সে সম্মোহিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্নেহময়ী পিতামাতা হিসেবে আপনি কি করেন? সে যে নেশা বা মোহতে আচ্ছন্ন হয়েছে এবং সে যেভাবে মনোযোগ ও

ভারসাম্যকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে, আপনি কি তাকে সেটাতে ডুবে যেতে দেবেন? না।

আপনি [ওই খেলনা বা ভিডিও গেম] সরিয়ে নেবেন।

আর যখনই ওই শিশু নিজের অগ্রাধিকারকে ঠিক মতো বুঝে নেয়, মানসিক সুস্থতা ও ভারসাম্য ফিরে পায় এবং যখন তার হৃদয়, মন ও জীবনে যথাযথ মর্যাদা ও সবকিছুকে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হয়, তখন কি ঘটে? আপনি ওই উপহার ফিরিয়ে দেন। অথবা সেটার চেয়ে ভালো কিছু দেন। কিন্তু এই সময় উপহার আর তার অন্তরকে দখল করে ফেলে না। এটা তার উপযুক্ত স্থানে থাকে। হ্যাঁ, তখন সেটা তার হাতে অবস্থান করে।

তদপুরি সরিয়ে নেওয়া বা তুলে নেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি ঘটে। উপহার হারানো এবং সেটা ফেরত পাওয়াটা সামান্য কিছু নয়। আপনার গাফেলতি, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভর করা এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করাকে কেড়ে নিয়ে, সেগুলোর স্থানে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা এবং কেবল তাঁর দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করার যে গুণ দান করা হয়, সেটাই প্রকৃত উপহার। এজন্যই আল্লাহ তাঁর দানগুলো আটকে রাখেন।

আর তাই কখনো কখনো "আরও ভালো কিছু" পরিণত হয় সর্বোত্তম উপহারে, [আর তা হলো]: তাঁর নৈকট্য। আল্লাহ মালিক বিন দিনারের[৭] কন্যাকে তুলে নিয়ে তাকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তার কন্যাকে তুলে নিয়ে, সে স্থানে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন, তাকে পাপের জীবন থেকে মুক্তি দেন এবং মহান স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে তাকে বাঁচান। প্রাণপ্রিয় কন্যা হারানো সত্ত্বেও তিনি এমন এক জীবনের সন্ধান লাভ করেন, যে জীবনে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে কাটান। এমনকি যে কন্যাকে তার কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, চিরকালের জন্য সে জান্নাতে মালিক বিন দিনারের সাথেই থাকবে।

---

[৭] মালিক বিন দিনার (র.) ছিলেন ভারতে আগত একজন বিখ্যাত তাবেয়ি। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ভারতের কেরালায় মৃত্যুবরণ করেন। কেরালার কাসারাগোদে 'Kasaragod' মালিক বিন দিনার মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তার কবর অবস্থিত।

প্রাথমিক জীবনে মালিক বিন দিনার উশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন মদ্যপ। তার প্রিয়তমা শিশু কন্যার মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি তার অধঃপতিত জীবনের চরম পরিণাম সম্পর্কে এক স্বপ্ন দেখেন। সেখানে তিনি দেখেন তার প্রিয়তম কন্যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার পথ দেখায়। ঘুম ভেঙে তিনি তওবা করেন এবং পরবর্তীতে উম্মতের এক আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উস্তাদ ইমাম ইবনুল কুদামা কিতাব 'আত-তাওওয়াবিন'-এ মালিক বিন দিনারের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেন –(সম্পাদক)।

ইবনে কাইয়্যিম (*আল্লাহ তার প্রতি রাজি থাকুন*) তার *'মাদারিজ আস-সালিকিন'* গ্রন্থে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

> "মুমিনদের জন্য যে ঐশ্বরিক ফয়সালা নির্ধারিত, সেটা সর্বদাই এক নেয়ামত, যদিও সেটা কখনো (কামনাকৃত জিনিসকে) আটকে রাখার মতো হয় এবং এটা এক আশীর্বাদ, যদিও সেটা পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের মতো মনে হয়, যেটা ওই মুমিনকে আক্রান্ত করে। সে আসলে তার জন্য প্রতিষেধকের মতো, যদিও সেটা রোগের বেশে আবির্ভূত হয়।"

'একবার যা হারায়, সেটা কি পুনরায় ফিরে আসে' এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: হ্যাঁ, সেটা ফিরে আসে। আরও উত্তম রূপে। কখনো এখানে, কখনো সেখানে, কখনো ভিন্ন রূপে। তুলে নেওয়া এবং ফেরত দেওয়ার অন্তরালে নিহিত থাকে সর্বোত্তম উপহারটি। আল্লাহ আমাদেরকে বলেন:

> "বলো, 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতে। সুতরাং তারা এতে আনন্দিত হোক। কেননা, তারা যা জমা করে বা গচ্ছিত রাখে, সেগুলো থেকে এটাই উত্তম।'" (কুরআন, ১০:৫৮)

আত্মিক শূন্যতা পূরণ ও বাড়ি ফেরা

আমরা আপন নিবাসে আছি।

আবার আমরা সেখানে নেইও। নিজেদের [সত্যিকার] উৎসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা সময় ও স্থান অতিক্রম করে ভিন্ন আরেক জগতে চলে আসি। চলে আসি অপেক্ষাকৃত হীনতর এক জগতে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের সময় বেদনার একটি ব্যাপার ঘটে। বাস্তব জগতে আমরা আর [সরাসরি] আল্লাহর সাথে নেই। নিজেদের চর্ম চোখে আমরা আর তাঁকে দেখতে করতে পারি না, পারি না সরাসরি তাঁর সাথে আলাপচারিতা করতে। আমাদের পিতা আদম (*আলাইহিস সালাম* –সালাম বর্ষিত হোক তার ওপর) যেভাবে পেতেন, আমরা ওই একই রকম শান্তি আর অনুভব করি না।

আমরা জমিনে নেমে আসি। তাঁর থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হই। আর বিচ্ছেদের ওই যন্ত্রণাতে আমরা রক্তাক্ত হই। এই প্রথমবারের মতো আমরা রক্তাক্ত হই। আমাদের সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ওই ঘটনা [আমাদের মাঝে] এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। ওই গভীর ক্ষত সাথে নিয়েই আমরা জন্ম গ্রহণ করি। আর যখন আমরা বড় হতে থাকি, আমাদের ওই ক্ষতের যন্ত্রণা ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। কিন্তু সময় যতই পার হতে থাকে, আমাদের ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতির মধ্যে নিহিত এর প্রতিষেধক থেকে আমরা কেবল দূরেই সরতে থাকি। আর সে এন্টিডোট বা প্রতিষেধক হচ্ছে: মন, অন্তর ও আত্মা দিয়ে তাঁর নিকট থেকে নিকটতর হওয়া।

আর যতই দিন পার হতে থাকে, আমরাও ওই শূন্যতা পূরণের জন্য ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হতে থাকি। কিন্তু শূন্যতা পূরণের এই অনুসন্ধানে আমরা হোঁচট খেয়ে বসি। আমাদের প্রত্যেকে বিভিন্ন জিনিসে হোঁচট খাই। আবার অনেকেই ওই শূণ্যতার অনুভূতিকে অসাড় করে দিতে চায়। আর তাই মানুষের মাঝে কেউ হোঁচট খায় মদ বা মাদকে, আবার কেউ হোঁচট খায় উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধে (*Sedatives*)। আবার কেউ হোঁচট খায় বস্তুগত ভোগ-বিলাসে বা প্রতিপত্তি ও অর্থের উপাসনায়। কেউবা আবার নিজ নিজ ক্যারিয়ারের আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

অথবা কেউ কেউ হোঁচট খায় অন্য মানুষে (অর্থাৎ সম্পর্ক ও ভালোবাসায়) এবং সেখানেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু প্রতিটি হোঁচট, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ, আমাদের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যই যদি হয় আমাদেরকে আপন উৎসের নিকট ফিরিয়ে আনার জন্য? যদি প্রতিটি জয়, প্রতিটি পরাজয়, প্রতিটি সৌন্দর্য, প্রতিটি পতন, প্রতিটি নিষ্ঠুরতা ও প্রতিটি হাসির প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় আমাদের ও মহান আল্লাহর মাঝে আরেকটি বাধা উন্মোচন করার জন্য? যদি এসবের উদ্দেশ্য হয় আমাদের ও আমাদের সেই উৎস, যেখানে ফেরার জন্য আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি, তার পথে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য?

এসব কিছুই যদি শুধুমাত্র তাঁকে দেখার জন্যেই হয়ে থাকে, তবে কেমন হবে?

আমাদেরকে এটা জানা খুবই জরুরি যে, এই জীবনে আমরা যত অভিজ্ঞতাই লাভ করি না কেন, তাদের একটিও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। আর ওই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবো কি করবো না, তার সিদ্ধান্ত আমরাই নিয়ে থাকি। উদাহরণ হিসেবে সৌন্দর্যের বিষয়টিই বিবেচনা করি। এমনও মানুষ আছে, যাদের চোখের সামনে সৌন্দর্য থাকলেও তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা চমৎকার সূর্যোদয় কিংবা সৌন্দর্যে ভরপুর কমলা বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবে, কিন্তু তারা এসব সৌন্দর্যের কিছুই খেয়াল করবে না।

অন্যরা সৌন্দর্য দেখে এবং সেটার মূল্যায়ন করে। তারা সেখানে থামবে এবং সে সৌন্দর্য উপভোগ করবে। এমনকি তারা হয়তো ওই সৌন্দর্যে অভিভূতও হবে। কিন্তু সেটা সেখানেই শেষ। এদের উপমা ওই লোকের মতো, যে শিল্পকে কদর করলেও শিল্পীর খোঁজ জানতে চায় না। বস্তুত শিল্পকর্ম এমন এক মাধ্যম, যার সাহায্যে শিল্পী কোনো বার্তা দিতে চায়, কিন্তু শিল্পের প্রেমিক যদি ওই শিল্পকর্মতেই হারিয়ে যান এবং ওই বার্তাকে কখনো চোখ মেলে না দেখেন, তবে ওই শিল্পকর্মটি তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারেনি।

আলোকজ্জ্বল সূর্য, প্রথম ঝরা তুষার, নবচন্দ্র এবং শ্বাসরুদ্ধকর সমুদ্র কেবল এই নিঃসঙ্গ গ্রহকে সজ্জিত করতে সৃজিত হয়নি। এগুলোর উদ্দেশ্য পৃথিবীকে সজ্জিতকরণের চেয়েও আরও গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে এসবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"বস্তুত আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের আবর্তন তাদের জন্য নিদর্শন, যাদের উপলব্ধি শক্তি রয়েছে।"

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(কুরআন, ৩:১৯০-১৯১)

"যারা দাঁড়িয়ে বা বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির বা স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে, (তারা বলে), "হে আমাদের প্রতিপালক, কিছুই আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। (অর্থহীনভাবে কোনো কিছু করা থেকে) আপনি পবিত্র, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

সকল সৌন্দর্যকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এক নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু ওই নিদর্শন কেবল বিশেষ একদল মানুষই উপলব্ধি করেঃ যারা চিন্তা করে (ভাবে, উপলব্ধি করে এবং নিজেদের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগায়) এবং প্রতিটি মানবীয় অবস্থাতে (দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে।

তাই সূর্যাস্তের [সৌন্দর্য] ভেদ করে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হবে। এমনকি সেখানেও আমরা নিজেদেরকে হারাতো পারবো না। চোখ ঝলকানো সৌন্দর্য ও বর্ণচ্ছটার ওপারে তাকাতে হবে। কেননা, এসবের পেছনে যে সৌন্দর্য লুকায়িত, সেটাই প্রকৃত সৌন্দর্য, সকল সৌন্দর্যের উৎস। আমরা যা কিছুই দেখি, সেটা এক প্রতিফলন মাত্র।

আমাদেরকে তারকাপুঞ্জ, বৃক্ষরাজি, তুষারাবৃত পর্বতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, যাতে করে এগুলোর অন্তরালে যে বার্তা নিহিত আছে, সেগুলো আমরা পাঠ করতে পারি। এমনটি না করলে আমাদের অবস্থা হবে ওই ব্যক্তির মতোই, যে সুন্দরভাবে সজ্জিত একটি বোতলে একটি বার্তা পায়, কিন্তু সে ওই বোতলের সৌন্দর্যে এতোটাই মোহিত হয় যে, বোতল খুলে সে আর ওই বার্তাটি পড়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

তারকাপুঞ্জের আতিশয্যের মাঝে কি এমন বার্তা লুকিয়ে আছে? সেখানে একটা নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু সেটা কিসের নিদর্শন? এসব নিদর্শন তাঁর দিকে এক

একটি নিদের্শক, এগুলো তাঁর বড়ত্ব, তাঁর পরাক্রমশীলতা, তাঁর সৌন্দর্যের দিকে ইশারা করে। এগুলো তাঁর শক্তি এবং তাঁর ক্ষমতার দিকে নির্দেশ করে। সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মহিমা নিয়ে ভাবুন, গবেষণা করুন, তাতে গভীরভাবে নিমগ্ন হোন, কিন্তু সেখানে যেন আটকে যাবেন না। সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না। এগুলো অতিক্রম করে সামনে দেখুন এবং একবার ভাবুন তো, সৃষ্টি যদি এতো রাজকীয় হয়, সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর, তবে স্রষ্টা কতটা রাজকীয় হবেন, কতটা সুন্দর ও মহান হবেন তিনি।

সবশেষে, উপলব্ধি করুন, আত্মস্থ করুন [কুরআনের এই বাক্য]:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ "হে আমাদের প্রতিপালক, কিছুই আপনি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। মহিমা আপনারই।" (কুরআন, ৩:১৯১)

সবকিছুরই একটি উদ্দেশ্য আছে। আসমান বা জমিন, কিংবা আমার বা আপনার মাঝে যা কিছু আছে, তার কিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট হয়নি। না আপনার জীবনের কোনো ঘটনা, না কোনো দুঃখ, না কোনো আনন্দ, না কষ্ট, না সুখ ... না কোনো ক্ষতি সর্বোপরি কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। তাই সূর্য, চন্দ্র ও আসমানরূপী বোতলে মাঝে 'যে বার্তা দেওয়া হয়েছে', আমাদেরকে সে বার্তাগুলি যেমন পাঠ করতে হবে, তেমনিভাবে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোর মাঝে যে বার্তা আছে, তাও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আমরা সর্বদাই নিদর্শন চাই। আল্লাহর কাছে আমরা সর্বদা এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সাথে 'কথা বলেন'। কিন্তু ওই নিদর্শনগুলো আমাদের চারদিকেই আছে। তারা সব কিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। আল্লাহ প্রতিনিয়ত 'কথা বলেই যাচ্ছেন'। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি [আল্লাহর ওই কথাগুলো] শুনতে পাচ্ছি? আল্লাহ বলেনঃ

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"যারা জানে না, তারা বলে, 'আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা আমাদের কাছে কেন কোনো নিদর্শন আসে না? আর এদের পূর্বের লোকেরাও এরূপ কথা বলেছিল। এদের অন্তরগুলি একই রকম। দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নির্দশনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।"

(কুরআন, ২:১১৮)

আমরা যদি দৃষ্টি সীমা ছাড়িয়ে নেপথ্যে যেতে পারি এবং আমাদের এই জীবনে আমাদের সাথে যাই ঘটুক না কেন, যা কিছুই আমরা করি –কিংবা করতে ব্যর্থ হই– তার সবকিছু ভেদ করে যদি আমরা আল্লাহকে দেখি (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে), তবেই আমরা আমাদের [জীবনের সত্যিকার] উদ্দেশ্যকে পেয়ে যাবো। আপনি পছন্দ করেন এমন কিছু যদি আপনার জীবনে ঘটে, সাবধান থাকুন, এই ঘটনার আসল উদ্দেশ্য যেন আপনার দৃষ্টির আড়াল চলে না যায়। মনে রাখবেন, কোনো কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না। তাই ওই কারণ খুঁজে বের করুন। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, সেটার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করুন। আপনাকে দান করা জিনিসের মধ্য দিয়ে তিনি নিজ সত্তা বা *যাতের* কোন দিকটি তুলে ধরতে চাচ্ছেন? তিনি আপনার কাছ থেকে কি চান?

একইভাবে, আপনি যেটা অপছন্দ করেন, আপনার সাথে তেমন কিছু যদি ঘটে কিংবা এমন কিছু যেটা আপনাকে কষ্ট দেয়, তবে ওই বেদনায় আপ্লুত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না। এই কষ্ট ভেদ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। "বোতালের" মাঝে যে বার্তা আছে, সেটা খুঁজে বের করুন। খুঁজে বের করুন এটার উদ্দেশ্য। এবং এটা যেন আপনাকে স্রষ্টার সত্তা ও পরিচয়ের দিকে আরেকটু ধাবিত করে।

যদি আপনার পা পিছলে যায়, এমনকি দ্বীনের কোনো বিষয়ে আপনি পতনেরও শিকার হন, তবুও আপনাকে প্রতারিত করার কোনো সুযোগ শয়তানকে দেবেন না। ওই পতন যেন আপনাকে স্রষ্টার রহমত আরও গভীরতার সাথে এবং পর্যালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে সহায়তা করে। এরপর ওই রহমত কামনা করুন, যে রহমত আপনাকে আপনার পাপ ও নিজ সত্তার বিরুদ্ধে করা যুলুম থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। বিষয়টি যদি সমাধানের অযোগ্য হয়ে থাকে, তবে হতাশ হবেন না। বরং যিনি তাঁর বান্দার জন্য যেকোনো জটিল ও আবদ্ধ বিষয়কে উন্মুক্ত করে থাকেন, সেই "আল-ফাত্তাহ"[৮]র ঝলক প্রত্যক্ষ করুন। আর তা যদি ভয়াবহ ঝড় হয়ে থাকে, তবে নিজেকে তলিয়ে যেতে দেবেন না। যখন আপনার পাশে কেউই নেই, তখন ওই ঝড়ের কবল থেকে কিভাবে তিনি তাঁর বান্দাকে এককভাবে উদ্ধার করেন, এই বিপদ যেন আপনাকে সেটাই প্রত্যক্ষ করায়।

এবং স্মরণ রাখবেন, যখন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং যখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না, কেবল তিনি ছাড়া, তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন: لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ "রাজত্ব আজ কার হাতে?" (কুরআন, ৪০:১৬)

---

[৮] (الفتاح)–আল-ফাত্তাহ: উন্মোচনকারী। মহান আল্লাহতায়ালার অন্যতম সিফাত এটা – (সম্পাদক)।

আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(কুরআন, ২:১১৮)

"ওই দিন তারা বের হবে এবং তাদের কিছুই সেদিন আল্লাহর কাছ থেকে গোপন থাকবে না। আজকের এই দিনে সার্বভৌমত্ব কার হাতে? আল্লাহর, যিনি একক [সত্তা] ও প্রবল পরাক্রমশালী।"

সার্বভৌমত্ব আজ কার হাতে? এই জীবনে ওই সত্যটার সামান্য একটি অংশ হলেও প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করুন। রাজত্ব আজ কার হাতে? আপনাকে রক্ষার ক্ষমতা কার আছে? কে পারে আপনাকে সুস্থ করতে? কে আপনার ভাঙা অন্তরকে জোড়া দিতে পারে? কে আপনাকে রিযিকের সন্ধান দিতে পারে? কার প্রতি আপনি ধাবিত হতে পারেন? কে তিনি? কর্তৃত্ব আজ কার হাতে? ***লি মানিল মুলকু আল-ইয়াওম?***

লি ওয়াহিদিল কাহ্হার। [সার্বভৌমত্ব আজ তাঁরই হাতে, যিনি] একক এবং অদম্য। [আল্লাহ ছাড়া] অন্য কিছুর দিকে দৌড়ানো অনেকটা অপ্রতিরোধ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো। আল-ওয়াহিদ, একক সেই সত্তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে অন্বেষণ করার পরিণতি ছিন্নভিন্ন হওয়া ছাড়া আর কিছু নয় এবং [ছিন্নভিন্ন ওই অন্তর] কখনো পূর্ণতার দেখা পাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে কিভাবে আমরা অন্তর বা আত্মা বা মনের ঐক্য ও পূর্ণতার সন্ধান পাবো?

যেখান থেকে আমরা এই পথের যাত্রা আরম্ভ করেছি, [আল্লাহ ছাড়া] সেখানে ফেরার জন্য আমরা আর কার কাছে ছুটে যাবো? আমরা আর কি কামনা করতে পারি? সর্বোপরি, আমরা সকলে এই একটি জিনিসই চাইঃ পূর্ণ হতে, সুখী হতে এবং চাই পুনর্বার এই কথা উচ্চারণ করতেঃ

আমরা আপন নিবাসেই আছি।

পাত্রটিকে খালি করা

কোনো পাত্র ভরার আগে আপনাকে অবশ্যই ওই পাত্র খালি করে নিতে হবে। অন্তর এক পাত্রের ন্যায়। অন্যসব পাত্রের ন্যায় অন্তরকে পূর্ণ করার আগে এটাকে অবশ্যই খালি করে নিতে হবে। যতক্ষণ কারো অন্তর আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তায়ালা* (মহিমান্বিত যিনি) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ সে তার অন্তরকে আল্লাহ দ্বারা পূর্ণ করার আশা কখনো করতে পারে না।

অন্তরকে খালি করার মানে এই নয় যে, আপনি ভালোবাসবেন না। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃত ভালোবাসা ততক্ষণ বিশুদ্ধ থাকে, যতক্ষণ না এটা মিথ্যা অনুরাগের ওপর ভিত্তিশীল হয়। প্রথমত, অন্তরকে খালি করার প্রক্রিয়া *শাহাদা* (কালেমার ঘোষণা)-এর মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, ঈমানের ঘোষনার এই বাক্য শুরু হয়েছে, একটা তাৎপর্যপূর্ণ অস্বীকৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ শূন্যকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা। সত্যিকার *তাওহিদ* (তথা সত্যিকার একত্ববাদে) পৌঁছানোর আগে, একক প্রভুতে আমাদের ঈমান রয়েছে, এই দাবিকে দৃঢ় করার পূর্বে, আমরা সবার আগে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করি: "*লা ইলাহা*" (কোনো ইলাহ নেই)। উপাসনার বস্তুকে *ইলাহ* বলে। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা জরুরি যে, *ইলাহ* এমন কিছু নয় যে, যার কাছে আমরা শুধু প্রার্থনা করি। *ইলাহ* এমন এক জিনিস, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন আবর্তিত হয়, যাকে আমরা মান্য করি এবং আমাদের কাছে যার গুরুত্ব সবকিছুর উপরে এবং সবকিছুর উর্ধ্বে।

এটা এমন এক জিনিস, যেটার জন্য আমরা বেঁচে থাকি –যেটা ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

নাস্তিক, সংশয়বাদী, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একজন *ইলাহ* আছে। আমাদের সকলেই কিছু না কিছুর উপাসনা করি। অধিকাংশ মানুষের জন্য উপাসনার বস্তু এই পার্থিব জীবন তথা *দুনিয়া থেকে* নেওয়া। কিছু মানুষ সম্পদের উপাসনা করে, কেউ করে প্রতিপত্তির উপাসনা, কেউ খ্যাতির উপাসনা করে, আবার কেউ উপাসনা করে নিজের মেধার। কিছু মানুষ আবার অন্যের উপাসনা করে। আবার কুরআনের বর্ণনা মোতাবেক অনেকেই স্বীয় সত্তা, স্বীয় কামনা ও খেয়াল-খুশির উপাসনা করে। আল্লাহ বলেন:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আপনি কি তাকে দেখেন না, যে (নিজের) কামনা ও বাসনাকে নিজের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং তার কর্ণে ও অন্তরে (এবং তার উপলব্ধিতে) মোহর লাগিয়ে দেন এবং তার দৃষ্টিশক্তির ওপর পর্দা ঢেলে দেন। আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে, যে তাকে পথ দেখাতে পারে (যখন আল্লাহ তার থেকে হেদায়েতকে সরিয়ে রেখেছেন)? এরপরেও কি এরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"

(কুরআন, ৪৫:২৩)

এই উপাসনার বস্তুগুলি এমন জিনিস যেগুলো প্রতি আমরা অনুরক্ত বা আসক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের আসক্তির বস্তুটি কেবল আমাদের ভালোবাসার বস্তুই নয়। বরং গূঢ় দৃষ্টিতে, এটা আমাদের খুবই প্রয়োজনের বস্তু। এটা এমন এক জিনিস, যা হারিয়ে গেলে আমরা চরমভাবে ভেঙে পড়ি। আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু বা কেউ যদি থেকে থাকে, যেটাকে পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তবে [বুঝে নিতে হবে] আমরা মিথ্যা আসক্তির মাঝে আছি। নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-কে কেন তার সন্তানকে কুরবানি করতে বলা হলো? তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই এমন আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটা ছিল মিথ্যা আসক্তির কবল থেকে তাকে মুক্ত করার উপায়। একবার যখন তিনি (এ থেকে) মুক্ত হয়ে গেলেন, তখন (তার অনুরাগের বস্তুকে নয়), বরং তার ভালোবাসার বস্তুকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু বা কেউ যদি থেকে থাকে, যা হারালে আমরা চরমভাবে ভেঙে পড়ি, [তখন বুঝতে হবে], আমরা মিথ্যা আসক্তির কবলে রয়েছি। মিথ্যা আসক্তি হলো ওইসব জিনিস, যেগুলো হারালে আমরা অনেকটা অস্বাভাবিকভাবে আকুল হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হই। এটা এমন এক জিনিস, যেটা হারানো সামান্য সম্ভাবনাও যদি আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, তবে আমরা সেটার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমরা সেটার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকি। কেননা, অনুরাগ বা আসক্তির জিনিস হারানোর মানেই হচ্ছেঃ চরমভাবে ভেঙে পড়া। অর্থবিত্ত, অর্জিত বিষয়াদি, অন্য মানুষজন, কোনো চিন্তা, দৈহিক আনন্দ, নেশার দ্রব্য, প্রতিপত্তির নিশানা (*Status Symbol*), আমাদের ক্যারিয়ার, আমাদের ভাবমূর্তি, অন্য লোকেরা কিভাবে আমাদেরকে দেখে বা মূল্যায়ন করে, আমাদের বাহ্যিক প্রকাশ বা সৌন্দর্য,

যেভাবে আমরা পোশাক পরিধান করি কিংবা অন্যের সামনে উপস্থিত হই, আমাদের ডিগ্রিসমূহ, আমাদের চাকুরির পদ, [অন্যকে] নিয়ন্ত্রণ করার সুপ্ত ইচ্ছা কিংবা আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তি, এসবই হতে পারে [আমাদের] অনুরাগ বা আসক্তির বস্তু। যতক্ষণ না আমরা এসব মিথ্যা অনুরাগ বা আসক্তিকে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা আমাদের অন্তরের পাত্রকে খালি করতে সক্ষম হবো না। পাত্রকে (তথা অন্তরকে) খালি করতে না পারলে, আল্লাহর দ্বারা সত্যিকার অর্থে আমরা সেটা কখনো পূর্ণ করতে সমর্থ হবো না।

অন্তরকে সমস্ত মিথ্যা অনুরাগ বা আসক্তি থেকে মুক্ত করার এই সংগ্রাম, পাত্রকে খালি করার এই সংগ্রামই পার্থিব জীবনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। এই সংগ্রামই *তাওহিদ* (তথা সত্যিকার একত্ববাদের) প্রাণসত্তা। আপনি যদি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভকে গভীরভাবে যাচাই করে থাকেন, তবে দেখবেন, এগুলো মূলত [আপনার মাঝে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও আসক্তি] থেকে নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত থাকার ব্যবস্থা এবং এর প্রক্রিয়াকে সচল করে:

শাহাদা (কালেমার ঘোষণা)[১]: ঈমানের ঘোষণা হলো (বস্তুগত আকর্ষণগুলির প্রতি) অনাসক্তির সেই মৌখিক ঘোষণা, যা অর্জনের জন্য আমরা সচেষ্ট থাকি; যার দাবি হলো আমাদের ইবাদত, পরিপূর্ণ ইখলাস, ভালোবাসা, ভয়-ভীতি এবং আশার কেন্দ্রবিন্দু হবেন আল্লাহতায়ালা। শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালাই। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য সমস্ত জিনিসের আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাফল্যের মাঝেই তাওহিদের সত্যিকার রূপের বিকাশ ঘটে।

সলাত (দৈনিক ৫ ওয়াক্তের সলাত): দৈনিক পাঁচবার আমরা আবশ্যিকভাবে নিজেদেরকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের স্রষ্টা ও জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে গভীর মনোযোগে নিবিষ্ট হই। দুনিয়াবী যে কাজে আমরা ব্যস্ত থাকি না কেন, দৈনিক পাঁচবার আমরা সবকিছু থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। দিনে একবার, আর না হয় সপ্তাহে একবার কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত

---

[১] *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এই ঘোষণা কালিমা শাহাদাতের প্রথম অংশ। যেহেতু নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমরা কালিমা শাহাদাতের এই অংশটুকু লাভ করেছি, তাই স্বাভাবিকভাবে বাকি অংশ হবে –মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

বস্তুত, এটা নিছক কোনো ঘোষনা নয়, বরং এটা জীবনের এক সিদ্ধান্ত -Policy Declaration। যে সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন মুসলিমের গোটা জিন্দেগি পরিচালিত হওয়ার কথা। যেটার উজ্জ্বল নমুনা আমরা নবি (ﷺ)-এর সাহাবিগণের মাঝে দেখতে পাই। এই কালেমা তাদের জীবনকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে, তারা এই কালেমার বাস্তবায়নের জন্য নিজের জীবনকে পর্যন্ত বাজি রেখেছিলেন, আর এ কারণেই তারা হয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ও আল্লাহর সুসংবাদপ্রাপ্ত জাতি এবং যাদের কাছে হার মেনেছিল গোটা বিশ্ব –(সম্পাদক)।

সলাতের সবগুলোকে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়েও আদায়ের বিধান দেওয়া যেতো, কিন্তু তা দেওয়া হয়নি, বরং সলাতকে গোটা দিনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি যথা সময়ে তাদের সলাতগুলো আদায় করে, তবে [দুনিয়াতে] আসক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যখনই আমরা দুনিয়ার কোনো বিষয়ে মশগুল হতে থাকি, (মশগুল হতে থাকি আমাদের চাকরির কাজে, আমাদের উপভোগ করা অনুষ্ঠানগুলোতে, আমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে, ওই ব্যক্তির চিন্তাতে, যাকে আমাদের মন থেকে সরাতে পারছি না), তখনই আমাদেরকে ওইসব জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং নিজেদের মনোযোগকে একমাত্র সত্যিকার আসক্তির বস্তুতে (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি) নিবদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

সিয়াম (রোজা রাখা): নিজেকে [দুনিয়ার মোহ] থেকে বিচ্ছিন্ন করার নামই রোজা। খাবার, পানি, যৌন চাহিদা, অসার কথাবার্তা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই সিয়াম বা রোজা। দৈহিক সত্তাকে [এসব থেকে] বিরত রাখার মাধ্যমে আমরা আমাদের রুহানি সত্তাকে নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও মর্যাদাময় করি। রোজার মাধ্যমে নিজেদেরকে আমরা দৈহিক প্রয়োজন, কামনা ও বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে বাধ্য হই।

যাকাত (সাদাকা বা দান): যাকাত হচ্ছে নিজেদেরকে নিজেদের [উপার্জিত] সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ খরচ করা। দানের মাধ্যমে [নিজেদের অন্তরে বিদ্যমান] সম্পদের আসক্তিকে আমরা ভেঙে চুরমার করতে বাধ্য হই।

হজ (তীর্থযাত্রা): [দুনিয়া থেকে নিজেকে] বিচ্ছিন্ন করার সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আমল হচ্ছে হজ। হজের উদ্দেশ্যে যিনি রওনা দেন, তিনি তার জীবনের সব কিছুকে পেছনে ফেলে আসেন। তিনি তার পরিবার, তার বাড়ি, তার ছয় সংখ্যার বেতন, তার উষ্ণ বিছানা, তার আরামদায়ক জুতা এবং ব্র্যান্ড জামা, কাপড় থেকে শুরু করে সবকিছু ত্যাগ করার বিনিময়ে গ্রহণ করেন দু'টুকরো কাপড় পড়ে মাটিতে কিংবা জনসমুদ্রে তাবু টাঙ্গিয়ে শোয়া। হজের মাঝে প্রতিপত্তির কোনো নিশানা নেই। না কোনো টমি হিলফিগার[১০] ইহরাম, আর না কোনো ফাইভ স্টার তাবু (হজের যেসব প্যাকেজ ৫ স্টার হোটেলের কথা বলে, তারা হজের আগে ও পরে এসব সুবিধা দেওয়ার কথা বলে। কেননা, হজের সময় আপনি মিনাতে তাবু পাতেন এবং মুজদালিফাতে খোলা আকাশের নিচে মাটিতে ঘুমান)।

[১০] পাশ্চাত্যের একটি ব্র্যান্ড।

চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও রহমত হিসেবে আমাদেরকে কেবল দুনিয়া থেকে নিরাসক্ত হতে বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং কিভাবে সেটা করতে হবে, সেটাও বলে দিয়েছেন। [ইসলামের] এই পাঁচটি স্তম্ভ ছাড়াও আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকেও [দুনিয়া] বিমুখতার এই ঝলক প্রতিফলিত হয়। নবি (ﷺ) আমাদেরকে আর সব মানুষ থেকে পৃথক হতে বলেছেন, এমনকি সেটা যদি বেশভূষাতেও হয়। হিজাব, কুফি[১১] পরিধানের মাধ্যমে কিংবা দাড়ি রাখার মাধ্যমে আপনি চাইলেও সবার সাথে মিশে যেতে পারেন না। নবি (ﷺ) বলেন:

> "ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিতের মতো এবং খুব শীঘ্রই এটা শুরুর মতো অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে, তাই সেই অপরিচিতদের জন্য রইলো সুসংবাদ।" [মুসলিম]

এই দুনিয়াতে "অপরিচিত" হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে না গিয়ে আমরা এর মধ্যে বসবাস করতে পারি। [দুনিয়া প্রতি] নিরাসক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই আমরা পারি আমাদের অন্তরের পাত্রকে খালি করতে এবং ওই জিনিসের জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করতে, যেটা অন্তরকে দেয় পুষ্টি ও জীবনীশক্তি। অন্তরকে [দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে] শূন্য করে আমরা এটাকে সত্যিকার পুষ্টি হাসিলের জন্য প্রস্তুত করি।

[আর তা হলেন] আল্লাহ (অর্থাৎ তাঁর মহব্বত)।

---

[১১] এক ধরনের টুপি, যা বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা পরিধান করেন –(সম্পাদক)।

উপহারের প্রতি ভালোবাসা

আমরা সবাই উপহার পেতে ভালোবাসি। যে আশীর্বাদ আমাদের জীবনকে সৌন্দর্যে আলোকিত করে, আমরা সেটাকে ভালোবাসি। আমরা ভালোবাসি আমাদের সন্তান, আমাদের জীবনসঙ্গি, আমাদের পিতামাতা, আমাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে। ভালোবাসি আমাদের যৌবন এবং আমাদের স্বাস্থ্যকে। আমাদের বাড়ি, আমাদের গাড়ি, আমাদের অর্থ এবং আমাদের সৌন্দর্যকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু যখন কোনো উপহার নিছক উপহারের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠে, তখন কি ঘটে? আশা যখন রূপ নেয় প্রয়োজনে এবং অনুগ্রহ যখন নির্ভরশীলতায় পরিণত হয়, তখন কি ঘটে? যখন উপহার আর নিছক কোনো উপহার থাকে না, তখন ব্যাপারটি কেমন দাঁড়ায়?

উপহার আসলে কি? উপহার এমন এক জিনিস, যেটা আমাদের নিজেদের থেকে আসে না। উপহার এমন এক জিনিস, যেটা দেওয়া হয় –এবং সেটা আবার ফিরিয়েও নেওয়া যায়। উপহারের আসল মালিক আমরা নই। আর আমাদের টিকে থাকার জন্য উপহার অত্যাবশকীয় নয়। এটা আসে আর যায়। আমরা উপহার পেতে চাই এবং তা পেতে ভালোবাসি –কিন্তু সেসব উপহার আমাদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক নয়, আর না আমরা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল। আমরা সেগুলো পাওয়ার জন্য বেঁচে থাকি না, আর না আমরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হলে মারা যাই। না সেগুলো আমাদের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস, না আমাদের আহার, কিন্তু আমরা সেগুলো পেতে ভালোবাসি। এমন কে আছে, যে উপহার পেতে ভালোবাসে না? এমন কে আছে, যে রাশি রাশি উপহার পেতে অপছন্দ করবে? আর আমরা 'আল-করিম' তথা সবচেয়ে উদার সত্তার নিকট এই আর্জি পেশ করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর উপহার থেকে কখনো বঞ্চিত না করেন। এতদসত্ত্বেও, উপহার এমন কিছু নয়, যার ওপর আমরা নির্ভর করি, আর না আমরা সেগুলো থেকে বঞ্চিত হলে মৃত্যুবরণ করি।

মনে রাখবেন, কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার দুটো স্থান আছে – হাত এবং অন্তর। উপহার আমরা কোথায় রাখি? উপহারকে অন্তরে ধরে রাখা হয় না। এটা হাতে ধরে রাখা হয়। আর তাই যখন উপহার কেড়ে নেওয়া হয়, তখন সেটা হারানোর যন্ত্রণা হাতে অনুভব হওয়া উচিত –ওই যন্ত্রণা অন্তরে অনুভূত হওয়ার কথা নয়। এই পার্থিব জীবনে যিনি দীর্ঘ একটা সময় পার করেছেন, তিনি জানেন যে, হাতে অনুভূত হওয়া যন্ত্রণা এবং অন্তরে অনুভূত হওয়া যন্ত্রণা এক নয়। অনুরাগ, নেশা ও নির্ভরতার

কোনো জিনিস হারালে অন্তরে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই যন্ত্রণা অন্য কোনো যন্ত্রণা মতো নয়। এটা সাধারণ কোনো যন্ত্রণা নয়। এই যন্ত্রণা জানান দেবে যে, আমরা আমাদের আসক্তির কোন বস্তু হারিয়েছে। এটা ছিল এমন এক উপহার, যা ভুল জায়গায় রাখা হয়েছিল।

হাতে অনুভূত হওয়া যন্ত্রণাও এক ধরনের যন্ত্রণা –কিন্তু সেটা ভিন্ন ধরনের। আসলেই ভিন্ন। কোনো কিছু হারানোর ফলে যে ক্ষতি হয়, হাতে সেটারই যন্ত্রণা অনুভূত হয়, কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা এমন কিছু হারাই না, যার ওপর আমরা নির্ভরশীল। যখন আমাদের হাত থেকে কোনো উপহার কেড়ে নেওয়া হয় –বা আমাদেরকে আদৌ কোনো উপহার দেওয়া হয় না– তখন আমরা হারানোর সাধারণ মানবীয় যন্ত্রণা অনুভব করি। আমরা দুঃখ করি। আমরা কাঁদি। কিন্তু ওই যন্ত্রণাটা আমাদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, আমাদের অন্তর স্বাভাবিক ও প্রাণ চঞ্চল থাকে। এটা এজন্য যে, অন্তর শুধু আল্লাহরই জন্য।

এবং শুধুই আল্লাহর জন্য।

যে জিনিস আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয় কিংবা (হারিয়ে ফেলার) ভীতি সৃষ্টি করে, সেই বিষয়গুলো যদি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, তবে যে যে উপহারকে ভুল স্থানে রাখা হয়েছে, সেগুলো আমরা নির্ভুলভাবে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবো। আমরা যদি বিবাহ করতে না পারি, নিজের মনের মানুষকে না পাই, চাকুরি খুঁজে না পাই, নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে না পারি, ডিগ্রি অর্জন করতে না পারি কিংবা নির্দিষ্ট Status-এ উপনীত হতে না পারি – এই সবকিছু যদি আমাদের গ্রাস করে ফেলে, তবে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন করা জরুরি। উপহারটি যে স্থানে সংরক্ষিত আছে, সেখান থেকে এটাকে সরাতে হবে। ওই উপহারকে আমাদের অন্তর থেকে সরিয়ে এটাকে তার উপযুক্ত স্থান অর্থাৎ আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমরা এসব জিনিসকে ভালোবাসতেই পারি। ভালোবাসাটা এক মানবীয় গুণ। যেসব উপহার ভালোবাসি, সেগুলো পেতে চাওয়াটা মানুষের এক সাধারণ প্রকৃতি। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা ওই উপহারকে আমাদের অন্তরে জমা করি, আর আল্লাহকে আমরা আমাদের হাতে স্থান দেই। পরিহাসের বিষয় হলো, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহকে ছাড়াই আমরা বাঁচতে পারি, কিন্তু যখন আমরা উপহারটি হারিয়ে ফেলি, তখন আমরা ভেঙে পড়ি এবং আমরা দাঁড়াতেও পারি না।

ফলস্বরূপ, সহজেই আমরা আল্লাহকে (আমাদের বাস্তব জীবন থেকে)[১২] একপাশে সরিয়ে রাখি কিন্তু আমাদের অন্তর ওই উপহার ছাড়া এক বিন্দু নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। বস্তুত উপহারের স্বার্থে আমরা আল্লাহকে পাশে সরিয়ে রাখতেও দ্বিধাবোধ করি না। তাই বিলম্ব করে সলাত আদায় করা, কিংবা সলাত আদায় না করাটা আমাদের জন্য বেশ সহজ ব্যাপার, কিন্তু আমার কাজের মিটিং বা সভা, আমার সিনেমা, আমার ছুটি কাটানো, আমার কেনাকাটা, আমার ক্লাস, আমার পার্টি কিংবা আমার বাস্কেটবল (অথবা ক্রিকেট বা ফুটবল)[১৩] খেলা দেখাটা কোনোভাবেই মিস করা বা বাদ দেওয়া যাবে না। সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া কিংবা মদ বা অ্যালকোহল বিক্রি করা বেশ সহজ, কিন্তু আমাকে আমার লাভের পরিমাণ এবং সম্মানজনক ক্যারিয়ার থেকে বঞ্চিত করো না। আমাকে বঞ্চিত করো না আমার নতুন মডেলের গাড়ি এবং বিলাসবহুল বাড়ি থেকে। কোনো হারাম সম্পর্ক বা ডেটে যাওয়া সহজ, কিন্তু আমাকে আমরা ভালোবাসার মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রেখো না। হিজাব পরিধান না করাটা বা খুলে ফেলা সহজ ব্যাপার, কিন্তু আমাকে আমার সৌন্দর্য, আমার বাহ্যিক অবয়ব, আমার বিবাহের প্রস্তাব কিংবা লোকদের সামনে আমার ছবি বা ইমেজ থেকে বঞ্চিত করো না। আল্লাহ যে শালীনতাকে সুন্দর বলেছেন, সেটাকে দূরে নিক্ষেপ করাটা বেশ সহজ, কিন্তু আমাকে আমার সরু, আঁটসাঁট জিন্স পড়া থেকে বঞ্চিত করো না, কারণ সমাজ এটাকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছে।

এমনটি ঘটে, কারণ উপহারটি আমাদের অন্তরে অবস্থান করছে, যেখানে আল্লাহ রয়েছেন আমাদের হাতে। আর যে জিনিস হাতে থাকে, সেটাকে তো খুব সহজেই এক পাশে সরিয়ে রাখা যায় (তথা উপেক্ষা/অবহেলা করা যায়)। আর যে জিনিসের অবস্থান অন্তরে, সে জিনিস ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না –এবং সেটা পাওয়ার জন্য আমরা যেকোনো কিছু কুরবানি পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু আজ হোক, আর কাল হোক, নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করা আবশ্যক যে, আসলে আমরা কোন জিনিসের ইবাদত করিঃ উপহার না উপহার দাতার? আমরা কি সৌন্দর্যের উপাসনা করি, নাকি আমরা যাবতীয় সৌন্দর্যের উৎস ও তাঁর "আধার"-এর ইবাদত করি? আমরা কি রিযিকের উপাসনা করি, নাকি আমরা রিযিক দাতার ইবাদত করি?

সৃষ্টির না স্রষ্টার –কার ইবাদত করি?

আমরা যা পছন্দ করি, তার ট্রাজেডি হচ্ছেঃ [কোনো বস্তুর] অনুরাগ বা আসক্তির শিকল দিয়ে আমরা আমাদের ঘাড়কে আবদ্ধ করার পর আমরা প্রশ্ন করি,

---

[১২] – (সম্পাদক)।

[১৩] – (সম্পাদক)।

আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন। (জীবন রক্ষাকারী)[১৪] "সত্যিকার বাতাস"-কে আমরা উপেক্ষা করি এবং এরপর অবাক হয়ে [বলি], আমরা কেন শ্বাস নিতে পারছি না। আমরা আমাদের (আত্মার)[১৫] একমাত্র খোরাককে ফেলে দেই এবং এরপর অভিযোগের সুরে চিৎকার করতে থাকি, আমরা অনাহারে কেন মরছি। সর্বোপরি, ছুরি দিয়ে আমরা নিজেদের বুকেই আঘাত করার পর আমরা নিজেরাই কান্না শুরু করি, কেননা, এটা সত্যিই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু আমরা যাই করি না কেন, তা আমরা নিজেদের সাথেই করি। আল্লাহ বলেনঃ

"এবং তোমাদের ওপর যেসব বিপদ মুসিবত আপতিত হয়, সেগুলো তোমাদের নিজেদের হাতেরই কামাই, তথাপি তিনি তোমাদের (অধিকাংশ পাপকে) মার্জনা করে থাকেন।"

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

(কুরআন, ৪২:৩০)

হ্যাঁ, আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা আমরা নিজেদের সাথেই করি। কিন্তু লক্ষ্য করুন আয়াতটি কিভাবে শেষ হয়েছেঃ "তিনি অধিকাংশ পাপ ক্ষমা করেন।" এখানে ব্যবহৃত *'ইয়া'ফু'*[১৬] শব্দটি আল্লাহর *"আল-আ'ফু"* নাম থেকে উৎসারিত। এটার মর্ম কেবল ক্ষমা বা মার্জনা করাই নয়, বরং এটা সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়ার মর্মকেও ধারণ করে, আর, তাই যতবারই আমরা নিজেদের বুকে ছুরি চালাই না কেন, ততবারই আল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে সারিয়ে তুলতে পারেন যে, মনে হবে যেন ছুরির আঘাত কখনোই পড়েনি! আর *'আল-জাব্বার'* (যিনি মেরামত করেন), একমাত্র তিনিই পারেন এ ক্ষত সারিয়ে তুলতে।

যদি আপনি তাঁকে খুঁজেন, তাঁকে অন্বেষণ করেন।

শ্বাস নেওয়ার বাতাসের বিনিময়ে যিনি গলার হার বেছে নেন, তার বোকামির মাত্রা কতটুকু? এরূপ ব্যক্তিই বলেঃ "আমাকে গলার হার দাও, তারপর তুমি আমার থেকে শ্বাস নেওয়ার বাতাস নিয়ে নিতে পারো। আমার শ্বাসরোধ করো, কিন্তু মরার সময় আমার গলায় হারটি যেন ঝুলতে থাকে, সেটা নিশ্চিত করো।" আর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হচ্ছে, ওই হারটিই আমাদের শ্বাসরোধ করে। আমাদের

---

[১৪] – (সম্পাদক)।

[১৫] – (সম্পাদক)।

[১৬] মূল আরবিঃ يَعْفُو –(সম্পাদক)।

অনুরাগের বস্তু, যেটাকে আমরা আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেটাই আমাদের ধ্বংস করে।

আমাদের সমস্যার সূত্রপাত ঘটে তখন, যখন আমরা উপহারকে নিছক একটি উপহার না ভেবে, সেটাকে আমাদের শ্বাস নেওয়ার বাতাস ভাবতে শুরু করি। আর, আমাদের অন্ধত্বের কারণে আমরা ওই উপহারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সত্যিকার বাতাসকে উপেক্ষা করি। ফলশ্রুতিতে, যখন আমাদের থেকে ওই উপহার কেড়ে নেওয়া হয় –কিংবা আমাদেরকে যদি আদৌ ওই উপহার দেওয়া না হয়– তখন আমরা ভাবি, আমাদের বেঁচে থাকাটাই বুঝি দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যাটাকে অবিরতভাবে আমরা নিজেদেরকে বলে যাই, যতক্ষণ না আমরা এটা বিশ্বাস করতে শুরু করি। এটা কোনোভাবেই সত্য নয়। আমাদের জন্য হারানোর মতো কেবল একটিই জিনিস আছে, যেটা [হারালে] উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। জীবনকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের একটিই কারণ আছে, যেটার সাহায্য ছাড়া আমরা সামনে এগুতেই পারবো না [আর সেটা হচ্ছে:] নিজেদের জীবনে আল্লাহকে হারিয়ে ফেলা। কিন্তু ভাগ্যের নিদারুন পরিহাস হচ্ছে, আমাদের অনেকেই তাদের জীবন থেকে আল্লাহকে হারিয়ে ফেলেছি, অথচ আমরা কিনা ভেবে বসে আছি যে, আমরা এখনো বেঁচে আছি। তাঁর উপহার তথা নেয়ামতের প্রতি আমাদের ভ্রমাত্মক নির্ভরশীলতা আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। আসলেই বড় ধরনের ধোঁকা।

আল্লাহই আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাঁর দেওয়া উপহারসমূহ নয়। আল্লাহই আমাদের ভরসা এবং তিনিই আমাদের সত্যিকার প্রয়োজন, তিনিই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নয়? অথচ তারা আপনাকে তাঁর পরিবর্তে অন্য (ইলাহের) ভয় দেখায়! আল্লাহ যাকে গোমরাহিতে ছেড়ে দিতে চান, তাকে পথ দেখানোর মতো কেউ আছে কি?"	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (কুরআন, ৩৯:৩৬)

আমাদের সবারই প্রয়োজন আছে এবং আমাদের সবারই আছে চাহিদা। আমাদের সত্যিকার ভোগান্তি তখনই আরম্ভ হয়, যখন আকাঙ্ক্ষাকে আমরা নিজেদের অপরিহার্য প্রয়োজনে রূপান্তরিত করি এবং আমাদের সত্যিকার প্রয়োজন (তথা আল্লাহকে) এমন বস্তুতে রূপান্তরিত করি, যেটা না হলে আমাদের তেমন কিছু যায়

আসে না। আমাদের আসল ভোগান্তির সূচনা তখনই, যখন আমরা মাধ্যমকে গন্তব্যের সাথে গুলিয়ে ফেলি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র গন্তব্য। অন্য সবকিছুই মাধ্যম। আমাদের ভোগান্তির সূচনা তখনই হবে, যখন আমরা নিজেদের চোখকে গন্তব্য থেকে সরিয়ে ফেলে, মাধ্যমের মাঝেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলি।

প্রকৃতপক্ষে, উপহারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা। [আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর] এক মাধ্যমে এই উপহার। উদাহরণস্বরূপ, নবি (ﷺ) কি বলেননি যে, বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক? কেন? কারণ জীবনের খুব কম ক্ষেত্রই আছে, যা বিবাহের মতো একজনের চরিত্র গঠনের ওপর সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, দয়া, বিনম্রতা, উদারতা, আত্মত্যাগ এবং নিজের বদলে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণগুলো সম্বন্ধে আপনি পড়তে পারেন, কিন্তু আপনি কখনো এই গুণগুলোর বিকাশ সাধন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি এমন পরিবেশে পড়ছেন, যে পরিবেশ এসব গুণের পরীক্ষা নেয়।

বিবাহের মতো একটা নেয়ামত আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মাধ্যমে হতে পারে, যতক্ষণ এটা নিছক একটি মাধ্যম থাকে এবং এটা জীবনের লক্ষ্যে পরিণত না হয়। আল্লাহর দেওয়া এসব নেয়ামত তাঁর কাছে পৌঁছানোর এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে, যতক্ষণ এগুলোর অবস্থান অন্তরে না হয়ে [আমাদের] হাতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার অন্তরে যা বাস করে, সেটাই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তরের ওই জিনিসটি তখন আপনার পরম আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হয় এবং ওই জিনিসটি পেতে এবং ধরে রাখতে আপনি যেকোনো ধরনের কুরবানি পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকেন। ওই বস্তুটি তখন আপনার নির্ভরতার মৌলিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। আর, তাই এটা এমন এক জিনিস হতে হবে, যা হবে চিরন্তন, যার শ্রান্তি বা অবসাদ বলে কিছু থাকবে না এবং যা ভেঙে যাবে না। আর এটা এমন জিনিস হবে, যা কখনো ছেড়ে চলে যায় না। কেবল একটি জিনিসই এমন হতে পারে: [এবং তিনিই] স্রষ্টা।

প্রশান্তির প্রগাঢ় মুহূর্ত

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু প্রগাঢ় মুহূর্ত আছে। আমার বেলায় ওই মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, *মাসজিদুল হারামের* ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। আমার ওপরে আকাশ, নিচে কাবার সুন্দরতম দৃশ্য। এ সময় (আমি প্রত্যক্ষ করি) আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন – এই [পার্থিব] জীবন এবং আখিরাতের জীবন। আমার চারদিকে মানুষের ভিড়, যা এ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কিন্তু আমার জন্য অবস্থা এমন হলো যেন, আমি সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে আছি শুধুই আল্লাহপাকের একান্ত সান্নিধ্যে।

ওই ছাদে আমি আমার সঙ্গে করে একরাশ অন্তর্জ্বালা, সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে এসেছিলাম। এসেছিলাম সীমাহীন দুর্বলতা, মানবীয় ত্রুটি এবং কষ্ট নিয়ে। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে; সামনের দিনগুলোতে কি আসতে যাচ্ছে, তার ভয়, আর যা ঘটতে পারে, তার আশা নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় নবি মুসা (*আলাইহিস সালামের*) লোহিত সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা আমার মনে পড়ে। চর্মচক্ষে কেবল পানির প্রাচীর ছাড়া তিনি কিছুই দেখছিলেন না, কিন্তু তার রুহানি চোখ শুধু আল্লাহকেই দেখছিল এবং তিনি যে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ পাবেন, তাতে এতোটাই নিশ্চিত ছিলেন, যেন তিনি সেটা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন। যেখানে তার জাতির আস্থা কিংবা আশা হারানো লোকজনের কণ্ঠে কেবল (ফেরাউনের হাতে) পাকড়াও হওয়ার আশংকার কথাই ধ্বণিত হচ্ছে, তখনও মুসা (*আলাইহিস সালাম*) নিজের অবস্থানে অনঢ়।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দূরবর্তী কণ্ঠস্বরগুলো সামনে কি আসতে যাচ্ছে, তার সতর্কবার্তা পাঠাচ্ছে, কিন্তু আমার কান শুধু শুনে যাচ্ছেঃ "*ইন্না মায়িআ' রাব্বি সা ইয়াহদিন* ... নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথেই আছেন এবং তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।" (কুরআন, ২৬:৬২)

আমাদেরকে গ্রাস করা এই কষ্ট, বিভ্রান্তি এবং যন্ত্রণা ভেদ করে দৃষ্টিকে সামনের দিকে প্রসারিত করা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের অন্তরকে ফোকাস করতে বা মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সুযোগ দেবো। *তাওহিদ* হচ্ছে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ, কিন্তু শুধু "আল্লাহ এক" বলার নামই *তাওহিদ* নয়। [*তাওহিদের*] এই বিষয়টি বেশ গভীর ও প্রগাঢ়। এটা জীবনের উদ্দেশ্য, ভয়ভীতি, ইবাদত এবং স্রষ্টার প্রতি পরম ভালোবাসার ক্ষেত্রে একত্ববাদ [প্রতিষ্ঠা করার সাথে সম্পৃক্ত]। এটা কল্পনা শক্তি ও মনোযোগের বেলায় একত্ববাদ [প্রতিষ্ঠা করার সাথে জড়িত]। *তওহিদের* মানে একজনের দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ করা, যাতে বাকি সবকিছুই নিজ নিজ উপযুক্ত স্থানে জায়গা করে নিতে পারে।

নবি (ﷺ) থেকে বর্ণিত চমৎকার এক হাদিস এই বিষয়টিকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। নবি (ﷺ) বলেন:

> "যে ব্যক্তির আখিরাত নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, তার সকল বিষয়াদি একত্র করবেন এবং দুনিয়া তার নিকট চলে আসবে, যদিও সে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী নয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ তার চোখের সামনে অভাব ও অনটন লাগিয়ে দেন, তার বিষয়াদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবেন এবং তার জন্য দুনিয়ার যতটুকু নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ততটুকু অংশ ছাড়া দুনিয়ার কিছুই তার কাছে আসবে না।" [তিরমিযি]

আপনি যদি কখনো 'ম্যাজিক আই' (*magic eye*)[১৭] ছবি দেখে থাকেন, তবে আপনি এই সত্যটির এক চমৎকার উপমা দেখতে পাবেন। প্রথম দেখায় মনে হবে কতগুলো আকৃতির সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটার কোনো যথাযথ বিন্যাস বা উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপনি যদি ছবিটিকে মুখের সামনে এনে ধরেন, নিজের চোখকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিবদ্ধ বা ফোকাস করেন এবং ছবিটিকে যখন আপনি ধীরে ধীরে মুখের সামনে থেকে সরাতে থাকবেন, হঠাৎ করেই ছবিটি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু যখনই আপনি ওই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলবেন, সাথে সাথেই ছবিটি হারিয়ে যাবে এবং আপনার কাছে সেটা (বিশৃঙ্খল) আকৃতির এক সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

---

[১৭] ম্যাজিক আই: N.E. Thing Enterprises (১৯৯৬ সালে নাম পরিবর্তন করে Magic Eye Inc.) প্রকাশিত একটি পুস্তক সিরিজ। এতে প্রকাশিত অটোস্টেরিওগ্রাম ইমেজসমূহ কেউ কেউ 2D ইমেজ-এর উপর focus করে 3D তথা ত্রিমাত্রিক ইমেজ দেখতে পান।

একইভাবে, যতই আমরা দুনিয়ার দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করি, আমাদের বিষয়াদি ততই বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। যতই আমরা দুনিয়ার পেছনে দৌড়াতে থাকি, ততই এটা আমাদের থেকে পালাতে থাকে। যতই আমরা সম্পদের পিছু ধাওয়া করি না কেন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসস্বরূপ, আমরা ততই দারিদ্র্য অনুভব করতে থাকি। মনোযোগ বা ফোকাস যদি হয় অর্থ, তবে যত অর্থই আপনি উপার্জন করুন না কেন, আপনি প্রতিনিয়ত এটা হারানোর ভয়ে ভীত থাকবেন। এই মোহাচ্ছন্নতাই স্বয়ং দারিদ্র্য। এই কারণেই নবি (ﷺ) এ ধরনের লোক সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তাদের চোখের সামনে কেবল দারিদ্রই থাকবে। আর তারা শুধু এটাই দেখবে। তাদের যতই থাকুক না কেন, তারা পরিতৃপ্ত নয়, তারা কেবল আরও পাওয়ার লোভে মত্ত এবং এসব হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বা ফোকাস করেন, তাদের কাছেও দুনিয়া আসে এবং আল্লাহ তাদের অন্তরে তৃপ্তির ঐশ্বর্য ঢেলে দেন। এমনকি তাদের যদি সামান্য [সম্পদও] থাকে, তারা নিজেদেরকে ধনী ভাবে এবং ওই সম্পদ থেকে আরও বেশি করে দান করতে আগ্রহী থাকে।

এ ধরনের লোকেরা যখন পার্থিব জীবন, আর্থিক দৈন্যতা, কষ্ট, একাকিত্ব, ভয়, হৃদয় ভেঙে যাওয়া কিংবা দুঃখ ও বিরহের মতো জিনিস দ্বারা আটকা পড়ে, তখন তাঁদেরকে শুধু আল্লাহর দিকে মুখ ফেরাতে হবে এবং তিনি তাদেরকে ওইসব মুসিবত থেকে সর্বদাই বের করে আনেন। জেনে রাখুন এটা নিজেকে স্বস্তি দেওয়ার কোনো থিওরি বা তত্ত্ব নয়, বরং এটা এক প্রতিশ্রুতি। এটা আল্লাহর দেওয়া এক প্রতিশ্রুতি, যিনি কুরআনে বলেন:

> "যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য একটি পথ বানিয়ে দেন এবং ধারণাতীত স্থান থেকে তার জন্য তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। যিনি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন, (আল্লাহই) তার জন্য যথেষ্ট ... " (কুরআন, ৩:১৯০)

আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহই যথেষ্ট। যারা আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জীবনে শান্তি বিরাজ করে। কেননা, তাদের এই জীবনে যাই ঘটুক না কেন, তারা সেটাকে ভালো মনে করেন এবং সেটাকে তারা আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবে মেনে নেন। আপনার জীবনে শুধু ভালো দিনই পার হচ্ছে, এই বিষয়টি একবার ভাবুন তো। এ ধরনের ঈমানদারগণের অবস্থা এটাই, যেমনটি নবি (ﷺ) বলে গেছেন,

> "ঈমানদারের বিষয়টি আসলেই অবাক করার মতো। সবকিছুতেই তার জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এটা শুধু ঈমানদারের জন্যই। যদি তার কাছে কোনো

কল্যাণ আসে সে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, যেটা তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাও তার জন্য কল্যাণকর।" [মুসলিম]

সত্যই এ ধরনের ঈমানদারগণের অন্তর এক প্রকারের জান্নাত। এই জান্নাতের কথাই ইবনে তাইমিয়া (*আল্লাহ তার আত্মার ওপর রহমত বর্ষণ করুন*) তুলে ধরেন, যখন তিনি বলেন:

"বস্তুত এই দুনিয়াতে এক জান্নাত রয়েছে, (আর) যে ব্যক্তি ওই জান্নাতে প্রবেশ করে না, আখিরাতের জান্নাতেও সে প্রবেশ করবে না।"

ওই জান্নাতে পরিপূর্ণ শান্তি ক্ষণিক মুহূর্তের ন্যায় হবে না, বরং তা হবে এক [রুহানি] অবস্থা, যা চিরস্থায়ী।

সমুদ্ররূপী দুনিয়া

গতকাল আমি সমুদ্রতীরে গিয়েছিলাম। বসে বসে যখন আমি ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল বিশাল ঢেউ উপভোগ করছিলাম, তখন বিস্ময়কর কিছু একটা আমি উপলব্ধি করি। সমুদ্র শ্বাসরুদ্ধকরভাবে সৌন্দর্যে ভরপুর। কিন্তু এটা যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্করও বটে। সম্মোহন শক্তিময় উত্তাল ঢেউ, যা আমরা সমুদ্রতীর থেকে ভালোই উপভোগ করি, কিন্তু সেটাই কেড়ে নিতে পারে আমাদের প্রাণ, যদি আমরা ওই ঢেউয়ের কবলে পড়ি। পানি নামক যে উপাদান আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য, সেই পানিতেই ডুবে গেলে আমাদের জীবন লীলা সাঙ্গ হতে পারে। যে সমুদ্র জাহাজকে ভাসিয়ে রাখে, সেই সমুদ্রই পারে জাহাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

এই পার্থিব জীবন, এই দুনিয়া, ঠিক সমুদ্রেরই মতো। আমাদের অন্তরগুলো জাহাজের মতো। সমুদ্রকে আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করতে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু এই সমুদ্র একটা মাধ্যম মাত্র। আহার সংগ্রহের জন্য সমুদ্র একটা মাধ্যম। এটা ভ্রমণের এক মাধ্যম। উচ্চতর লক্ষ্য পূরণের এটা এক মাধ্যম। তথাপি এটা এমন এক জিনিস, যেটা আমরা অতিক্রম করতে চাই, এতে থেকে যাওয়ার কথা কখনো চিন্তা করি না। একবার ভাবুন তো, সমুদ্র যদি আমাদের মাধ্যম হওয়ার বদলে হয়ে যায় আমাদের শেষ ঠিকানা, তবে কেমন হবে?

শেষ অবধি তাতে তো আমাদের ডুবেই মরতে হবে।

সমুদ্রের পানি যতক্ষণ থাকবে আমাদের জাহাজের বাইরে, ঠিক ততক্ষণ জাহাজ নির্বিঘ্নে ভেসে চলবে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু যেইমাত্র পানি জাহাজে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন কি ঘটে? ঠিক তেমনি দুনিয়া যখন পানির মতো আমাদের অন্তররূপ জাহাজের বাইরে অবস্থান করে না, দুনিয়া যখন নিছক আর মাধ্যম থাকে না, পরিস্থিতি তখন কীরূপ ধারণ করে? দুনিয়া যখন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন কি ঘটে?

জাহাজ তখনই ডুবে।

এমন পরিস্থিতিতে অন্তর জিম্মি হয়ে পড়ে এবং সেটা (দুনিয়ার) দাসে পরিণত হয়। আর তখনই যে দুনিয়া এক সময় ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে, সেটা আমাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে। সমুদ্রের পানি যখন প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়, তখন জাহাজ আর [আমাদের] আয়ত্তে থাকেন না। জাহাজটির পরিণাম তখন সমুদ্রের কৃপার ওপর নির্ভর করে।

(দুনিয়ারূপী সমুদ্রে) ভেসে থাকার জন্য, দুনিয়াকে আমাদেরকে ঠিক সেভাবে দেখতে হবে, যেভাবে আল্লাহ আমাদেরকে দেখতে বলেছেন, "বস্তুত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে রয়েছে নির্দশন, তাদের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।" (কুরআন, ৩:১৯০)

দুনিয়াতে আমাদের বসবাস। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ব্যবহারের জন্যই দুনিয়ার সৃষ্টি। দুনিয়ার প্রতি এই নিরাসক্তির (*যুহ্‌দ*) মানে কখনো এই নয় যে, এই দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনো লেনাদেনা নেই। বরং কি করা আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়, নবি (ﷺ) আমাদেরকে সেটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

> আনাস (রা.) বলেন: "নবি (ﷺ) কিভাবে ইবাদত করতেন, সেটা জিজ্ঞাসা করতে নবি (ﷺ)-এর স্ত্রীদের কাছে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটে (*আল্লাহ নবির ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আর বইয়ে দেন তার ওপর শান্তির ধারা*)। যখন তাদেরকে সেটার জানানো হলো, তখন তাদের কাছে সেটা কম মনে হয় এবং তারা বলে, 'নবি (ﷺ)-এর সাথে আমাদের কি কোনো তুলনা হতে পারে, যাঁর আগের-পিছের সব ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে?' আনাস বলেন, 'তাদের একজন বলে, 'আমি সলাত আদায় করে সারা রাত কাটাবো।' আরেকজন বলে, 'আমি সারা বছর ধরে রোজা রাখবো, আর তা কখনো ভাঙবো না।' আরেকজন বলে, 'নারী সঙ্গ থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখবো এবং বিবাহ করবো না।' আল্লাহর রসুল তাদের কাছে আসেন এবং বলেন, 'তোমরা কি ওই লোকজন, যারা এরূপ এরূপ কথা বলেছো? আল্লাহর কসম, তোমাদের মাঝে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমিই সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। কিন্তু আমি রোজা রাখি, আবার রোজা ভাঙ্গি। আমি সলাত আদায় করি, আবার ঘুমাই। আর আমি নারীদেরকে বিবাহ করি। যে আমার সুন্নাহকে উপেক্ষা করে, সে আমার উম্মত নয়।'"
>
> [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

দুনিয়া থেকে দূরে সরে থাকার জন্য আমাদের নবি (ﷺ) কখনো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হননি, বরং তার এই নিরাসক্তি আরও গভীর। এটা ছিল অন্তরের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা। বস্তুত তার চূড়ান্ত অনুরাগ ও আসক্তি কেবল আল্লাহ (ﷻ)-এর সাথে ও আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার প্রতি। কেননা, তিনিই আল্লাহর বাণী সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করেছেন: "পার্থিব জীবন খেল তামাশা ছাড়া আর কি? বস্তুত আখিরাতের আবাসই প্রকৃত জীবন। কিন্তু হায়, যদি তারা জানতো।" (কুরআন, ২৯:৬৪)

দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত থাকার মানে এই নয় যে, আমরা দুনিয়ার কোনো জিনিসের মালিক হতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সাহাবিই বেশ সম্পদশালী ছিলেন। বরং [দুনিয়া থেকে] নির্লিপ্ত থাকার মানে হচ্ছে: দুনিয়া যা, আমরা সেটাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করি এবং দুনিয়ার সাথে আমরা সেভাবেই সম্পর্ক রাখি – দুনিয়াকে আমরা কেবল একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি। [দুনিয়া থেকে] নির্লিপ্ত থাকার মানে: দুনিয়া আমাদের যেন হাতে থাকে –আমাদের অন্তরে প্রবেশ না করে যায়। বিষয়টি আলি (রা.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: "[দুনিয়া থেকে] নির্লিপ্ত থাকার মানে এই নয় যে, তুমি কিছুর মালিক হতে পারবে না, বরং এটার অর্থ হচ্ছে: (দুনিয়ার) কোনো কিছুই যেন তোমার মালিক হয়ে না বসে।"

জাহাজে সমুদ্রের পানি প্রবেশের ন্যায়, যখন আমরা দুনিয়াকে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দেবো, তখনই আমরা নিমজ্জিত হবো। জাহাজের মধ্যে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করবে, এমনটি হওয়ার কথা ছিল না, বরং কথা ছিল সমুদ্র হবে [গন্তব্যে পৌঁছানোর] এক মাধ্যম এবং আবশ্যিকভাবে এটা জাহাজের বাইরে থাকবে। ঠিক একইভাবে আমাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রবেশের কথা ছিল না। এটা কেবল এক মাধ্যম, যা কোনো অবস্থাতেই যেন আমাদের অন্তরে প্রবেশ না করে, আর না কখনো আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে আল্লাহ কুরআনে দুনিয়াকে *'মাতা'আ'* হিসেবে উল্লেখ করেন। *'মাতা'আ'* শব্দের অনুবাদ এমন হতে পারে: "ক্ষণস্থায়ী পার্থিব আনন্দের উপকরণ"। দুনিয়া এক উপকরণ মাত্র। এটা এক হাতিয়ার। এটা একটি পথ –এটা গন্তব্য নয়।

ঠিক এই সত্যটি নবি (ﷺ) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যখন তিনি বলেন: "এই দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? এই দুনিয়াতে আমি তো এক মুসাফিরের মতো, যে কিনা গাছের ছায়াতে অল্প কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় নেয় এবং ক্ষাণিকটা আরামের পর, ওই গাছকে পেছনে ফেলে পুনরায় সে পথ চলতে শুরু করে।" [আহমদ, তিরমিযি]

একজন মুসাফিরের উপমাটি একবার চিন্তা করুন। যখন আপনি ভ্রমণ করেন কিংবা আপনি জানেন যে, ওই স্থানে আপনি স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করবেন, তখন কি ঘটে? এক রাতের জন্য যখন আপনি কোনো শহর অতিক্রম করছেন, তখন ওই শহরের প্রতি আপনি কেমন আসক্তি বোধ করেন? যদি জানেন, এটা স্বল্প সময়ের ভ্রমণ, তখন আপনি (কোনো একটা মোটেল, যেমন) 'মোটেল ৬'-এ উঠতে চাইবেন। কিন্তু আপনি কি সেখানে থেকে যাবেন? সম্ভবত না। ধরুন, আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনাকে স্বল্প মেয়াদের এক প্রকল্পের কাজে নতুন এক শহরে পাঠিয়েছে। এটাও ধরে নেন, ওই প্রকল্প কখন শেষ হবে, তিনি আপনাকে সেটা বলে দেননি। কিন্তু আপনি তো জানেন যে, যেকোনো দিন আপনাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে। এমনটি হলে আপনি ওই শহরে কিভাবে দিন কাটাবেন? আপনি কি সেখানে ব্যাপক হারে সম্পদ বিনিয়োগ করবেন এবং দামি আসবাবপত্র ও গাড়ির পেছনে নিজের পুরো সঞ্চয় উড়িয়ে দেবেন? স্বাভাবিকভাবেই না। এমনকি কেনাকাটার ক্ষেত্রে আপনি কি গাড়ি ভরে খাবার এবং অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যাদি ক্রয় করবেন? না। বরং কয়েকটি দিনের জন্য আপনার যতটুকু প্রয়োজন হবে, আপনি ঠিক ততটুকুই ক্রয় করবেন –কেননা, যেকোনো দিন ফিরে আসার জন্য আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনাকে ডাক দিতে পারেন।

এটাই একজন মুসাফিরের মন-মানসিকতা। যখন এই উপলব্ধি আসে যে, অমুক জিনিসটি ক্ষণস্থায়ী, ওই জিনিসটা প্রতি তখন স্বাভাবিক এক অনাসক্তি চলে আসে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই হাদিসে নবি (ﷺ) আপন প্রজ্ঞাতে এই সত্যটি চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। দুনিয়ার এই জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার মাঝে যে বিপদ, তিনি সেটা ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জন্য তিনি এর চেয়ে অন্য কোনো কিছুকে ভয় পেতেন না। তিনি (ﷺ) বলেন: "আল্লাহর কসম, তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্র্যের ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি, দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রাচুর্যে ভরে যাবে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য এটা প্রাচুর্যে ভরে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, যেভাবে তারা করেছিল। আর যেভাবে তারা ধ্বংস হয়েছিল, তোমরাও সেভাবে ধ্বংস হবে।" [মুত্তাফাক আলাইহি]

আশীর্বাদে ধন্য নবি (ﷺ) এই পার্থিব জীবনের আসল সত্যকে চিহ্নিত করেছেন। দুনিয়াতে আসক্ত না হয়েই তিনি দুনিয়াতে অবস্থানের সত্যিকার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিও ওই একই সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, আমাদের সকলকে সেটা পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু তার জাহাজ ভালোভাবেই জানতো যে, এটা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় এটার গন্তব্য। তার জাহাজ ছিল শুকনো। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে সমুদ্র সূর্যের আলোতে করে ঝলমল, সেই সমুদ্র যে জাহাজে একবার প্রবেশ করে, সেটাকে (অন্ধকার) মৃত্যুপুরী বানিয়ে ছাড়ে।

অন্তরের কর্তৃত্ব নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন

কেউই ব্যর্থ হতে চায় না। আর খুব কম মানুষই ডুবে যাওয়ার ভাগ্যকে বরণ করে নিতে চাইবে। উত্তাল সমুদ্রের এই জীবন পাড়ি দিতে গেলে কখনো কখনো দুনিয়াকে প্রবেশ করতে না দিয়ে পারা যায় না। কখনো দুনিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে দুনিয়া আমাদের অন্তরে ঢুকে পড়ে।

আর যেমনিভাবে পানি নৌকাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, তেমনিভাবে দুনিয়া যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তা অন্তরকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সাম্প্রতিককালে ভাঙা নৌকা দেখতে কেমন, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়; যখন আপনি [দুনিয়ার] সবকিছুকে অন্তরে প্রবেশ করতে দেবেন, তখন কি পরিণতি ঘটে, সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, কারণ আমি আমারই মতো একজনকে দেখলাম, যে কিনা এই জীবনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মহব্বতে আসক্ত এবং সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে তৃপ্ত করার বাসনায় সে ব্যাকুল। দুনিয়ার সমুদ্র ঠিক যেভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল আমার নৌকাকে, ঠিক সেভাবে তার নৌকাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং সে অথৈ পানিতে পড়ে। কিন্তু সে দীর্ঘ সময় তাতে নিমজ্জিত ছিল, আর কিভাবে সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে কিংবা কিসের ওপর ভর দিতে হবে, সেটা তার জানা ছিল না।

তাই সে নিমজ্জিত হলো [এবং দুনিয়া তাকে গ্রাস করে নিলো]।

আপনি যদি দুনিয়াকে আপনার অন্তরে প্রবেশ করতে দেন, তবে সমুদ্র যেমনিভাবে নৌকাকে নিমজ্জিত করে, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়াও আপনার অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে। আপনি ডুবে যান সমুদ্রের অতল গহ্বরে, এমনকি সমুদ্রের গহীন তলদেশে। আপনি অনুভব করেন যে, আপনি আপনার নিম্নতর স্তরে পৌঁছে গেছেন। পাপ আর এ জীবনের মহব্বতের জালে আপনি আটকে পড়ে অনুভব করবেন হতাশার কালো মেঘ আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, আপনাকে ঘিরে ধরেছে অন্ধকার। সমুদ্রের তলদেশের বৈশিষ্ট্য এটাই। কোনো আলো সেখানে পৌঁছে না।

যাহোক এই আঁধারঘন স্থানই কিন্তু আপনার জীবনের শেষ অবস্থান নয়। মনে রাখবেন, রাতের আঁধারই ভোরের আলোর পথ দেখায়। যতক্ষণ বইছে আপনার হৃদয়ের স্পন্দন, ততক্ষণ আপনি মৃত নন। আপনাকে এখানেই মরতে হবে না। কখনো কখনো সমুদ্র তলদেশ যাত্রাপথের বিরতির মতো। আর যখনই আপনি আপনার সর্বনিম্ন অবস্থানে পৌঁছে যান, তখনই আপনার দুটো বিকল্পের একটা গ্রহণের সুযোগ এসে যায়। আপনার হাতে দুটো সুযোগ আছে। হয় আপনি সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তলদেশেই পড়ে থাকবেন; আর না হয় সেখান থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করে আবার উঠে দাঁড়াবেন –সাঁতারের এ অভিজ্ঞতা আপনাকে করবে দৃঢ়তর, আর সে রত্নরাজি আপনাকে করে তুলবে আগের চেয়ে ধনী (বিজ্ঞতা ও পরিপক্কতায়)।

আপনি যদি আল্লাহকে চান, তবে তিনি আপনাকে সে অবস্থা থেকে তুলে আনবেন এবং সমুদ্রের তলদেশের আঁধারকে তিনি বদলে দেবেন তাঁর পক্ষ থেকে সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা দিয়ে। যা ছিল এক সময় আপনার চরম দুর্বলতা, তিনি পারেন সেটাকে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত করতে। বানিয়ে দিতে পারেন সেটাকে আপনার সমৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি এবং পরিত্রাণের মাধ্যম। মনে রাখবেন, কখনো কখনো পতন দিয়েই রূপান্তরের সূচনা ঘটে। তাই পতনকে কখনো অভিশাপ দেবেন না। কেননা, জমিনের বুকেই নিহিত রয়েছে নম্রতা ও বিনয়। এটাকে মেনে নেন। এটা থেকে শিক্ষা নেন। নিঃশ্বাসের সাথে একে নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেন। আরও শক্তিশালী, আরও বিনয়ী হয়ে ফিরে আসুন। আল্লাহর প্রতি আপনার নির্ভরশীলতার ব্যাপারে আরও বেশি সচেতন হয়ে ফিরে আসুন। নিজের অসহায়ত্ব ও তার মহিমা দেখার পর ফিরে আসুন। জেনে রাখুন, আপনি যদি ওই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, তবে অনেক কিছুই আপনার দেখা হয়েছে। সেই তো সত্যিকার প্রতারণার শিকার হয়েছে, যে নিজ সত্তাকে দেখেছে, কিন্তু স্রষ্টার দেখা পায়নি। বঞ্চিত তো সে, স্বীয় অন্তরে স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তার যে ব্যগ্র কামনা সুপ্ত আছে, তা যার নজরে কখনো পড়ে না। নিজের মাধ্যম বা উপায়ের ওপর সে আস্থাবান, কিন্তু ওই মাধ্যম, তার আত্মা এবং অস্তিত্ববান যাবতীয় বিষয় যে আল্লাহর সৃষ্টি, এটা সে একদমই ভুলে যায়।

স্রষ্টা যেন আপনাকে ওই পতিত অবস্থান থেকে উচ্চে তুলে আনেন, সেটা তাঁর কাছে চান। কেননা, যখন তিনি আপনাকে তুলে আনবেন, তখন আপনার [ভাঙা নৌকা বা] জাহাজটি তিনি মেরামত করে দেবেন। চিরকালের জন্য যে অন্তর ভেঙে চুরমার হয়েছে ভেবে আপনি বসে আছেন, তা আবারো জোড়া লাগবে। যা কিছু ভেঙে খান খান, তা আবার পূর্ণ হবে। জেনে রাখুন, কেবল তিনিই পারেন এগুলো করতে। তাই কেবল তাঁকেই খুঁজে বেড়ান।

যখন তিনি আপনাকে রক্ষা করেন, তখন [নিজের] ওই পতনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, গভীর অনুশোচনা বোধ করুন, কিন্তু হতাশার চাদর গায়ে জড়াবেন না। যেমনটি ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেন: "আদম (*আলাইহিস সালাম*) যখন জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হন, তখন শয়তান আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সে জানে না, ডুবুরি যখন সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন সে মণি মুক্তা সংগ্রহ করে পুনরায় উপরে ফিরে আসে।"

তওবা (ক্ষমা) ও আল্লাহ (ﷻ) তায়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন করার মাঝে এক শক্তিশালী ও বিস্ময়কর জিনিস নিহিত রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তীরা আমাদের বলেছেন যে, এটা আত্মার পোলিশ (*Polish*) বা পরিশুদ্ধির ন্যায়। পালিশ করার অবাক করা দিক হচ্ছে, এটা কেবল পরিষ্কার ও স্বচ্ছই করে না, বরং যে জিনিসকে পালিশ করা হয়, সে জিনিস ময়লা হয়ে যাওয়ার আগের থেকে আরও বেশি উজ্জ্বল ও ঝকমকে হয়। আপনি যদি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা চান এবং তাঁর দিকে নিজের জীবন এবং অন্তরকে পুনরায় নিবদ্ধ করেন, তবে অধঃপতিত হওয়ার আগে আপনি যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থার চেয়ে আরও সমৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রাখেন। অধঃপতিত হওয়ার ফলে কখনো কখনো এমন প্রজ্ঞা ও বিনম্রতা অর্জিত হয়, যা এটার আগে কখনো অর্জিত হয় না। ইবনে কাইয়্যিম (র.) লিখেন:

> "আমাদের একজন *সালাফ* (সদাচারী পূর্বসূরি) বলেন: 'প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব কথা হলো একজন বান্দার একটি গোনাহ বা পাপের মাধ্যমে একজন জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার অপরজন একটি পুণ্যের কাজ করে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করে।' তাকে প্রশ্ন করা হলো: 'কিভাবে এটা?' এর উত্তরে তিনি বলেন: 'যে পাপ করে, প্রতিনিয়ত সে এটা নিয়ে চিন্তাগ্রস্থ থাকে, যার ফলে সে এ বিষয়ে ভয় পেতে শুরু করে, অনুশোচনা করে, এটার জন্য কান্না-কাটি করে এবং এই পাপের কারণে সে স্বীয় প্রতিপালক, মহাপবিত্র আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে। সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, এক ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এবং তার মাথা থাকে বিনয়ে অবনত। তাই এই পাপ তার জন্য বহু ইবাদত করার চেয়ে বেশি উপকার বয়ে আনে, যেহেতু এটা তাকে বানিয়েছে নম্র ও

বিনয়ী এবং এটা বান্দার জন্য সুখ ও সাফল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি ওই পাপ তাকে জান্নাতে প্রবেশের কারণে পরিণত হয়। অন্যদিকে, যিনি ভালো কাজ করলেন, তার করা ওই ভালো কাজটিও যে স্রষ্টারই একটি অনুগ্রহ, তিনি সেটা মনে করেন না, উল্টো তিনি অহংকারে মেতে উঠেন এবং নিজেকে নিয়ে চমৎকৃত বোধ করতে থাকেন, বলতে থাকেন, 'আমি এই এই অর্জন করেছি।' এটা তার মাঝে আরও বেশি করে আত্ম-তোষণ, গর্ব ও অহংকার উসকে দেয় এবং এটা তার ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণে পরিণত হয়।"

আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদেরকে সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা কখনো আশা না হারাই। তিনি বলেন: "বলো: হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো, তারা আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, আল্লাহই সকল পাপ মোচন করেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমার আধার ও সবচেয়ে দয়াময়।"(কুরআন, ৩৯:৫৩)

তাই যারা স্বীয় সত্তার স্বেচ্ছাচারীতায় সেটার দাসে পরিণত হয়েছেন, নফসানিয়াতের অন্ধকূপ ও কামনা-বাসনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এটা তাদেরকে [জাগ্রত করার] ডাক। যারা দুনিয়ার সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন, যারা এটার গহীনে ডুবে গেছেন এবং এটার উত্তাল তরঙ্গে আটকা পড়ে আছেন, এ আহ্বান তাদের প্রতি। উঠুন। উঠে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেন এবং সমুদ্রের কারাগার থেকে বেরিয়ে সত্যিকার দুনিয়ায় আসুন। নিজের মুক্তির জন্য উঠুন। উঠুন আর ফিরে আসুন জীবনের আঙ্গিনায়। স্বীয় আত্মার মৃত্যুকে পেছনে ফেলে আসুন। আপনার আত্মা এখনো বাঁচতে পারে, হতে পারে আগের থেকে আরও বলিয়ান ও পরিশুদ্ধ। আর তওবা নামক পালিশ কি অন্তরকে আগের থেকে আরও সুন্দর করতে সক্ষম নয়? পাপ করে নিজের অন্তরের ওপর যে পর্দার আবরণ লাগিয়ে রেখেছেন, তা তুলে ফেলুন। জীবন ও নিজের মাঝে, আপনার ও মুক্তির মাঝে এবং আলো ও নিজের মাঝে যে পর্দা তৈরি করে রেখেছেন, সেটাকে সরিয়ে ফেলুন। পর্দার আবরণ সরিয়ে জেগে উঠুন। আপন সত্তার কাছে ফিরে আসুন। যেখান থেকে শুরু করেছেন, আবার সেখানে ফিরে আসুন। বাড়ি ফিরে আসুন। জেনে রাখুন, যখন সকল দরজা আপনার মুখের ওপর বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন একটি দরজা সর্বদাই খোলা থাকে। ওই দরজা সর্বদাই খোলা থাকে। সেটার অন্বেষণ করুন। তাঁকে খুঁজুন এবং তিনিই আপনাকে নির্মম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁর অপার করুণার সূর্যের কাছে।

এই দুনিয়া আপনাকে ভাঙতে পারে না, যদি না আপনি তাকে সেটার অনুমতি দেন। দুনিয়া আপনাকে আয়ত্ত করতে পারে না, যদি না আপনি নিজে থেকে চাবির গোছা তার হাতে তুলে দেন, যদি না আপনি নিজের অন্তরকে দুনিয়ার হাতে তুলে দেন। যদি তেমনটিই হয়ে থাকে, যদি আপনি নিজের ওই চাবিগুলো কিছু সময়ের জন্য তুলে দিয়ে থাকেন দুনিয়ার হাতে, তবে সেটা ফিরিয়ে নেন। এটাই শেষ নয়। এ অবস্থাতেই আপনাকে মরতে হবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। নিজের অন্তরকে পুনরুদ্ধার করুন এবং এটাকে তার উপযুক্ত মালিকের হাতে সমর্পণ করুন, আর সেই মালিক হলেন –আল্লাহ।

প্রেম

'অনুরাগ' ও 'প্রেম'কে একসাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। অনুরাগের সাথে ভয় ও নির্ভরশীলতা জড়িয়ে থাকে এবং এখানে থাকে অন্যের চেয়ে আত্মপ্রীতির আধিক্য। অনুরাগহীন প্রেমই নিখাঁদ প্রেম, কারণ এই প্রেমে থাকে না অন্যের থেকে পাবার বাসনা, যেহেতু আপনার অন্তর [সকল চাওয়া-পাওয়া থেকে] শূন্য। এই প্রেমে থাকে অন্যকে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কেননা, আপনি যে [রুহানিভাবে] পূর্ণ।

অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কয়েদখানা থেকে পলায়ন

সারা যখন আহমদকে দেখে, তখনই সে বুঝতে পারে। এতদিন যাবৎ সে যা যা স্বপ্ন দেখেছিল, আহমদের মাঝে তার সবই আছে। আহমদের সাথে সাক্ষাত ছিল তুষার ঝড়ের মাঝে সূর্যোদয়ের মতো। তার উষ্ণতা হিম-শীতল বরফকে গলিয়ে দেয়। শীঘ্রই এই গুণগ্রাহিতা উপাসনায় রূপ নেয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সারা বন্দি হয়ে পড়ে। তার আরাধ্য জিনিসের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও কামনার জালে সে আটকা পড়ে। যে দিকে তাকায় সে আহমদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। আহমদের অসন্তুষ্টিই এখন তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়। সারার সবটুকু জুড়ে ছিল আহমদ। আহমদ-বিহীন জীবনে সুখ বলে কিছু নেই, সে ছাড়া জীবন তো একেবারে নিরর্থক। তাকে ছেড়ে যাওয়া যেন সারার জীবন্ত অস্তিত্ব থেকে আত্মা বের হয়ে আসার মতো। তার হৃদয় জুড়ে আছে আহমদের চেহারাখানি এবং আহমদ ছাড়া সে কিছুই অনুভব করে না। সারার জীবনে আহমদ যেন ধমনীতে বহমান রক্তের মতো। (সারার কাছে) আহমদ ছাড়া বেঁচে থাকাটা অসহনীয়। কারণ, আহমদের সঙ্গ ছাড়া সুখ অস্তিত্বহীন।

সারা ভাবে সে প্রেমে পড়েছে।

সারা জীবনের বহু ঘাটের জল খেয়েছে। কিশোর বয়সে তার বাবা তাকে ছেড়ে চলে যায়। ১৬ বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে পালায়। শুরু হয় মাদক ও মদের আসক্তির সাথে তার লড়াই। জেলের ঘানিও সে টেনেছে। যাইহোক, তার নিজের হাতে বানানো নতুন কয়েদখানার জ্বালা যে আগের সকল জ্বালা ও যন্ত্রণাকে হার মানাবে, শীঘ্রই সে তা টের পাবে। সারা নিজের কামনার বন্দীতে পরিণত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া (র.) এই দাসত্বের কথা আলোচনা করে বলেন, "প্রকৃত কারারুদ্ধ তো সে-ই, যাকে আল্লাহর (নৈকট্য ও সান্নিধ্য) থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে এবং প্রকৃত বন্দী তো সে-ই, যার কামনা-বাসনা তাকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করেছে।" (ইবনে কাইয়্যিম, আল-ওয়াবিল, পৃ. ৬৯)

সারার এই আহমদ উপাসনা তার আগের সকল যন্ত্রনার চেয়েও মর্মকাতর। এটা তাকে গ্রাস করে, কিন্তু তাকে পূর্ণতা দেয় না। মরুভূমির মধ্যে পানিশূন্য

পিপাসার্ত দগ্ধ একজন মানুষের মতো সারা মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ায়। তার থেকে ভয়াবহ হলো – সেই যন্ত্রণা, যার উদ্ভব ঘটে যখন স্রষ্টার আসনে অন্য কিছুকে রাখা হয়।

সারার ঘটনা বেশ মর্মভেদী। কেননা, তা জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে চিত্রিত করে। মানুষ হিসেবে আমাদেরকে একটি বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তি বা ফিতরাতের ওপর পয়দা করা হয়েছে। সেই ফিতরাত [বা সহজাত প্রবৃত্তি] হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এই সত্যকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা। ফলশ্রুতিতে, আমাদের জীবনে কিংবা আমাদের হৃদয়ে কোনো কিছুকে আল্লাহর সমতুল্য বানানোর যন্ত্রণার সামনে কিছুই তুল্য হতে পারে না। না কোনো মুসিবত, না কোনো লোকসান, আর না কিছুই এই যন্ত্রণার সামনে দাঁড়াতে পারে। যেকোনো পর্যায়ের শির্ক যেভাবে মানব আত্মাকে ভেঙে চুরমার করে, দুনিয়ার কোনো ট্রাজেডিই তেমনটি করতে পারে না। কোনো কিছুকে আল্লাহর মতো করে ভালোবাসা, ভক্তি করা কিংবা সেটার নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে আপনি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যেটার জন্য আপনি সৃজিত হননি, আর না সেটা আপনার সহজাত প্রবৃত্তির অনুকূল। যদি এর বাস্তব চিত্র দেখতে চান, তবে ওই ব্যক্তির দিকে ভালো করে দেখুন, উপাসনার বস্তু হারালে কিভাবে সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

২০১০ সালের ২২ জুলাই দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট করে, ৪০ বছর বয়স্ক এক মহিলা নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে নিজ গৃহে আত্মহত্যা করে। পুলিশ জানায়, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে 'বিবাহের ১৯ পার হয়ে গেলেও কোনো সন্তান জন্ম দিতে না পারায় তিনি এ রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।'

এরকিছু দিন আগেই ১৬ জুলাই পুলিশের রিপোর্ট মোতাবেক ২২ বছরের এক ভারতীয় যুবক প্রেমিকা তাকে ছেড়ে যাওয়ার জের ধরে আত্মহত্যা করে।'

বেশিরভাগ মানুষই, এ সকল মানুষের যন্ত্রণার প্রতি সমবেদনা অনুভব করবেন এবং বেশিরভাগই এমন পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়বেন। কিন্তু সন্তান জন্ম দেওয়া কিংবা আমাদের জীবনে বিশেষ কোনো মানুষের উপস্থিতিই যদি আমাদের অস্তিত্ব বা বেঁচে থাকার সবকিছুতে পরিণত হয়, তবে বুঝতে হবে আমাদের চিন্তার মধ্যে ভয়াবহ রকমের গলদ রয়ে গেছে। সসীম, ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীয়মান কিছু যদি আমাদের জীবনের মূল বিষয়ে পরিণত হয় এবং সেটাই বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমাদের পতন অনিবার্য। অপূর্ণাঙ্গ যে জিনিসটাকে আমরা নিজেদের জীবনের কেন্দ্রে এনে বসিয়েছি, সংজ্ঞা মোতাবেকই সেটা বিবর্ণ, সেটা আমাদেরকে হতাশ করে কিংবা হারিয়ে যায়। আর এমনটি ঘটার সাথে সাথেই আমাদের পতন ঘটে। পাহাড়ে

আরোহণের সময় আপনি যদি নিজের সকল ভারকে একটি ছোট ডালের ওপর স্থাপন করেন, তখন কি হবে একবার ভাবুন তো? পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বলছে, ওই ছোট ডাল তো এমন ভারের কারণে ভেঙে যাবে, যেহেতু এমন ভার বহনের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। মধ্যাকর্ষণ বলের নিয়ম বলছে, এমন পরিস্থিতিতে আপনি নিশ্চিতভাবে নিচে পতিত হবেন। এটা কেবল তত্ত্বকথা নয়। বরং এটাই বস্তুগত পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম। রুহানি দুনিয়াতেও এই বাস্তবতা অনিবার্য এবং কুরআনে আমাদেরকে এই সত্যটিই বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

(কুরআন, ২২:৭৩)

"হে লোক সকল, এখানে একটি উপমা দেওয়া হলো, তাই মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমাদের যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান করো, তারা একত্র হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, আর একটি মাছিও যদি তাদের থেকে কিছু সরিয়ে ফেলে, তবে তারা সেটাও প্রতিহত করতে পারবে না। কতো দুর্বল যারা আকুল আবেদন করছে এবং কতো দুর্বল যাদের কাছে আকুল আবেদন করা হচ্ছে।"

এই আয়াতের মর্মবাণী বেশ গভীর। যতবারই আপনি দুর্বল বা ক্ষীয়মান কিছুর পেছনে ছুটেন, কামনা করেন কিংবা তেমন কিছুর প্রতি আবেদন করেন (সংজ্ঞা অনুসারে আল্লাহ ভিন্ন সবই এটার অন্তর্ভুক্ত[১৮]), তখন আপনি নিজেও দুর্বল ও বিবর্ণে পরিণত হন। এমনকি আপনি যেটার অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন, সেটা যদি পেয়েও যান, তা কখনোই যথেষ্ট হবে না। শীঘ্রই আপনাকে অন্য কিছুর পেছনে ছুটতে হবে। আপনি কখনো সত্যিকার তুষ্টি অথবা তৃপ্তির পরশ পাবেন না। এই কারণে আমরা কেনাবেচা ও নবায়নের এক দুনিয়াতে বসবাস করি। এখানে আপনার ফোন, আপনার গাড়ি, আপনার কম্পিউটার, আপনার সঙ্গীনী, আপনার সঙ্গী সবই নতুন ও উন্নত মডেলের বিনিময়ে বদলানো যায়।

[১৮] (مِن دُونِ اللهِ): আল্লাহ ভিন্ন সবই 'মিন দুনিল্লাহ' পরিভাষার সীমাভুক্ত –(সম্পাদক)।

এতদসত্ত্বেও, এই দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ রয়েছে। যখন আপনি নিজের সমস্ত ভারকে এমন কিছুর ওপর রাখেন, যেটা অনমনীয়, অভঙ্গুর এবং সীমাহীন, তখন আপনি পতিত হতে পারবেন না। আপনি তখন ভেঙে পড়বেন না। কুরআনে আল্লাহ আমাদের সামনে এই সত্যটি তুলে ধরেন, যখন তিনি বলেন:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহতে ঈমান আনে, সে এমন এক দৃঢ় হাতল ধারণ করে, যা কখনো ভেঙে যায় না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ।"

(কুরআন, ২:২৫৬)

আপনি যা ধরে থাকেন, সেটা যদি মজবুত হয়, তখন আপনিও শক্তিশালী বনে যান এবং এই শক্তির সাহায্যেই প্রকৃত মুক্তির পথ সামনে চলে আসে। এই মুক্তির ব্যাপারেই ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, "আমার দুশমন আমার আর কি ক্ষতি করবে? আরে আমার বুকের মাঝেই তো আমার আসমান ও আমার বাগান উভয়ই। আমি যদি ভ্রমণ করি, সেগুলো আমার সাথেই ভ্রমণে সঙ্গি হয় এবং কখনো আমার সঙ্গ ত্যাগ করে না। কারাবন্দি হওয়া আদতে তো আমার জন্য স্বীয় প্রতিপালকের সাথে একাকি সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। নিহত হলে সেটা শহিদের মর্যাদা এনে দেবে এবং নিজভূমি থেকে নির্বাসিত হওয়া তো রুহানি ভ্রমণের ন্যায়।" (ইবনে কাইয়্যিম, আল-ওয়াবিল, পৃ. ৬৯)

ত্রুটিহীন, সমাপ্তিহীন এবং সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত সেই সত্তাকে তার উপাসনা বা ইবাদতের একমাত্র সত্তা হিসেবে গ্রহণ করাকে ইবনে তাইমিয়া এই জীবনের কয়েদখানা থেকে মুক্তির রাস্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এমন একজন ঈমানদারের বর্ণনা দিয়েছেন, যার অন্তর মুক্ত। এই অন্তর পার্থিব জীবন এবং এটাতে থাকা সবকিছুর দাসত্বের মায়াজাল থেকে মুক্ত। এই অন্তর ভালো করেই জানে তাওহিদ (তথা আল্লাহর একত্ববাদের) সাথে আপোস করাটাই সত্যিকার ট্রাজেডি এবং ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সেই সত্তা ছাড়া (মহান আল্লাহ তা'আলা) অন্য কিছু বা অন্য কারো উপাসনা করার মাঝেই পাহাড়সহ মুসিবত লুকিয়ে আছে। এটা এমন এক আত্মা, যা জানে, আল্লাহকে সরিয়ে অন্য কিছুকে নিজের মধ্যে স্থান দেওয়াটাই

সত্যিকার কয়েদখানার বন্দিদশা ডেকে আনে। [উপাসনার] ওই বস্তু কারো নিজের নফসানিয়াত (*Ego*), ধনসম্পদ, চাকুরি, স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান অথবা নিজের জীবন যা-ই হোক না কেন, এসব মিথ্যা উপাস্য আপনাকে ফাঁদে ফেলবে এবং আপনাকে তাদের গোলাম বানাবে, যদি আপনি সেগুলোকে জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করেন। এ ধরনের দাসত্বের যন্ত্রণা এই জীবনে আঘাত হানা সব ধরনের ট্রাজেডির থেকেও ভয়াবহ, গাঢ় এবং সুদূর প্রসারী হবে।

নবি ইউনুস (*আলাইহিস সালাম*)-এর যে অভিজ্ঞতা (এক্ষেত্রে), সেটাকে আত্মস্থ করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিমির পেটে যখন তিনি আটকে যান, তখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা রাস্তা তার কাছে ছিল, তা হলোঃ আল্লাহর কাছে পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া, আল্লাহর একত্ব এবং নিজের মানবীয় দুর্বলতাকে উপলব্ধি করা। তার দু'আ এই সত্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেঃ "আপনি ছাড়া ভিন্ন কোনো ইলাহ নেই, মহিমা আপনার এবং আমি ভুল করেছি।" (কুরআন, ২১:৮৭)

আমাদের অনেকেই নিজেদের কামনা ও বাসনারূপী তিমির পেটে এবং এসব উপাসনার বস্তুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা তখন নিজেদের আমিত্বের গোলামে পরিণত হই। বস্তুত নিজেদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে স্থান দেওয়ার কারণেই এমন দাসত্বের আবির্ভাব ঘটে। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভীষণ যন্ত্রণার কয়েদখানাতে আবদ্ধ করি। কেননা, দুনিয়ার কয়েদখানা আমাদের থেকে শুধু ক্ষণস্থায়ী ও নিখুঁত নয় এমন জিনিসই ছিনিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে রুহানি কয়েদখানা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, যা কিছু পরম, অসীম ও পরিপূর্ণঃ মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক।

আমি যা অনুভব করছি, তা কি প্রেম?

'প্রেম চরম মাত্রার এক মানসিক ব্যাধি' প্লেটো প্রেমকে এ ভঙ্গিতেই চিত্রিত করেছেন। কেউ যদি কখনো 'প্রেমে পড়ে' থাকেন, তবে তিনি এই বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা দেখতে পাবেন, তথাপি এখানে বড় ধরনের ভ্রান্তি রয়ে গেছে, আসলে প্রেম মানসিক ব্যাধি নয়, বরং কামনা হচ্ছে মানসিক ব্যাধি।

'প্রেমে পড়ার' মানে যদি হয় আমাদের জীবন হবে বিদ্ধস্ত এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বো, দূর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়বো, একেবারে নিঃশেষিত হবো, স্বাভাবিক কাজকর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়বো এবং এর (অর্থাৎ ভালোবাসার) জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবো, তবে এটা আর যাই হোক প্রেম নয়। আমাদের চারপাশের সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদেরকে যে ধারণা দেয় তা সত্ত্বেও আসল কথা হলো, সত্যিকার প্রেম আমাদের মাদকাসক্তের মতো করে তুলবে না।

আর তাই বেড়ে ওঠার সময়কালে আমাদের দেখা চলচ্চিত্রে সর্বগ্রাসী মোহ হিসেবে প্রেমকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়, সেটা আসলে প্রেম নয়। এর নাম ভিন্ন। এটা হচ্ছে 'হাওয়া': একজন ব্যক্তির নিচু স্তরের কামনা, অনর্থক বাসনা এবং কামস্পৃহাকে বোঝাতে কুরআন এই শব্দটি ব্যবহার করেছে। যারা এসব কামনাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সবচেয়ে পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন: "তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখুন, বস্তুত তারা নিজেদের কামনা (হাওয়া) ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করে না। আল্লাহর কাছ থেকে আসা হেদায়েতকে বাদ দিয়ে নিজের কামনাকে যে অনুসরণ করে, তার থেকে পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?" (কুরআন, ২৮:৫০)

আল্লাহর হেদায়েতের ওপর যখন আমরা আমাদের কামনা ও বাসনাকে প্রাধান্য দেই, বস্তুত তখন আমরা ওইসব কামনা-বাসনার উপাসনাকে বেছে নেই। পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা যখন আমাদের কাছে 'আল্লাহর প্রেম' থেকেও শক্তিশালী হয়ে যায়, বস্তুত তখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে আমাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ বলেন: "এমনও মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে সমতুল্যরূপে (উপাসনা) করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করেই তারা ওদের ভালোবাসে। অন্যদিকে ঈমানদারগণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় দৃঢ়।" (কুরআন, ২:১৬৫)

কোনো কিছুর প্রতি প্রেম যদি আমাদেরকে আমাদের পরিবার, আমাদের সম্মান, আমাদের আত্মমর্যাদা বোধ, আমাদের দেহ, আমাদের বিবেক, আমাদের মানসিক শান্তি, আমাদের দ্বীন, এমনকি আমাদের স্রষ্টা, যিনি আমাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, এসব কিছুকে পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে জেনে রাখুন, আমরা 'প্রেমে পড়িনি', বরং আমরা দাসে পরিণত হয়েছি। এ ধরনের লোক সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ "আপনি কি তাকে দেখেন না, যে নিজের কামনা ও বাসনাকে (হাওয়া) নিজের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং তার কর্ণে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন এবং তার দৃষ্টিশক্তির ওপর পর্দা ঢেলে দেন।" (কুরআন, ৪৫:২৩)

কারো দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং অন্তর সবকিছুর ওপর মোহর লেগে আছে, এ রকম পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা একটিবার ভাবুন তো। বস্তুত হাওয়া কোনো তৃপ্তি বয়ে আনে না। এটা এক কয়েদখানা। এটা দেহ, মন ও আত্মার দাসত্ব। এটা এক ধরনের আসক্তি (*Addiction*) এবং এক ধরনের উপাসনা। সাহিত্যের জগতে এই বাস্তবতার ভুরি ভুরি উদাহরণ চোখে পড়বে। চার্লস ডিকেন্সের *Great Expectations*-এ *Pip* এই বাস্তবতার উজ্জ্বল উপমা। এসথেলার প্রতি নিজের মোহকে সে এভাবে বর্ণনা করেঃ "দুঃখজনক হলেও আমি জানতাম যে, সব সময় না হলেও প্রায়শই আমি তাকে ভালোবাসতাম, সকল যুক্তি, প্রতিজ্ঞা, শান্তি, আশা, সুখ ও সমস্ত নিরুৎসাহিতা সত্ত্বেও (আমি তাকে ভালোবাসতাম)।"

চার্লস ডিকেন্সের সৃষ্ট চরিত্র *Miss Havisham* এটাকে আরও বিস্তৃত করেনঃ "আমি তোমাকে বলবো... সত্যিকার প্রেম কি জিনিস। এটা হলো অন্ধভক্তি, প্রশ্নহীন আত্মবিসর্জন, চরমভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া, নিজ সত্তা এবং গোটা দুনিয়ার থেকে বিশ্বাস ও আস্থা তুলে নেওয়া এবং নিজের অন্তর ও আত্মাকে প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণ করা (যে তোমাকে উপর্যুপুরি আঘাত করে চলেছে)।"

চার্লস ডিকেন্সের সৃষ্ট চরিত্র *Miss Havisham*-এর বর্ণনা নির্জলা সত্য হলেও এটা সত্যিকার প্রেম নয়, বরং এটা 'হাওয়া'। প্রকৃত প্রেম যেটা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে, সেটা না কোনো ব্যাধি আর না কোনো নেশা বা মোহ। আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ [কুরআনে] বলেনঃ "এটা তাঁর নির্দশন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গি-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম ও মমত্ববোধ স্থাপন করেছেন। চিন্তাশীল লোকদের জন্য এসবের মাঝে নিদর্শন আছে।" (কুরআন, ৩০:২১)

সত্যিকার প্রেম আনে প্রশান্তি, আত্মিক যন্ত্রণা নয়। সত্যিকার প্রেম আপনার নিজের সাথে এবং আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কে প্রশান্তি দান করে। এজন্য আল্লাহ বলেন: "যাতে তোমরা প্রশান্তিতে বাস করতে পারো।" অন্যদিকে 'হাওয়া' এটার বিপরীত। 'হাওয়া' আপনার জীবনকে অসহনীয় বানাবে। একটা নেশার মতো আপনি পাগলপারা হয়ে তা খুঁজে ফিরবেন, কিন্তু কখনো তৃপ্ত হবেন না। নিজের পতন ঘটা পর্যন্ত আপনি এটার পেছনে ছুটেই যাবেন, কিন্তু কখনোই এর নাগাল পাবেন না। আর নিজের পুরো সত্তাকেও যদি এটার কাছে সঁপে দেন, তথাপিও এটা আপনাকে কখনো সুখের সন্ধান দেবেন না।

পরম সুখই যখন সকলের লক্ষ্য, তখন মোহজাল অতিক্রম করা এবং প্রেমকে 'হাওয়া' (প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা) থেকে পৃথক করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অব্যর্থ একটি পথ হচ্ছে, নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা: আমি যাকে 'ভালোবাসি', তার কাছাকাছি হওয়াটা কি আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, নাকি আমাকে আল্লাহর কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়? সহজভাবে বললে, ওই ব্যক্তি কি আমার অন্তরে আল্লাহর স্থান দখল করেছে?

প্রকৃত বা নিখাঁদ প্রেম না কখনো আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রেমের সাথে সংঘর্ষ বাধাবে, আর না কখনো সেটার সাথে প্রতিযোগিতা করবে। ওই প্রেম বরং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ভালোবাসা ও সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। এই কারণে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া বৈধ সীমার মাঝে থেকেই সত্যিকার প্রেম সম্ভব। ওই সীমার বাইরে যা আছে, তার সবই 'হাওয়া', যেটার কাছে হয় আমরা নিজেদেরকে সঁপে দেই, আর না হয় আমরা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করি। হয় আমরা আল্লাহর গোলাম, নইলে আমরা 'হাওয়া' তথা প্রবৃত্তির দাস। একসাথে দুটো কখনো সম্ভব নয়।

মিথ্যা আমোদ-প্রমোদের সাথে সংগ্রাম করেই আমরা সত্যিকার প্রশান্তি পেতে পারি। কেননা, এই দুটো তাদের সংজ্ঞা মোতাবেকই পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া।[১১] এই কারণে নিজেদের কামনা ও বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জান্নাত লাভের পূর্ব শর্ত। আল্লাহ বলেন: "স্বীয় প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর যে ভয় করে এবং নিজের আত্মাকে যে পাপ থেকে বিরত রাখে, প্রকৃতপক্ষে, জান্নাতই তার আবাসস্থল।" (কুরআন, ৭৯:৪০-৪১)

[১১] *Mutually exclusive*: পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া অর্থাৎ একটি থাকলে অপরটির স্থান হবে না – (সম্পাদক)।

বাতাসে প্রেমের আভাস

বাতাসে প্রেমের আভাস!

... কিংবা কম করে হলেও এটাই আপনি ভাবুন, বিজ্ঞাপন নির্মাতারা ফেব্রুয়ারি মাসে এটাই চায়। ভালোবাসা প্রকাশ করাটা ভালো, কিন্তু ভ্যালেনটাইন ডে (ভালোবাসা দিবস) তো বছরে একবারই আসে, আর এ সময় হয় আপনাকে ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে, আর না হয় হৃদয়হীন পাষাণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। এদিকে ফেব্রুয়ারি আসলে বুটিকের শোরুম আর চকলেটের দোকানগুলোতে যেন ঈদের আমেজ সৃষ্টি হয়।

তথাপি, এমনি বাণিজ্যিক প্রেমের ভিড়েও কেউ নিজের ভালোবাসার মানুষদের কথা না ভেবে পারেন না। আমরা যখন এসবে ব্যতিব্যস্ত হই, তখনই আমরা অনিবার্যভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হই।

ঠিক এমন কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি এক সময় আমিও হয়েছিলাম, যখন আমার এক বন্ধুর কিছু কথা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম। ভালোবাসার ওই মানুষটির সাথে থাকার অনুভূতি কেমন, সে আমাকে ব্যাখ্যা করছিল। তার ভাষায়, যখন তারা (অর্থাৎ সে আর তার ভালোবাসার মানুষটি) একত্র হয়, গোটা দুনিয়া তখন তাদের ভাবনা থেকে হারিয়ে যায়। তার এই বক্তব্য নিয়ে আমি যতই ভাবতে থাকি, এটা আমাকে ততই বিচলিত করে এবং একই সাথে এটা আমাকে বেশ অবাকও করে।

মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করবো, আমাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আমাদের মানবীয় প্রকৃতির একটি অংশ। একদিকে অপর একজন মানুষের প্রতি আমরা এমনটি অনুভব করি, একই সময় প্রতিদিন পাঁচবার আমাদের স্রষ্টা ও প্রভুর সাথে আমরা সাক্ষাৎকারে মিলিত হই? আমি ভাবি, (সলাতরত অবস্থায়) স্রষ্টার উপস্থিতিতে কতবার আমরা অনুভব করেছি যে, গোটা দুনিয়া আমাদের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে, অন্য কারো থেকে বা অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা থেকে আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বেশি, আমরা কি আসলেই সে দাবি করতে পারি?

আমরা প্রায়ই ভাবি আল্লাহ আমাদেরকে শুধু বালা-মুসিবতের দ্বারাই পরীক্ষা করেন, এটা সত্য নয়। আরাম-আয়েশ, সুখ ও স্বস্তি দিয়েও আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। তিনি আমাদেরকে নেয়ামত (অনুগ্রহ) এবং আমাদের ভালোবাসার বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং সচরাচর আমাদের অনেকেই এসব পরীক্ষায় অকৃতকার্য হই। আমরা অকৃতকার্য হই, কারণ আল্লাহ যখন আমাদেরকে এসব অনুগ্রহ দান করেন, তখন মনের অজান্তেই এগুলোকে আমরা মনে মিথ্যা উপাস্যে রূপ দেই।

আল্লাহ যখন আমাদেরকে অর্থ দিয়ে আশীর্বাদপুষ্ট করেন, তখন আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অর্থের ওপর ভরসা করতে শুরু করি। আমরা ভুলে যাই আমাদের রিযিকের উৎস কখনোই অর্থ সম্পদ নয়, বরং তিনিই রিযিকের উৎস যিনি (আমাদেরকে) অর্থ দিয়েছেন। এই বিভ্রান্তির ফলেই হঠাৎ করেই আমরা ব্যবসার ক্ষতির আশংকায় এলকোহল জাতীয় পণ্যও বিক্রি শুরু করি কিংবা ব্যবসায় নিরাপত্তার জন্য আমরা সুদে ঋণ নেই। পরিহাসের বিষয় হলো, রিযিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাবশতঃ আমরা কিনা রিযিকদাতাকেই অমান্য করতে শুরু করি!

আল্লাহ যখন আমাদেরকে ভালোবাসার মানুষ দিয়ে ধন্য করেন, তখন আমরা ভুলে যাই যে, আল্লাহই হলেন এই অনুগ্রহের দাতা এবং আমরা ওই মানুষটিকে ঠিক তেমনিভাবে ভালোবাসতে থাকি, যেমনিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। ওই মানুষটি তখন আমাদের সবকিছুর কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমাদের সকল চিন্তা, পরিকল্পনা, আশা ও ভয় সবকিছু ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। ওই মানুষটি যদি আমাদের বিবাহিত সঙ্গি না হয়, তখন আমরা তার সঙ্গ লাভের জন্য কখনো কখনো হারাম পন্থা বেছে নিতেও পিছপা হই না। তারা যদি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চায়, তবে আমাদের গোটা দুনিয়া ভেঙে পড়তে চায়। অনুগ্রহদাতাকে বাদ দিয়ে আমরা উল্টো অনুগ্রহকেই আরাধনা করতে শুরু করি।

এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ "এমনও মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে [তাঁর] সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে। [বস্তুত] তারা তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো করে ভালোবাসে। অন্যদিকে ঈমানদারগণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় সুদৃঢ়।" (কুরআন, ২:১৬৫) আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহে ধন্য হওয়ার পর এভাবে পথচ্যুত হওয়ার প্রবণতার কারণে আল্লাহ কুরআনে আমাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেনঃ "বলো, [হে মুহাম্মদ], 'যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীগণ, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যার মন্দা পড়ার আশংকা তোমরা করো এবং তোমাদের বাসস্থানগুলো – যা তোমরা ভালোবাসো, যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা এগুলো প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করো। এবং আল্লাহ কোনো অবাধ্য জাতিকে হেদায়েতের রাস্তা দেখান না।" (কুরআন, ৯:২৪)

এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত আয়াতে যেসব জিনিসের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হালাল (বৈধ) এবং এগুলো তো স্বয়ং আল্লাহরই অনুগ্রহ ও নেয়ামত। এসব অনুগ্রহের কিছু কিছু তো আল্লাহর নিদর্শনও বটে। একদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তাঁর নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গি পয়দা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ করো এবং তিনিই তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এসবের মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।" (কুরআন, ৩০:২১)

অন্যদিকে আবার আল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন, তাই তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।" (কুরআন, ৬৪:১৪)

এই আয়াতের হুঁশিয়ারী অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আমাদের স্বামী বা স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানাদিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু এগুলো হচ্ছে ওই অনুগ্রহ, যেগুলোকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আপনি যে জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, দেখবেন সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সব থেকে বড় পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ যদি হয়, হাজারো শুভেচ্ছা কার্ড ও গোলাপের ভিড়ের ওপারে অপেক্ষমান সত্যিকার ও বৃহত্তর ভালোবাসাকে[২০] উপলব্ধি করা, তবে তাই হোক। আর তার উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক সময় এখনই নয় কি? কেননা, এতকিছুর পরেও বাতাসে যে ভালোবাসার আভাস পাওয়া যায়।

[২০] প্রকৃত ও বৃহত্তর ভালোবাসা হলোঃ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। কারণ তিনিই অনুগ্রহ করে আমাদের ভালোবাসার মানুষ এবং ভালোবাসার জিনিসগুলি দান করেছেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি ও প্রকাশ কোনো দিন বা সময়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। তার উপযুক্ত সময় এখনই – এ মুহূর্তে – (সম্পাদক)।

ভালোবাসার সন্ধানে

আমি আমার গোটা জীবন সৃষ্টির পেছনে ছুটে কাটিয়েছি। আসলে আমি এমন একজন, যাকে আপনারা 'কাঙাল' বলে থাকেন। আমি বন্ধু-বান্ধবের কাঙাল, আমি লোকজনের সঙ্গের কাঙাল। হতাশাকে কিভাবে সামাল দিতে হয়, আমি তা জানি না।

আমাদেরকে সৃষ্টির পেছনে তাড়িয়ে বেড়ানোর মূলে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। ভালোবাসার আদান ও প্রদানের এই জরুরত, আসলে সৃষ্টিকর্তাই আমাদের মাঝে ঢেলে দিয়েছেন। প্রতিটি প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তার পেছনে রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। ভালোবাসার এই আদান ও প্রদানকে একটা চালিকা শক্তি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ এমনই এক চালিকা শক্তি, যা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে টেনে নেয়। আপনি দেখুন, আমাদের সূচনা হয়েছে আল্লাহর দ্বারা এবং আল্লাহ চান আমরা যেন আখিরাতে তাঁর কাছে ফেরার আগেই এই দুনিয়াতেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তাই তিনি আমাদের অন্তরে বিভিন্ন চালিকা শক্তি স্থাপন করেছেন, প্রতিনিয়ত যা আমাদের ফিরিয়ে নিতে চায়। ফিরিয়ে নিতে চায় আমাদের নিজ বাড়িতে।

কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে, পথ চলতে চলতে আমরা পথের দিশা হারিয়ে ফেলি।

আমাদের মধ্যে (ফিরে আসার) এই তাড়নাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু আমরা পথ হারাই। কারণ, আমরা ভুলভাবে এ চাহিদা পূর্ণ করতে চাই। আমরা ভুল জায়গায় এই চাহিদা পূরণ করতে চাই। আল্লাহই আমাদের মধ্যে এই চালক সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে সে আমাদের আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এর পরিবর্তে আমাদেরকে সে সৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়। আর এখানেই আমরা পথ হারিয়ে ফেলি।

আমরা কেনইবা অন্যের পেছনে ছুটি? কেনইবা আমরা অর্থের পেছনে দৌড়াই? যশ-খ্যাতি কিংবা ক্ষমতার পেছনে কেন আমরা ছুটছি? আমরা এগুলোর পেছনে দৌড়াই, কারণ আমরা ভালোবাসা পেতে চাই, পেতে চাই সম্মান। আমরা ভাবি এগুলো অর্জন করতে পারলেই প্রেম-ভালোবাসা ও সম্মান উভয়ই আমাদের ভাগ্যে জুটবে।

অন্যদিকে জগৎ পরিচালিত হয় এক চিত্তাকর্ষক ফর্মূলায়। আর তা বেশ সরল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায় অধিকাংশ সময় আমরা এই ফর্মূলাটা ভুল বুঝি। হ্যাঁ, আমাদের সকলের মাঝেই একই তাড়না রয়েছে। কিন্তু (থাকলে কি হবে) মানুষ খুবই তাড়াহুড়োপ্রবণ। বিলম্বের চেয়ে তাৎক্ষণিক, অদৃশ্যের চেয়ে দৃশ্যমান, আত্মিক বিষয়ের চেয়ে বৈষয়িক বা বস্তুগত বিষয়ই আমরা পছন্দ করি। যা কিছু দেখা যায়, অনুভব করা যায় এবং ছোঁয়া যায়, সেগুলোর দিকেই আমরা হন্যে হয়ে ছুটি। আমরা তার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, যা আমাদের "ধারণায়" নিকটতর। আমরা এমনটা করি, কারণ মানুষ যেমন কাঙাল আর নির্ভরশীল, তেমনি সে বড়ই ধৈর্যহারা ও দুর্বল। যা কিছু নিকট, সহজ ও দ্রুততর, আমরা কেবল তার প্রতি ধাবিত হই।

তাই আমরা কেবল সৃষ্ট বস্তুর দিকে ছুটি।

দেখুন তো, আমরা ভাবি –এই দুনিয়ার পেছনে যতই দৌড়াবো, অন্যের ভালোবাসার পেছনে যতই ছুটবো এবং ধন, সৌন্দর্য আর প্রতিপত্তির পেছনে যতই হন্যে হয়ে দৌড়াবো, সেগুলো ততই আমাদের হাতের নাগালে আসবে। আমরা ভাবি, জিনিসটা আমরা যত ব্যাকুলভাবে চাইবো, সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। যখন আমরা সেটা পাই না, তখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হই সৃষ্টিকর্তার প্রতি। যেন আমার চাওয়ার 'ব্যাকুলতাই' আমাকে ওই জিনিসটার যোগ্য দাবিদার বানিয়ে দিয়েছে।

এমন ভ্রান্ত হিসাব-নিকাশে আমরা যতই ডুবতে থাকি, নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা ততই ব্যর্থ হতে থাকি এবং ততই আমরা ভালোবাসা ও জিন্দেগির সত্য-সঠিক অথচ সরল সূত্র থেকে বিচ্যুত হতে থাকি। ওই সূত্রটি বেশ পরিষ্কার: আমরা যতই ব্যাকুলভাবে সৃষ্টিকে পেতে চাইবো, সেটা হাসিলের সম্ভাবনা আমাদের ততই হ্রাস পেতে থাকবে। আপনার যদি ভালোবাসার প্রয়োজন হয় এবং আপনি যদি সেটা সৃষ্টির কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন, 'সত্যিকার' অর্থে আপনি কখনোই সেটা পাবেন না, কিংবা সেটা যথেষ্টরূপে পাবেন না। সৃষ্টির যা কিছুই লক্ষ্য বানাবেন, সেটাই আপনার থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

এবং সেটা কখনো আপনাকে তৃপ্ত করবে না।

এমনকি স্বয়ং সুখও –যতই আপনি তার পেছনে ছুটবেন, ততই তা আপনার থেকে কেবলই পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু আপনি যদি এসব বাদ দিয়ে মহান আল্লাহর পানে ছুটেন, সুখ আপনার পেছন পেছন দৌড়াবে। আপনি যদি মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হোন, মানুষের ভালোবাসা আপনার দিকে ধাবিত হবে। যদি আপনি মহান আল্লাহর দিকে দৌড়ান, সফলতা আপনার পিছে দৌড়াবে –এই দুনিয়া ও পরবর্তী জীবনের প্রকৃত সফলতা। আপনি আল্লাহর পানে ধাবিত হলে রিযিক আপনার পানে ছুটবে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এটাই সে গোপন সূত্র যার জন্য অত্যাচারীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে শহরের পর শহর, আর রাজারা খুঁজে বেড়িয়েছে দুনিয়া, কিন্তু পায়নি তার সন্ধান।

এটাই সেই গোপন রহস্য। এই ফর্মূলাই আপনার প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ একটি হাদিসে রয়েছে, এক লোক নবি (ﷺ)-এর কাছে এসে বলে: “হে আল্লাহর রসুল, আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দেন, যেটা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবে এবং লোকজনও আমাকে ভালোবাসবে।” তিনি (ﷺ) বলেন: “দুনিয়া থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত করো, তবে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।” [ইবনে মাজাহ]

পরিহাসের বিষয় হলো: আমরা লোকজনের স্বীকৃতি ও ভালোবাসার পেছনে ছুটানো কমাই, ততই আমরা সেগুলো পেতে শুরু করি। যতই আমরা অন্যের থেকে নির্লিপ্ত হই, ততই তারা আমাদের পানে ছুটে আসে এবং পেতে চায় আমাদের সান্নিধ্য। এই হাদিস আমাদেরকে এক নিগূঢ় সত্যের সাথে পরিচয় করায়। যখনই আমরা সৃষ্টি কেন্দ্রিক আবর্তনের এই কক্ষপথকে ভেদ করবো, কেবল তখনই আমরা আল্লাহ এবং মানুষ উভয়েরই সাথে সম্পর্কে সফলতা লাভ করবো।

আল্লাহর অভিমুখে ছুটাই হলো অন্তরের সজীবতা। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, সেগুলোর সাথে প্রাণপণ সংগ্রাম করাই তাঁর পানে ছুটা। আল্লাহর পানে দৌড়ানো মানেই অন্তরের গতিশীলতা। আপনি যদি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হোন, তবে আপনি আল্লাহর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন না। আপনি অধঃপতিত হচ্ছেন। আল্লাহর অভিমুখে দৌড়ানো, তাঁর পানে ছুটে চলতে হলে জীবনের প্রতিটি চলমান মূহূর্তে নিজের অন্তরকে তাঁরই অভিমুখে ঝুঁকিয়ে দিতে হয়। প্রতিটি উদ্দেশ্য, প্রতিটি নিয়ত এবং প্রতিটি গন্তব্যকে আল্লাহমুখী করাই তাঁর পানে ছুটার মর্ম। আপনার সকল সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হবেন আল্লাহ। আপনার সংগ্রামের তিনিই নিমিত্ত। আপনার লড়াইয়ের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তিনি। তাই আপনাকে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে

হবে। আপনার সাধ্য মতো শ্রেষ্ঠ মা হওয়ার সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ বাবা, শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী, শ্রেষ্ঠ ছাত্র, কন্যা, পুত্র, কর্মজীবি – সবক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

এসবই আমাদের নবিগণের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার, তাদের সকলের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। তাদের দেহ ছিল এই দুনিয়াতে সংগ্রামমুখর। নবি (ﷺ) ছিলেন সর্বোত্তম নেতা, সর্বোত্তম পিতা, সর্বোত্তম স্বামী এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তার দেহ ছিল এই দুনিয়াতে কঠোর পরিশ্রমরত, আর তার আত্মা সর্বাবস্থায় ছিল আল্লাহর সাথে। যদিও তার দেহ ছিল কিছু সময়ের জন্য এই দুনিয়াতে, কিন্তু তার আত্মা ছিল ইতোমধ্যেই আখিরাতের অভিমুখে। বস্তুত তার আত্মা নিজ আবাসেই ছিল। তার আত্মা জীবনের মায়াজাল ভেদ করে দেখতে সক্ষম হয়েছিল। তার অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ কঠিন পরিশ্রম করেছে, খুবই কঠিন। তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন, কেঁদেছেন, তথাপি অবিরাম সংগ্রামে রত থেকেছেন। তার দেহ (তাহাজ্জুদে) দাঁড়িয়ে থেকেছে, এমনকি তার পা দুটো ফেটে গেছে। তার দেহ তায়েফের ময়দানে নির্যাতিত হয়েছে। তার দেহ নির্ঘুম থেকেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জ্বর, কষ্ট আর হারানোর বেদনাতে তিনি বারবার কাতর হয়েছেন।

এতো কিছুর পরও তার আত্মা ছিল কেবলই আল্লাহমুখী।

আর আল্লাহর সান্নিধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কষ্ট এবং হারানোর বেদনা কিছুই না। একজন পিতা, একজন নেতা, একজন বন্ধু এবং একজন স্বামী হিসেবে তার এই দৈহিক সত্তাকে নানামুখী সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। যদিও তার দেহকে এইসব বহুমুখী সংগ্রামে রত থাকতে হয়েছে, তথাপি তার অন্তর আল্লাহর অভিমুখ থেকে একচুলও সরে আসেনি। এই দিকেই ফিরে ছিল তার পুরো সত্তা। তার অন্তর ছিল কেবলই আল্লাহমুখী। ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) কতই না সুন্দর করে বলেছেন:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(কুরআন, ৬:৭৯)

"নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। আর আমি কোনো অবস্থাতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) স্বীয় অন্তরকে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করেছেন। সম্পূর্ণভাবে। বিশুদ্ধভাবে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে। আপনার আত্মাকে আংশিকভাবে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করার পরিণামে শুধু কষ্টই ভোগ করতে হবে। আর সেই ভোগান্তি হবে আল্লাহর সমীপে আংশিক সমর্পণের পরিমাণ অনুযায়ী। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে জানিয়ে দিচ্ছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে (তথা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণে) দাখিল হও, আর শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

(কুরআন, ২:২০৮)

শুধু আংশিক আত্মসমর্পণেই নিহিত রয়েছে যন্ত্রণা। "শান্তি ও নিরাপত্তা" বলতে যা বুঝায়, তা আছে শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যেই। নিজের গোটা সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পিত করার মধ্যে। আর আংশিক সেজদা (তথা আত্মসমর্পণে) আছে শুধুই যন্ত্রণা। নিজের অন্তরকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার মাঝে আছে শুধুই যন্ত্রণা, যদিওবা তা কেবল আংশিকভাবে হয়। ওই যন্ত্রণা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না আপনি নিজের সম্পূর্ণ অন্তরকে 'কেবল' একটি দিকেই ফেরাচ্ছেন, যতক্ষণ না আপনি নিজের সম্পূর্ণ অন্তরকে 'কেবলই' মহান স্রষ্টার পানে নিবেদিত করছেন এবং যতক্ষণ না তিনি পরিণত হচ্ছেন আপনার সকল চেষ্টা ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্যে।

আমরা তো দিনে কম করে ১৭ বার হলেও বলি: "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আমরা শুধু আপনারই কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাই।" (১:৫)। আল্লাহই সত্যিকার অর্থে চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তিনিই হলেন ওই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রকৃত মাধ্যম। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছানো অলীক কল্পনা মাত্র। *লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ:* "আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।"

এমনিভাবে যে নিজের অন্তরকে পূর্ণরূপে আল্লাহর পানে ঝুঁকিয়ে দেয়, সেই সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ পায়। আর তখন ওই ব্যক্তি সৃষ্টির দ্বারা কোনো ক্ষতির মুখোমুখি হয় না। আগুন নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। যার অন্তর শুধু আল্লাহর পানে নিবিষ্ট, সৃষ্টির "আগুন" (তথা ক্ষতি[২১]) তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর্থিক, দৈহিক, আবেগপূর্ণ, সামাজিক এবং মানসিক কোনো আগুনই ওই ব্যক্তির কোনো ক্ষতি ডেকে আনতে পারে না, যার অন্তর 'কেবল' আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে। হ্যাঁ, বাইরে থেকে তাকে ক্ষতিগ্রস্থই মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ওই ব্যক্তি আদৌ ক্ষতির শিকার হননি। এমন পরিস্থিতির হাকিকত মূলত ক্ষতি নয়, বরং কল্যাণ, যেমনটি আমরা নবি (ﷺ)-এর বাণী থেকে জানতে পারি:

> "ঈমানদারের বিষয়টি আসলেই অবাক করার মতো। সবকিছুতেই তার জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এটা শুধু ঈমানদারের জন্যই। সে কোনো কল্যাণ লাভ করলে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, যেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" [মুসলিম]

এই অনুগ্রহ কেবলই ঈমানদারের জন্যই। যার অন্তর সম্পূর্ণরূপে কেবল একটি দিকে ফিরে (তথা আল্লাহর দিকে[২২]) থাকে, এই অনুগ্রহ তারই জন্যে। মনে রাখবেন, আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(কুরআন, ২:২০৮)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে (তথা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণে) দাখিল হও, আর শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

শান্তি ও নিরাপত্তাতে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে। 'পূর্ণতার সাথে' যে প্রবেশ করে, সে-ই "পূর্ণ নিরাপত্তা" লাভ করে। মনে রাখবেন অন্তর কোনো নিশ্চল-স্থির সত্তা নয়। স্বয়ং সংজ্ঞা মোতাবেক যা পরিবর্তিত হয়, তাই অন্তর (এই কারণে অন্তরের আরবি শব্দ 'ক্বালবে'র উৎপত্তি ওই ধাতু থেকে হয়েছে, যার মর্ম 'পরিবর্তিত হওয়া')। অন্তর তাই যা পরিবর্তিত হয়, ঝুঁকে পড়ে। তাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে

---

২১ – (সম্পাদক)।

২২ – (সম্পাদক)।

অন্তরকে প্রতিনিয়ত মনোযোগের চূড়াতে ফিরিয়ে আনা, কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করানো।

আর এই কাজে আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর সাহায্য কামনা করি, যেমনিভাবে নবি (ﷺ) সর্বদা দু'আ করতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনে (পথে) দৃঢ় রাখুন।"

বারবারের এই নবায়নকৃত অবস্থাই তওবা, প্রত্যাবর্তন। বারবার, বারবার এবং বারবার, যতক্ষণ না আমরা স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হচ্ছি। সেই তো ব্যর্থ, যে এই সংগ্রাম ছেড়ে পালায়। আত্মতুষ্টি বা হতাশার কারণে অন্তরকে (স্রষ্টার প্রতি[২৩]) মনোযোগের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে যে হাল ছেড়ে দেয়, কেবল সেই এই দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ হয়।

আমরা সবাই ভালোবাসা চাই। চাই আল্লাহ ও সৃষ্টির কাছ থেকে এই ভালোবাসা পেতে। আমরা সবাই কিছু না কিছুর পেছনে ছুটছি। পরিহাসের বিষয় হলো, যতই আমরা সৃষ্টির পেছনে দৌড়াই না কেন, সৃষ্টি ততই আমাদের কাছে থেকে দূরে সরে যেতে থাকে! যখনই আমরা সৃষ্টির পেছনে দৌড়ানো বন্ধ করি এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হই, তখন সৃষ্টিই আমাদের পেছনে ছুটতে আরম্ভ করে। এটা নিতান্তই সহজ ও সরল একটা সূত্র:

সৃষ্টির পেছনে দৌড়ান, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়কেই হারাবেন। স্রষ্টার দিকে ধাবিত হোন। আপনি স্রষ্টা 'এবং' সৃষ্টি উভয়কেই পাবেন।

আল্লাহ হলেন 'আল-ওয়াদুদ' (ভালোবাসার উৎস)। এ কারণে স্রষ্টার কাছ থেকেই ভালোবাসা উৎসারিত হয়, মানুষের কাছ থেকে নয়। আরেক লেখক চার্লস এফ হানেল বিষয়টিকে এভাবে বলেছেন, "ভালোবাসা পেতে হলে ... নিজেকে ভালোবাসায় পূর্ণ করুন, যতক্ষণ না আপনি চুম্বকে রূপান্তরিত হচ্ছেন।"

[২৩] – (সম্পাদক)।

যখন নিজেকে আপনি পূর্ণ করবেন সকল ভালোবাসার উৎস আল-ওয়াদুদ, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দিয়ে, তখন আপনি পরিণত হবেন ভালোবাসার চুম্বকে। ভীষণ সুন্দর এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ আমাদেরকে এটার শিক্ষা দিয়েছেন:

> "আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তিনি তখন জিব্রাইল (*আলাইহিস সালাম*)-কে ডেকে বলেন: 'আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তাকে ভালোবাসো।'" নবি (ﷺ) বলেন: "তখন জিব্রাইল ওই বান্দাকে ভালোবাসে। এরপর সে আসমানে চিৎকার করে বলতে শুরু করে: 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসে, তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' আসমানের অধিবাসীগণ তখন ওই বান্দাকে ভালোবাসে। নবি (ﷺ) বলেন: "এরপর দুনিয়াতে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।" [মুসলিম, বুখারি, মালিক ও তিরমিযি]

আমরা সবাই ছুটছি। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে খুব কম লোকই সঠিক গন্তব্যের পানে ছুটছে। আমাদের সবার উদ্দেশ্য এক। কিন্তু সেখানে যেতে হলে আমাদেরকে থামতে হবে। আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে, আমরা কি উৎসের দিকে দৌড়াচ্ছি নাকি মরীচিকার দিকে ছুটছি।

এরই নাম ভালোবাসা

আর এমনও মানুষ আছেন, যারা তাদের সারাটা জীবন কেবল অনুসন্ধান ও তালাশের পেছনে কাটিয়ে দেন। কখনো দেন, কখনো নেন। কখনো বা কোনো কিছুর পেছনে ছুটেন, তবে প্রায়শই অপেক্ষায় কাটিয়ে দেন। তারা মনে করেন, ভালোবাসা একটা স্থানের নাম, যাতে পৌঁছাতে হয়ঃ এমন এক গন্তব্য, যার অবস্থান এক লম্বা পথের শেষ প্রান্তে। লক্ষ্যে উপনীত হয়ে এ পথের সমাপ্তি ঘটার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যারা আত্মার আন্দোলনে প্রবলভাবে আন্দোলিত হোন। এরা আশাহত রোমান্টিকের দল, সেই সব অতি সরল মানুষ, যারা কোনো প্রেম কাহিনী অথবা ভক্তির আন্তরিক অভিব্যক্তিতে আপ্লুত থাকেন। তাদের জন্য এই অনুসন্ধান জীবনব্যাপী মোহের মতো। কিন্তু বিয়োগান্তক এই 'অনুসন্ধানে'র জন্যও মূল্য দিতে হয়, আবার অন্যদিকে এর ফায়দাও রয়েছে।

প্রত্যাশা এবং 'ভালোবাসার প্রেমে পড়ে যাওয়া' সত্যই যন্ত্রণার এক পথ, তথাপি এই পথে চলে যথেষ্ট শিক্ষাও লাভ করা সম্ভব। ভালোবাসার প্রকৃতি, এই দুনিয়া, এখানের লোকজন এবং নিজের আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা এই যন্ত্রণাদায়ক পথের আস্তর তৈরি করে। সর্বোপরি ভালোবাসা জিনিসটা স্রষ্টা সম্পর্কে এই পথে তার নিজস্ব শিক্ষাও বয়ে আনতে পারে।

যারা এই পথ বেছে নেয়, প্রায়শই তারা এই জ্ঞান লাভ করে যে, মানুষের ভালোবাসা –যা তারা অন্বেষণ করছে, সেটা সত্যিকার লক্ষ্য নয়। কিছু মানবীয় প্রেম আশীর্বাদ হতে পারে, তা (জীবন পথের) একটা উপকরণ হতে পারে, কিন্তু যখনই আপনি সেটাকে লক্ষ্যে পরিণত করবেন, তখনই আপনার পতন ঘটবে। একটি ভুল বস্তুতে নিজের মনোযোগকে নিবিষ্ট করে আপনি তখন আপনার গোটা জীবন কাটাতে থাকবেন। "উপকরণ"-এর স্বার্থে আপনি নিজের "উদ্দেশ্য"-কে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। আপনি তখন দুনিয়াবী পূর্ণতার এক অবাস্তব 'গন্তব্যে' পৌঁছানোর জন্য আপনার জীবন শেষ করবেন।

আর যে মরীচিকার পেছনে ঘুরে, সে কখনো তার নাগাল পায় না, বরং সে অনবরত ছুটতেই থাকে। একইভাবে আপনিও কেবলই ছুটতে থাকবেন, প্রস্তুত থাকবেন নিদ্রা বিসর্জন দিতে, কাঁদতে, রক্তাক্ত হতে এবং আপন সত্তার মূল্যবান অংশ এমনকি ওই সময়টিতে নিজের আত্মমর্যাদাকে উৎসর্গ করতেও আপনি পিছপা হবেন না। এই দুনিয়াতে আপনি যা খুঁজে ফিরছেন, তার নিকটে কখনোই পৌঁছাতে পারবেন না। কেননা, আপনি যা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেটা দুনিয়াবী কোনো লক্ষ্য নয়। আপনি যে ধরনের পূর্ণতার সন্ধান করছেন, সেটা এই বস্তুগত দুনিয়াতে কখনোই পাবেন না। সেটা কেবল আল্লাহর মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আপনি মানবীয় প্রেমের যে ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেটা জীবন নামক মরুভূমিতে একটা মরীচিকা বৈ কিছুই নয়। এটাই যদি হয় আপনার অনুসন্ধান, তবে আপনি এর পেছনে কেবল ছুটেই যাবেন। মরীচিকার যত কাছেই আপনি যান না কেন, সেটাকে তো আর আপনি ছুঁয়ে দেখতে পারবেন না। আপনি কোনো কল্পনার ছবির মালিক হতে পারেন না। আপনি নিজের মনের সৃষ্ট কোনো কাল্পনিক জিনিসকে ধরে দেখতে পারেন না।

এতো কিছুর পরেও আপনি নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেবেন শুধু ওই 'স্থানে' পৌঁছানোর জন্য। আপনি এমনটি করেন, কারণ রূপকথার গল্পে সেখানেই ওই কাহিনী শেষ হয়। সেখানে সমাপ্তি হয় সন্ধান লাভ, মিলন ও বিবাহের মধ্য দিয়ে। দুটো আত্মার মিলনের মধ্যে এই স্থানের সন্ধান মিলে। আপনার আশেপাশের সবাই আপনাকে ধারণা দেবে যে, যেখানে আপনি আপনার মনের মানুষের সন্ধান পান, খুঁজে পান আপনার অর্ধাঙ্গকে এবং পথের যে সীমানায় গিয়ে আপনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন, সেখানেই আপনার পথের সমাপ্তি। এরপর এবং কেবল এরপর তারা আপনাকে বলেবে, হ্যাঁ, তুমি এবার সম্পূর্ণ হয়েছো। নিশ্চিতভাবে এটা মিথ্যা। কেননা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে কখনোই পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব নয়।

তথাপি একেবারে শিশুকাল থেকেই প্রতিটি গল্পে, প্রতিটি গানে, প্রতিটি চলচ্চিত্রে, প্রতিটি বিজ্ঞাপনে এবং প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ী খালা-চাচীগণ আপনাকে শুধু এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, এসব ছাড়া আপনি অসম্পূর্ণ। আল্লাহ না করুক, আপনি যদি হোন 'হতভাগ্য' কোনো অবিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত কেউ, তবে আপনাকে কোনো না কোনোভাবে অসম্পূর্ণ অথবা ত্রুটিপূর্ণ মানুষ মনে করা হয়।

আপনাকে শেখানো হয় যে, বিবাহের মাধ্যমে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে এবং তখনই জান্নাতের সূচনা ঘটে। তখনই আপনি মুক্তি পাবেন, পূর্ণ হবেন এবং যা এক সময় ভেঙে গিয়েছিল, তার সবই ওই সময় ঠিক হয়ে যাবে। একমাত্র সমস্যা হলো যে, এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। বরং এখান থেকেই কাহিনীর শুরু। এখান থেকেই হয় গড়ে ওঠার সূচনাঃ গড়ে উঠে জীবন, গড়ে উঠে আপনার চরিত্র, গড়ে উঠে মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিঃ সবর, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং কুরবানির ভিত্তি। গড়ে উঠে আত্মত্যাগের মতো মহান এক গুণ। গড়ে উঠে সত্যিকার ভালোবাসা।

এবং সেই সাথে গড়ে উঠে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার রাস্তা।

কিন্তু আপনি যাকে বিবাহ করেছেন, আপনার সমগ্র মনোযোগ যদি তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, তবে আপনার দুর্দশার সূচনা হলো মাত্র। আপনার স্বামী বা স্ত্রীই তখন আপনার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হবে। যতক্ষণ না আপনার অন্তরের যে স্থানে কেবল আল্লাহরই থাকার কথা, সেই স্থান থেকে ওই মানুষটিকে না সরাবেন, ততক্ষণ তা আপনাকে কেবল যন্ত্রণাই দিয়ে যাবে। পরিহাসের বিষয় হলো, আপনার স্বামী বা স্ত্রীই হবে এই যন্ত্রণাদায়ক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার হাতিয়ার এবং তা চলবে যতক্ষণ না আপনি উপলব্ধি করছেন যে, মানব হৃদয়ে এমন কিছু স্থান আছে, যা আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর নিজের জন্যই বানিয়েছেন।

লাভ-লোকসান, সফলতা-ব্যর্থতা এবং হাজারো ভুলের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আপনি অন্যান্য শিক্ষার সাথে সাথে অপর যে শিক্ষা লাভ করেন, তা হচ্ছেঃ অন্ততপক্ষে দু' ধরনের ভালোবাসা রয়েছে। এমনকিছু মানুষ রয়েছে, যাদের আপনি ভালোবাসেন। কারণ আপনি তাদের থেকে কিছু পান – তারা আপনাকে যা দেয় কিংবা তারা আপনার মধ্যে যে ধরনের আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করে (তার কারণে আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন)। বেশিরভাগ ভালোবাসাই সম্ভবত এমন ধরনের হয়ে থাকে, যা ভালোবাসার একটা বড় অংশকেই এতো অস্থিতিশীল করে ফেলে। একজন মানুষের দেওয়ার ক্ষমতা অস্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল। আপনাকে যা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়াও অস্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল। তাই আপনি যদি কোনো একটা বিশেষ আবেগের পেছনে ছুটতে থাকেন, তবে আপনি সেটার পেছনেই আজীবন হন্যে হয়ে ছুটবেন। কোনো আবেগই স্থির নয়। আর প্রেম-ভালোবাসা যদি হয় এরই ওপর নির্ভরশীল, সেটাও হয়ে পড়বে অস্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল। এই দুনিয়ার সবকিছুর মতো, যতই আপনি এসবের পেছনে দৌড়াবেন, ততই সেগুলো আপনার থেকে দূরে সরে যাবে।

কিন্তু কখনো কখনো আপনার জীবনে এমন কিছু কিছু মানুষ আসে, যাদের আপনি ভালোবাসেন – তারা কেমন সেই ভিত্তিতে, তারা আপনাকে কি দিল, সেজন্য নয়। তাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য আপনি উপলব্ধি করেন, তা মহান সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্যের প্রতিফলন মাত্র। এজন্যই আপনি তাদের ভালোবাসেন। আর তখন সহসাই আপনি কি পাচ্ছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, বরং মুখ্য হয়ে উঠে আপনি তাদেরকে কি দিতে পারছেন, সেটা। এটাই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। এটাই দ্বিতীয় ধরনের ভালোবাসা, যেটা খুবই দুষ্প্রাপ্য। এই ভালোবাসা যদি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে হয় এবং যদি তা কখনো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, তবে এ ধরনের ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপহার দেয়। এমন প্রেম ছাড়া অন্যসব প্রেমই ভিক্ষুকে পরিণত করে, বানায় নির্ভরশীল এবং সৃষ্টি করে অসম্ভব সব প্রত্যাশা – যা হলোঃ যাবতীয় যন্ত্রণা এবং নৈরাশ্য সৃষ্টির উপাদান।

যারা তাদের গোটা জীবন কেবল খুঁজে ফিরছেন, তারা নিশ্চিন্তে জানবেন যে, যেকোনো জিনিসের বিশুদ্ধতা পাওয়া যাবে কেবল তার উৎসে। আপনি যদি ভালোবাসারই সন্ধান করেন, তবে আল্লাহর মাধ্যমেই তা খুঁজুন। আল্লাহর প্রেমের ভিত্তি ছাড়া যত ঝর্ণা আছে, তার সবই পানকারীর মধ্যে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়। পানকারী তা পান করতেই থাকবে, যতক্ষণ না বিষক্রিয়ায় সে মারা পড়ছে। আত্মিকভাবে সে কেবল মারা যেতেই থাকবে, যতক্ষণ না সে থামছে এবং বিশুদ্ধ পানির ঝর্ণা খুঁজে পাচ্ছে।

যখন আপনি সুন্দর সবকিছুকে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিফলন ভাবতে শুরু করেন, তখনই আপনি সঠিক পথে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসতে শিখেন। তখন আপনি যা কিছু ভালোবাসেন এবং যাকেই ভালোবাসেন না কেন, তা হবে আল্লাহরই জন্য, আল্লাহরই মাধ্যমে এবং আল্লাহরই কারণে। এমন ভালোবাসার বুনিয়াদ হলেন আল্লাহ তা'আলা। এ ধরনের ভালোবাসাতে আপনি যা আঁকড়ে ধরেন, না সেটা কোনো অস্থির আবেগ, আর না সেটা ক্ষণস্থায়ী কোনো অনুভূতি। আর যার দিকে আপনি ধাবিত হচ্ছেন, তা আর কোনো সাময়িক মত্ততা নয়। এমন অবস্থায় আপনি যা আঁকড়ে ধরেন, যার পেছনে আপনি ছুটেন এবং যা আপনি ভালোবাসেন, তার সবটুকুই আল্লাহ কেন্দ্রিকঃ যিনি হলেন একমাত্র স্থিতিশীল ও অবিচল সত্তা। অতঃপর, আর যা কিছুই ঘটবে, তার সবই হবে আল্লাহর মাধ্যমে। আপনি যা কিছু দেবেন অথবা নিবেন, ভালোবাসবেন অথবা ঘৃণা করবেন, তার সবই হবে আল্লাহর অধীন (অর্থাৎ তাঁর হেদায়েত অনুযায়ী)[২৪]। এগুলোর কিছুই আপনার নফসের

---

[২৪] – (সম্পাদক)।

অনুসরণে হবে না। সবই হবে মহান স্রষ্টার জন্য নিবেদিত। কিছুই আপনার নফসের খায়েশের জন্য নয়।

এসবের মর্ম দাঁড়াচ্ছে, আপনি তা-ই ভালোবাসবেন, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তা আপনিও কোনো অবস্থাতেই ভালোবাসবেন না। আর যখন আপনি এভাবে ভালোবাসবেন, তখন সৃষ্টিকে দান করবেন, তার থেকে প্রতিদানে কি পাবেন, তার আশায় নয়। আপনি ভালোবাসবেন, আপনি বিলিয়ে যাবেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রয়োজন মেটানো হবে। আর যার প্রয়োজন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মেটান, সকল প্রেমিকের মাঝে সেই তো সবচেয়ে ধনী ও মহৎ। আপনার ভালোবাসা হবে আল্লাহরই অধীন, আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহরই কারণে। এটাই সৃষ্ট বস্তুর দাসত্ব থেকে আত্মার মুক্তি। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এটাই প্রকৃত সুখ। এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

প্রেমে পড়ুন সত্যিকার জিনিসের

ছেড়ে দেওয়াটা কখনোই সহজ নয়। আসলেই কি তাই? আমাদের অধিকাংশই একমত হবো যে, আমরা যা ভালোবাসি, তা ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ কমই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো আমাদেরকে সেটাই করতে হয়। আমরা কখনো এমন কিছুকে আমরা ভালোবাসি, যা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কখনো এমন জিনিস চাই, যা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। ভালোবেসে ফেলি এমন জিনিসকে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন না। (ভালোবাসার) এসব জিনিসকে ছেড়ে দেওয়া আসলেই কঠিন। মন যা পেতে ব্যাকুল, তা ছেড়ে দেওয়া, আমাদের সংগ্রামগুলোর মাঝে সবচেয়ে কঠিন।

কিন্তু এটা যদি এমন কঠিন সংগ্রামের একটা বিষয় না হতো? এগুলোকে ছেড়ে দেওয়াটা যদি এ রকম কষ্টকর না হতো? এ সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করার সহজ কোনো রাস্তা কি আছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই আছে! এর থেকে ভালো কিছু খুঁজে নেন।

বলা হয়, যতক্ষণ না আপনি পূর্বের চেয়ে উত্তম কিছু বা কাউকে না পাচ্ছেন, ততক্ষণ আপনি পূর্বের ভালোবাসার স্মৃতি কাটিয়ে উঠতে পারেন না। মানুষ হিসেবে আমরা শূন্যতাকে ভালোভাবে সামলাতে পারি না। যেকোনো শূন্য স্থান পূরণ করতেই হবে, অবিলম্বে। শূন্যতার কষ্ট বড়ই কঠিন। যন্ত্রণা ভুক্তভোগীকে ওই শূন্যস্থান পূরণে বাধ্য করে। এক মুহূর্তের এক বিন্দু শূন্যতা ডেকে আনে দুঃসহ যন্ত্রণা। তাই আমরা ছুটে চলি এক মানসিক পেরেশানি থেকে আরেক মানসিক পেরেশানিতে, ছুটে ফিরি এক আসক্তি থেকে আরেক আসক্তির দিকে।

অন্তরের মুক্তির আশায় আমরা প্রায়শই বলি, এজন্য আমাদেরকে মিথ্যা নির্ভরশীলতার বাঁধ ভেঙে ফেলতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন চলে আসে, 'কিভাবে' [আমরা এসব বাঁধ ভেঙে ফেলবো]? মনের মাঝে একবার যখন মিথ্যা অনুরাগ তৈরি হয়, তখন কিভাবে আমরা তার মায়াজাল ছিন্ন করবো? প্রায়শই এটা বেশ কঠিন বলে মনে হয়। যেসব জিনিসে আমরা মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ি, সেগুলো যেন আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। এমনকি যখন সেগুলো আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, এমনকি যখন সেগুলো আমাদের জীবন এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করছে, এমনকি যখন

সেগুলো আমাদের জন্য চরম অনিষ্টকর, তখনও আমরা আমাদের আসক্তিগুলোকে ছাড়তে পারি না। সেগুলোর ওপর আমরা চরমভাবে নির্ভরশীল। আমরা সেগুলোকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং সেটা অবশ্যই ভুলভাবে। এসব জিনিস আমাদের অন্তরকে এমন কিছু দিয়ে পূর্ণ করে দেয়, যা আমরা অপরিহার্য ভাবি ... ভাবি ওটা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। এমনকি যখন আমরা সেগুলো ত্যাগ করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হই, প্রায়শই তা খুবই কঠিন –এই বিবেচনায় আমরা সে প্রচেষ্টাই বন্ধ করি।

এমনটি কেন হয়? আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেটার স্বার্থে আমরা যা ভালোবাসি, সেটাকে কেন কুরবানি দিতে আমাদের এতো সমস্যা হয়? আমরা কেন ওই জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিতে পারি না? আমার মনে হয়, আমাদের ভালোবাসার জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিতে আমাদের এতো কষ্টের কারণ হলো: আমরা তা প্রতিস্থাপন করার জন্য অধিকতর ভালোবাসার কোনো বস্তু এখনো খুঁজে পাইনি।

একটা শিশু যখন খেলনা গাড়ির প্রেমে পড়ে, তখন ওই গাড়ির প্রতি আকর্ষণ তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু গাড়িটি পাওয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয়? কেমন লাগবে তার যখন সে প্রতিদিন ওই দোকানের পাশ দিয়ে যাবে, আর পছন্দের খেলনাটি দেখবে? যতবারই সে তার পাশ দিয়ে যাবে, ততবারই সে কষ্ট পাবে। সেটা যেন সে চুরি করে না ফেলে, সেজন্য হয়তো বেশ কষ্ট করে নিজেকে সংবরণ করতে হবে। কিন্তু শিশুটি যদি দোকানের জানালার দিকে তাকিয়ে সত্যিকারের একটা গাড়ি দেখতে পায়, তখন তার কেমন লাগবে? কেমন হবে তার অনুভূতি, যদি সে সত্যিকারের ফেরারি[২৫] গাড়ি দেখতে পায়? তবে সে কি আর খেলনা গাড়ির জন্য কষ্ট করবে? ওই খেলনা গাড়ি চুরি থেকে নিজেকে সংবরণের জন্য নিজের সাথে যুদ্ধ করবে? নাকি সে ওই খেলনা গাড়ির পাশ দিয়ে স্বাচ্ছন্দেই হেঁটে যাবে? চমৎকারিত্বের ভারসাম্যের কারণে সংগ্রামের স্পৃহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে।

আমরা ভালোবাসা চাই, চাই অর্থ, চাই প্রতিপত্তি, চাই এই জীবন। ওই শিশুর মতো আমরাও এসবের প্রেমে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। যখন আমরা এসবের নাগাল পাই না, আমাদের অবস্থা দাঁড়ায় দোকানে যাওয়া ওই শিশুর মতো, যে খেলনা গাড়ি চুরি করা থেকে নিজেকে সামলে রাখতে লড়ে যায়। আমাদের ভালোবাসার জিনিসের জন্য আমরা হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য লড়ে যাই। হারাম সম্পর্ক, হারাম ব্যবসায়িক লেনদেন, হারাম কাজ ও বেশভূষাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়। আসলে এই জীবনের প্রতি আমাদের যে মহব্বত, তা ছেড়ে দিতেই আমাদের সংগ্রাম করতে হয়। আমাদের অবস্থা ওই হোঁচট খাওয়া

[২৫] এক ধরনের আকর্ষণীয় দামি গাড়ি।

বান্দার মতো, যাকে সামান্য একটি খেলনার মোহ ছেড়ে দেওয়ার সংগ্রাম করতে হচ্ছে ... কারণ আমরা কেবল এতটুকুই দেখি!

এই জীবন এবং যা কিছু আছে, তার সবই ওই খেলনা গাড়ির মতো। আমরা একে ছাড়তে পারি না। কারণ এর থেকেও উত্তম ও মহত্তর কোনো জিনিসের সন্ধান আমরা পাইনি। প্রকৃত বিষয় আমরা দেখতে পাই না, না পুরো দৃশ্যপট, না প্রকৃত নকশাখানি।

আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"এই দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।"

(কুরআন, ২৯:৬৪)

এই দুনিয়ার জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরবি শব্দ 'الْحَيَاةُ' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আখিরাতের জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা জীবনের জন্য ব্যবহৃত আধিক্যসুলভ আরবি পরিভাষা 'الْحَيَوَانُ' ব্যবহার করেছেন। কারণ, আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন। ওটাই আসল জীবন। জীবনের প্রকৃত সংস্করণ। 'যদি তারা জানতো' এই বলে আল্লাহ অত্র আয়াতের সমাপ্তি টানেন। আমরা যদি সত্যিকার অবস্থা দেখতে পেতাম, তবে ক্ষীণ ও সারবত্তাহীন এই মডেলের (অর্থাৎ দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী যাবতীয় জিনিসের)[২৬] প্রতি আমাদের যে গভীর মোহ রয়েছে, আমরা তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারতাম। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্টতর।"

(কুরআন, ৮৭:১৬-১৭)

[২৬] – (সম্পাদক)।

(জীবনের এই প্রকৃত) সংস্করণ যেমন গুণগতভাবে উত্তম (خَيْرٌ), তেমনিভাবে পরিমাণের দিক থেকেও সেটা উত্তম (أَبْقَى)। দুনিয়ার এই জীবনের কোনো জিনিস, যা আমরা ভালোবাসি, তা যতই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তাতে সর্বাবস্থায়ই গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই কোনো না কোনো ত্রুটি ও কমতি থেকেই যাবে। গুণগত দিক দিয়ে তাতে থাকবে অপূর্ণতা, আর পরিমাণগত দিক দিয়ে তা হবে অস্থায়ী।

এর মানে এই নয় যে, এই দুনিয়ার জীবনের কিছুই আমরা ভোগ করতে বা ভালোবাসতে পারবো না। কেননা, মুমিন হিসেবে আমাদের এই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই দুটো জীবনের তুলনা খেলনা গাড়ি ও সত্যিকার গাড়ির মতো। খেলনা গাড়িটি যতই আমাদের হোক, এমনকি সেটা নিয়ে যতই খেলায় মত্ত হই না কেন, দুটো গাড়ির পার্থক্যটা আমরা ঠিকই বুঝি। নকল মডেল (দুনিয়াঃ এই শব্দটি 'দানইয়া' ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থই হলোঃ 'নিম্ন')। আর বিপরীত দিকে আছে আখিরাত, যা জীবনের প্রকৃত মডেল বা সংস্করণ।

কিন্তু এই উপলব্ধি কিভাবে আমাদের এই জীবনে সাহায্য করতে পারে? এটা আসলেই আমাদেরকে সাহায্য করে, কারণ হালাল মোতাবেক জীবন পরিচালনার সংগ্রাম এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে এটাকে সহজতর করে। সত্যিকার বিষয় (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত চিত্র)[২৭] যতই আমরা দেখতে পাই, প্রয়োজনের মুহূর্তে "অপ্রকৃত" পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য ততই সহজ হয়ে যায়। এর মানে এই নয় যে, "অপ্রকৃত"-কে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বা সব সময়ের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। বরং এর ফলে, আমাদেরকে নকল মডেল (অর্থাৎ দুনিয়ার) সাথে এমন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হবে যে, যখন আমাদেরকে আসল মডেলের স্বার্থে নকল মডেলের কিছু একটা অংশ ছেড়ে দিতে বলা হবে, তখন তা ছেড়ে দেওয়া আর আমাদের জন্য কষ্টকর হবে না। যদি বলা হয়, কোনো হারাম কাজ, যা আমরা কামনা করছি, তা থেকে বিরত থাকতে, তবে ওই হারাম কাজ থেকে বিরত থাকাটা আমাদের জন্য সহজতর হয়ে যায়। (একইভাবে) যদি বলা হয় মনে না চাইলেও কোনো নির্দেশ পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করো, তবে ওই আদেশ পালন আমাদের জন্য সহজতর হয়ে যায়। আমরা যেন ওই পরিণত শিশু, খেলনা গাড়িকে যে পছন্দ করে, কিন্তু তাকে যদি কখনো বলা হয় খেলনা গাড়ি ও সত্যিকার গাড়ির মধ্য থেকে যে কোনো একটি বেছে নাও, তবে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তার 'দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না।' উদাহরণস্বরূপ, নবি

[২৭] – (সম্পাদক)।

(ﷺ)-এর বহু সাহাবিরই ধনসম্পদ ছিল, কিন্তু প্রয়োজনের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওই সম্পদের অর্ধেক বা পুরোটা বিলিয়ে দিতে তারা বিন্দু মাত্র কার্পণ্যবোধ করেননি।

এভাবে (প্রকৃত বিষয়ের দিকে) মনোযোগী হওয়ায়, আমাদের সাহায্য বা অনুমোদনের বিষয়ও পরিবর্তন হয়ে যায়। কোনো কিছু পাওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে পড়লে, আমরা তখনই একজন গোলামের কাছে এর জন্য আবেদন করবো, যখন আমরা প্রকৃত বাদশাহকে দেখি না বা তাকে চিনি না। বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার প্রাসাদে যাওয়ার পথে যদি তার দাসের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়, তবে হয়তো আমরা ওই দাসকে সম্ভাষণ জানাবো, তার প্রতি দয়াপরশ হবো, এমনকি আমরা ওই দাসকে হয়তো ভালোবেসেও ফেলতে পারি; তথাপি আমরা ওই দাসকে খুশি করার জন্য সময় নষ্ট করবো না, যখন রাজাকে খুশি করাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা কখনো ওই দাসের কাছে আমাদের আবেদন পেশ করে সময় নষ্ট করবো না, যখন বাদশাহই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। বাদশাহ ওই দাসকে যদি কিছু ক্ষমতা দিয়েও থাকেন, তবু আমরা ভালো করেই জানি যে, ওই ক্ষমতা তুলে নেওয়া এবং প্রদান করার অধিকার কেবল বাদশাহরই এবং বাদশাহ নামদারই কেবল তা করার অধিকার রাখেন। এই জ্ঞান অর্জিত হয় কেবল প্রকৃত বাদশাহকে চেনা ও জানার মাধ্যমে। আর এই জ্ঞানের ফলে দাসের সাথে আমাদের আচরণের ধরনও সম্পূর্ণ বদলে যায়।

প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধির কারণে আমাদের ভালোবাসার ধরনটাই বদলে যায়। ইবনে তাইমিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: "আপনার অন্তর যদি কারো জন্য নিবেদিত হয়ে যায়, যে আপনার জন্য হারাম, তবে (বুঝতে হবে) আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরাটাই এমন মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম মূল কারণ। কেননা, আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতার স্বাদ যে অন্তর একবার পেয়েছে, তার কাছে তখন এটার চেয়ে কিছুই আর মধুর লাগবে না এবং অপর কিছুই আর তার কাছে না আনন্দের লাগবে, আর না মূল্যবান মনে হবে। কেউই তার ভালোবাসার পাত্রকে পরিত্যাগ করে না, যদি না সে এরচেয়েও উত্তম কাউকে ভালোবাসে, অথবা অন্য কারো ভয়ে সে ভীত হয়। সত্যিকার প্রেমের টানে কিংবা হারামের ভয়ে অন্তর তখন ভ্রান্ত প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে।"

"ওয়াহ্ন" তথা 'দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়া' –উম্মত হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা, যেমনটি নবি (ﷺ) একটি হাদিসে আমাদের জানিয়েছেন। আসলে আমরা দুনিয়ার মহব্বতে জড়িয়ে পড়েছি।

যখনই আপনি কোনো কিছুর প্রেমে পড়েন, তখন ওই প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করা কিংবা সেটার মায়া ত্যাগ করা আপনার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যতক্ষণ না আপনি সেটার থেকে উত্তম কিছুকে ভালোবাসেন। দুনিয়ার এই ধ্বংসাত্মক প্রেমকে আমাদের অন্তর থেকে উৎখাত করাটা প্রায় অসম্ভব, যদি না আমরা এটার প্রতিস্থাপক হিসেবে উত্তম কিছু পাচ্ছি। উচ্চতর প্রেমের সন্ধান লাভই আমাদের জন্য অপর ভালোবাসার পাত্রটি পরিত্যাগ করাকে সহজ করে দেয়। আল্লাহর প্রেম, তাঁর প্রেরিত রসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে জান্নাতে বাস করার অনন্ত বাসনা যখন দৃশ্যমান হয়, তখন সেটা অন্তরের অন্যসব প্রেম ও ভালোবাসাকে হটিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে পরাস্ত করে। এমন ভালোবাসা যতই দৃশ্যমান হবে, ততই তা প্রবল হবে। এবং এর মাধ্যমে নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালামের*) বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলাটা হবে বেশ সহজঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"বলো, 'নিশ্চয়ই আমার সলাত,
আমার কুরবানি, আমার জীবন
এবং আমার মৃত্যু জগতের
প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।"

(কুরআন, ৬:১৬২)

তাই ছেড়ে দেওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে ভালোবাসার (সমস্যার) উত্তর। তাই ভালোবাসুন। এমন কিছুকে ভালোবাসুন, যা সকল কিছুর চাইতে মহান। সত্যিকার জিনিসের প্রেমে পড়ুন। (জান্নাতের) বালাখানাকে চোখের সামনে রাখুন। কেবল তখনই পুতুলের ঘর নিয়ে এ খেলা বন্ধ করতে আমরা সক্ষম হবো।

একটি সফল বিবাহের হারানো সূত্র

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রবন্ধে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ন্যূনতম পর্যায়ের হলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। শ্রদ্ধাবোধের ধারণা কখনোই নিপীড়নকে অনুমোদন করে না, হোক তা শারীরিক, আবেগ কিংবা মানসিক পর্যায়ের নিপীড়ন। নিজের বিরুদ্ধে কিংবা নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে চালানো নিপীড়নকে হজম করাটা 'সবর' (ধৈর্য ধারণ) করা নয়। আল্লাহ (ﷻ) কখনোই অবিচার ও নিপীড়নকে অনুমোদন করেন না, আমাদেরও সেটা করা উচিত নয়।]

"এটা তাঁর নির্দশন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত চিন্তাশীল লোকদের জন্য এসবের মাঝে নিহিত রয়েছে নিদর্শন।" (কুরআন, ৩০:২১)

অগণিত বিয়ের দাওয়াতপত্রে আমরা এই আয়াতটি প্রায় সবাই পড়েছি। কিন্তু ক'জনে এটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি? আমাদের ক'জনেরই বিবাহ আল্লাহর বর্ণিত এই প্রেম ও মমতাকে সত্যিকার অর্থে ধারণ করে? কি সেই সমস্যা, যার কারণে আমাদের এতো অধিক সংখ্যক বিবাহ শেষমেশ ডিভোর্স বা তালাকের মাধ্যমে সেগুলোর সমাপ্তি ঘটছে?

Love & Respect: The Love She Most Desires; The Respect He Desperately Needs[২৮] গ্রন্থের লেখক ড. এমারসন এগরিচেস-এর মতে উত্তরটি খুবই সহজ। এগরিচেস তার গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে বলেন, ব্যাপক গবেষনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন পুরুষের প্রাথমিক চাহিদা যেখানে হচ্ছে সম্মান, সেখানে একজন নারীর প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে প্রেম বা ভালোবাসা। স্ত্রী যখন স্বামীকে সম্মান দেয় না এবং স্বামী যখন স্ত্রীকে ভালোবাসে না, তখন তর্কাতর্কির যে নমুনা তাদের মাঝে দৃশ্যমান হয়, সেটাকে তিনি তার ভাষায় '*Crazy Cycle*' বা 'পাগলা চক্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিভাবে এ দুটো একে অপরকে জোরদার করে ও একটা অন্যটার কারণ হিসেবে কাজ করে, সেটার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। অন্য ভাষায়, স্ত্রী যখন স্বামীর মধ্যে ভালোবাসার অভাব বোধ করে, তখন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্ত্রী স্বামীর প্রতি

[২৮] 'প্রেম ও সম্মান: যে প্রেম স্ত্রীর সর্বোচ্চ কামনা এবং যে সম্মান আবশ্যকভাবে স্বামীর প্রাপ্য।'

অসম্মানসূচক আচরণ করে, অসম্মান দেখিয়ে সেটার পাল্টা জবাব দেয়। ফলশ্রুতিতে স্বামী আরও বেশি অনুরাগহীনতা প্রদর্শন করে।

এগরিচেস জোর দিয়ে বলেন, '*Crazy Cycle*' বা 'পাগলা চক্র' -এর সমাধান হচ্ছে: স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অগাধ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার স্বাক্ষর রাখবে। এর অর্থ হলো: স্ত্রীর এমনটি বলা যথাযথ হবে না যে, স্বামী যদি তাকে আগে ভালোবাসে, তবেই সে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কেননা, এমনটি করার মাধ্যমে সে স্বামীর পক্ষ থেকে আরও বেশি অনুরাগহীন আচরণ ডেকে আনছে। অন্যদিকে স্বামীরও এটা বলা উচিত হবে না যে, স্ত্রীকে ভালোবাসার আগে স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাকে সম্মান করা। কেননা, এমনটি করে সে শুধু অসম্মানসূচক আচরণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। দুটোকেই [অর্থাৎ সম্মান ও প্রেমকে] হতে হবে শর্তহীন।

এই বিষয়টি নিয়ে যখন আমি গভীরভাবে চিন্তা করি, তখন উপলব্ধি করি, কুরআন ও নবির হিকমত বা প্রজ্ঞাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত এই দুটো বিষয়ের চেয়ে অন্য কোনো বিষয়কে এতো গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। স্বামীগণের উদ্দেশ্য নবি (ﷺ) বলেন:

"নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো, যেহেতু তারা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট এবং পাঁজরের উপরের অংশই সবচেয়ে বাঁকানো। সোজা করতে গেলে এটা ভেঙে যাবে। আর যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিলে তা বাঁকানোই থেকে যাবে। তাই নারীদের সাথে সদাচারণ করো। [বুখারি ও মুসলিম]

এ ব্যাপারে তিনি (ﷺ) আরও গুরুত্বারোপ করে বলেন:

"সে-ই প্রকৃত ঈমানদার যার আখলাক বা চরিত্র সর্বোত্তম এবং তোমাদের মাঝে সেই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ আচরণ করে।" [আত-তিরমিযি]

নবি (ﷺ) আরও বলেন:

"একজন ঈমানদার স্বামী যেন ঈমানদার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। সে যদি তার চরিত্রের একটি দিক অপছন্দ করে, তবে তার চরিত্রের আরেকটি দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে।" [মুসলিম]

আল্লাহ বলেন: "... তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, হয়তো তোমরা এমন জিনিসই অপছন্দ করছো, যার মধ্যে আল্লাহ বিপুল কল্যাণ রেখেছেন।" (কুরআন, ৪:১৯)

হীরা-জহরত ও মনিমুক্তার চেয়ে মূল্যবান এই প্রজ্ঞা বা হিকমত বাণীতে পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় ও প্রেমময় হতে জোর দেওয়া হয়েছে। তদপুরি প্রেম ও সদয় আচরণ প্রদর্শনের সময় তারা যেন নিজেদের স্ত্রীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপক্ষো করে, সে দিকেও জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

অপরদিকে স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করার সময় মনোযোগের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে। স্বামীর প্রতি সদয় এবং প্রেমময় হতে কেন স্ত্রীদেরকে বারংবার বলা হলো না? সম্ভবত নারীরা স্বভাবগতভাবে অকৃত্রিম প্রেমের অধিকারী হয়ে থাকে বলেই হয়তো এমনটি করা হয়েছে। খুব কম স্বামীই অভিযোগ করে যে, তার স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না। কিন্তু বহু স্বামীরই অভিযোগ যে, তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে সম্মান দেখায় না। আর তাই স্ত্রীদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে এই মানসিকতার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

নানাভাবেই সম্মান দেখানো যায়। কাউকে সম্মান দেখানোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে, তার ইচ্ছাকে সম্মান করা। যখন কেউ বলে, "আমি তোমার পরামর্শকে সম্মান করি" তখন তার এই কথার মর্ম হচ্ছে, "আমি তোমার পরামর্শ মেনে চলি।" কোনো নেতাকে সম্মান করার মানে হচ্ছে, তিনি যা বলেন সেটা করা। আমাদের পিতামাতাকে সম্মান করার তাৎপর্য হচ্ছে, তাদের ইচ্ছা বা মতের বিরুদ্ধে না যাওয়া। আর স্বামীকে সম্মান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বামীর ইচ্ছাকে সম্মান করা। নবি (ﷺ) বলেন:

> "যখন কোনো নারী তার [ওপর ফরয হওয়া] পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, সিয়াম বা রোজা রাখে, নিজের ইজ্জত-আবরুকে সুরক্ষিত রাখে এবং নিজের স্বামীকে মেনে চলে, তাকে বলা হবে: 'জান্নাতে প্রবেশ করো, যে দরজা দিয়ে তোমার মন চায়।'" [আত-তিরমিযি]

কেন আমরা যারা নারী, আমাদেরকে নিজেদের স্বামীর ইচ্ছাকে সম্মান করা এবং সেটাকে মেনে চলতে বলা হলো? এটার কারণ, পুরুষদেরকে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

> আল্লাহ বলেন: "পুরুষেরা নারীদের রক্ষক এবং তাদের তত্ত্বাবধায়ক [কাওয়্যামুন]। কেননা, একজনের চেয়ে অপরজনকে আল্লাহ বেশি [সামর্থ্য] প্রদান করেছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের উপার্জন থেকে খরচ করে ..." (কুরআন, ৪:৩৪)

কিন্তু স্বামীর প্রতি এ ধরনের নিঃশর্ত সম্মান কি একজন নারী হিসেবে আমাদেরকে দুর্বল এবং অধঃস্তন পর্যায়ে নামিয়ে আনে না? আমরা কি নিজেদের এমন অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি না, যেখানে [পুরুষরা] আমাদের এ অবস্থার সুযোগ নেবে এবং আমাদের নিপীড়িন করবে? বাস্তবতা তো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন, নবির আদর্শ, এমনকি সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা ঠিক এর উল্টোটাই প্রমাণ করে। স্ত্রী যত বেশি করে স্বামীকে সম্মান করবে, স্বামী তত বেশি প্রেম ও সদয় আচরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে, স্ত্রী যত বেশি অসম্মান দেখাবে, স্বামী তত বেশি রূঢ় হবে এবং তার আচরণে প্রীতি ভালোবাসা ততই কমতে থাকবে।

একইভাবে, একজন পুরুষ প্রশ্ন করতে পারে, কেন সে স্ত্রীর প্রতি দয়াশীল ও প্রেমময় হবে, যদিওবা ওই স্ত্রীর আচরণ তার প্রতি অসম্মানজনক হয়? এই প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য কেউ উমর ইবনে খাত্তাবের উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। হযরত উমর যখন খলিফা ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। এসে দেখে উমরের স্ত্রীই উমরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছে। ওই লোকটি যখন ফিরে যাবে, ঠিক তখনই উমর তাকে ডেকে আনেন। লোকটি জানায়, উমর তার স্ত্রীর সাথে যে সমস্যায় পড়েছেন, ঠিক তেমন সমস্যা নিয়েই সে উমরের কাছে হাজির হয়েছে। এটা শুনে উমর বলেন, তার স্ত্রীকে তাকে সহ্য করে, তার জামা কাপড় ধুয়ে দেয়, তার বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে, তাকে আরাম ও সুখ দেয় এবং তার সন্তানদের লালন পালন করে। সে যদি তার জন্য এতো কিছু করতে পারে, তবে যখন সে তার গলার স্বর উঁচু করে, তখন সেটা কেন সহ্য করা যাবে না?

কেবল পুরুষ নয়, বরং আমাদের সকলের জন্যই এই ঘটনাতে চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের মতো গুণাবলি, যেগুলো একটি সফল বিবাহের পূর্ব শর্ত, সেগুলোরই অমূল্য চিত্রায়ন হয়েছে এই ঘটনায়। উপরন্তু, ধৈর্যধারণকারীর জন্য আখিরাতে যে ধরনের প্রতিদানের ব্যবস্থা আছে, সেটাও একবার বিবেচনা করুন। আল্লাহ বলেন, "যারা ধৈর্য ধারণ করে, তারা বেহিসাব (অগণিত) পুরস্কার লাভ করবে।" (কুরআন, ৩৯:১০)

কষ্ট ও দুর্ভোগ

নিজেদের কষ্ট ও দুর্ভোগ দূর করতে আমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলি, কিন্তু আমরা কখনোই বিবেচনা করে দেখি না যে, আমাদের কষ্টগুলো আসলে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করছে।

ঝড়ের মাঝে একমাত্র আশ্রয়

ঝড় যখন আসে, তখন দাঁড়িয়ে থাকাটা কখনোই সহজ হয় না। বৃষ্টি শুরুর ক্ষণিক পরেই বিজলী চমকাতে থাকে। আঁধার কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে দেয় এবং এক সময়ের শান্ত সমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গ হঠাৎ করেই আপনাকে ঘিরে ধরে। কোনোভাবেই আর নিজের পথ আপনি তখন খুঁজে না পেয়ে সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়ে দেন।

কোস্ট গার্ডকে দিয়েই আপনি শুরু করেন। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। আপনি নৌকাকে অন্যত্র নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আপনি লাইফবোট খুঁজতে থাকেন, কিন্তু সেটার কোনো পাত্তা নেই। এই পরিস্থিতিতে আপনি হন্যে হয়ে লাইফ জ্যাকেটের সন্ধান করেন। কিন্তু হায়, সেটাও ছেঁড়া। একটা উপায় খুঁজতে খুঁজতে যখন আপনি আপনার সামর্থের সবটুকু নিঃশেষ করে ফেলেন, ঠিক তখনই আপনি আসমানের দিকে দৃষ্টি ফেরান।

আর আল্লাহকে ডাকেন।

যাইহোক, ওই মুহূর্তের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য আছে, যা সম্পূর্ণরূপে অনন্য। এই পরিস্থিতিতে আপনি এমন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অন্য সময় যেটা আপনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। হ্যাঁ, ওই মুহূর্তে আপনি প্রকৃত তাওহিদের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। লাভ করেন প্রকৃত একত্ববাদের স্বাদ। লক্ষ্য করুন, তীরে থাকা অবস্থায় আপনি হয়তো আল্লাহকেই ডাকতেন, কিন্তু আপনি আরও অনেকের সাথে সাথে তাঁকে ডাকতেন। আপনি হয়তো আল্লাহর ওপর নির্ভর করতেন, কিন্তু আরও অনেক কিছুর সাথে সাথে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এই একটি মুহূর্তে সবকিছুই বন্ধ। হ্যাঁ, সবকিছু। ডাকার মতো তো আর কেউ নেই। নির্ভর করার মতো কিছুই বাকি নেই। [হ্যাঁ], শুধু তিনিই রয়ে গেছেন।

আর এটাই হচ্ছে মূল বিষয়।

আপনি কি কখনো এটা ভেবে অবাক হয়েছেন যে, আপনার সব থেকে প্রয়োজনের সময়ে সৃষ্টির যে যে দুয়ারে সাহায্যের জন্য আপনি পা বাড়ান, সেগুলো বন্ধ থাকে কেন? আপনি এক দুয়ারে কড়া নাড়েন, কিন্তু সেটা সজোড়ে বন্ধ করে

দেওয়া হয়। আরেক দুয়ারে যান। সেটাও বন্ধ। আপনি এক দুয়ার থেকে আরেক দুয়ারে যান, কড়া নাড়তে থাকেন, আর প্রত্যেক দুয়ারে আঘাত করতে থাকেন, কিন্তু কিছুই খুলে না। এমনকি যে যেসব দুয়ারের ওপর আপনি এক সময় নির্ভর করতেন, আচমকাই সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কেন? কেন এমনটি ঘটে?

খেয়াল করুন, মানুষ হিসেবে আমাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আল্লাহ যেগুলো ভালো করেই জানেন। আমরা সর্বদাই চাহিদার একটি অবস্থাতে থাকি। আমরা দুর্বল। কিন্তু একইসাথে আমরা তাড়াহুড়ো প্রবণ ও অধৈর্য। যখন আমরা বিপদে থাকি, তখন আমরা সাহায্য তালাশের জন্য এক প্রকার বাধ্য হই। এটাই [তাঁর সৃষ্ট] নকশা [বা ডিজাইন]। দিন যখন রোদেলা, আর আবহাওয়া যখন মনোরম, তখন আমরা আশ্রয় খুঁজতে যাবো কেন? কখন আমরা আশ্রয় খুঁজি? যখন ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, কেবল তখনই আমরা আশ্রয় খুঁজি। তাই আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তায়ালা* (মহিমান্বিত তিনি) ঝড় বইয়ে দেন, এমন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি প্রয়োজন তৈরি করেন, যাতে করে আমরা আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হই।

যখন আমরা সাহায্য তালাশ করি, তখন আমাদের মধ্যস্থিত অধৈর্য বৈশিষ্ট্যের জন্য যা নিকটে আর যেটা সহজ মনে হয়, তার থেকেই আমরা সাহায্য চাই। যা দেখতে পাই, শুনতে ও ছুঁতে পারি, সেটার কাছেই আমরা সাহায্য চাই। আমরা সোজা পথ খুঁজি। সৃষ্টির কাছে আমরা সাহায্য খুঁজি। এমনকি নিজ সত্তার কাছেও আমরা সাহায্য চাই। সবচেয়ে নিকটবর্তী যেটা, সাহায্যের জন্য আমরা সেটাই খুঁজি। দুনিয়া (তথা পার্থিব জীবন) বলতে কি ঠিক এটাই বুঝায় না? যা কাছের মনে হয় [সেটাই কি দুনিয়া নয়?]। 'দুনিয়া' শব্দটির মানে: 'যা নিচু'। যা সব থেকে কাছের মনে হয়, সেটাই দুনিয়া। কিন্তু এটা এক মোহ বা ভ্রম মাত্র।

কিন্তু এটার থেকে নিকটবর্তী কিছু আছে।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন তো, কোন জিনিসটি আপনার সবচেয়ে নিকটে আছে। যদি এই প্রশ্নটি করা হয়, তবে অনেকেই হয়তো বলবেন, আমাদের অন্তর ও সত্তাই সবচেয়ে নিকটবর্তী।

কিন্তু আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

"আমরাই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং [মানুষ] তার নফস (তথা মনের মাঝে) যে কুচিন্তা করে, তা আমরা জানি। কেননা, তার গ্রীবাস্থ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ধমনীর চেয়েও আমরা অধিক নিকটবর্তী।"

(কুরআন, ৫০:১৬)

এই আয়াতটি আল্লাহ (ﷻ) শুরু করেছেন এটা দেখিয়ে যে, তিনি আমাদের চেষ্টা ও সাধনাগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন। কেউ আমাদের চেষ্টা ও সাধনাগুলোর খবর রাখেন, সেটা স্বস্তির এক সংবাদ। নিজ সত্তা আমাদেরকে কি বলে, তিনি সেটা জানেন। তিনি আমাদের গ্রীবাস্থ ধমনীর চেয়েও নিকটে। গ্রীবাস্থ ধমনী কেন? আমাদের [দেহের] ওই অঙ্গে কি এমন আকর্ষণীয় জিনিস আছে, [যার জন্য এটার উল্লেখ হয়েছে]? গ্রীবাস্থ ধমনী ওই মহাগুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেটা হৃদয়ে রক্ত সরবরাহ করে। এটা যদি কেটে যায়, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা মারা যাবো। আক্ষরিকভাবে এটা আমাদের জীবন। কিন্তু আল্লাহ (ﷻ) নিকটে অবস্থান করেন। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জীবন, আমাদের নিজ সত্তা এবং আমাদের নিজ নফস থেকেও অধিক নিকটে অবস্থান করেন। আমাদের হৃদয়ের মহাগুরুত্বপূর্ণ গতিপথ থেকেও তিনি অধিক নিকটবর্তী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে ওই কাজের দিকে আহ্বান করেন, যেটা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখো আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান করেন। বস্তুত তাঁর কাছেই তোমরা সকলে সমবেত হবে।"

(কুরআন, ৮:২৪)

আল্লাহ (ﷻ) জানেন, আমাদের নফস রয়েছে। আল্লাহ জানেন, আমাদের হৃদয় রয়েছে। এই জিনিসগুলো যে আমাদেরকে চালিত করে, আল্লাহ তা জানেন। তা সত্ত্বেও, আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব থেকেও তিনি আমাদের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং, যখন আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ছুটি, তখন আমরা কেবল দুর্বলের কাছে যাই না, বরং সেইসাথে যিনি সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করেন, তাঁকে উপেক্ষা করে, যা দূরে এবং বহুদূরে অবস্থান করে, তার কাছে ছুটে যাই। *সুবহান আল্লাহ* (সমস্ত মহিমা আল্লাহর)।

এটাই যেহেতু আমাদের প্রকৃতি এবং আল্লাহ (ﷻ) ভালোভাবেই তা জানেন, তাই ঝড়ের সময় আশ্রয় লাভের অন্য সকল দরজা বন্ধ করে, তিনি আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে [তাঁর অভিমুখে] পুনরায় চালিত করেন। প্রতিটি মিথ্যা দুয়ারের পেছনে রয়েছে এক একটি গহ্বর, এটা তিনি জানেন। সেখানে পা দিলে, আমাদের পতন নিশ্চিত। তাঁর অপার করুণা ও রহমতের বলে তিনি ওই মিথ্যা দুয়ারগুলো বন্ধ করে রাখেন।

তাঁর অপার করুণার বলে, তিনিই ঝড় বইয়ে দেন, যাতে করে আমরা সাহায্য তালাশ করি। আর তিনি জানেন আমরা ভুল জায়গাতে পা দেবো, তাই তিনি আমাদের বহু নির্বাচনী পরীক্ষা নেন, যাতে কেবল একটি উত্তর বাছাইয়ের সুযোগ থাকে এবং ওটাই সঠিক উত্তর। এই যে কষ্ট, সেটা আসলে আরামের [জন্য]। তাই আঁকড়ে ধরার সকল হাতল এবং অন্য সব উত্তরকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পরীক্ষাকে একেবারে সহজ করে দেন।

ঝড় যখন আসে, তখন দাঁড়িয়ে থাকাটা কখনোই সহজ হয় না। এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে তিনি আমাদেরকে নিজেদের হাঁটুর ওপর নামিয়ে আনেন এবং [আল্লাহর কাছে] প্রার্থনা জানানোর এটাই সর্বোত্তম ভঙ্গি।

জান্নাতে নিজের ঘরখানি দেখাঃ আল্লাহর সাহায্য কামনা প্রসঙ্গে

আমি একটা গল্প জানি, যা নেহাত কোনো গল্প নয়। এমন এক নারীর গল্প এটা, যিনি এই জীবনের চাকচিক্য থেকে অন্য কিছুকে অনেক বেশি ভালোবেসেছিলেন। নিজেকে যিনি তার চারপাশের কষ্টকর পরিস্থিতি দ্বারা কখনো সংজ্ঞায়িত বা সীমাবদ্ধ হতে দেননি। নিজের মাঝে তার এমন প্রগাঢ় ঈমান লালন করেছিলেন, যার জন্য তিনি হাসিমুখে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে নিতে রাজি ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাণী, তথাপি তিনি এই দুনিয়ার সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের মোহ ভেদ করে এর সত্যিকার বাস্তবতা দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুনিয়ার এই রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন আখিরাতে তার জন্য [নির্মিত] রাজপ্রাসাদের দিকে। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার[১১] জন্য এটা অন্তর্চক্ষুর কোনো রূপক চাহনি ছিল না। বরং আসিয়ার জন্য ছিল এটা তার চর্ম চক্ষের দৃষ্টির মতোই বাস্তব।

আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তায়ালা* (মহিমান্বিত তিনি) বলেনঃ

> "ফেরাউনের স্ত্রীর মাঝে আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য একটি উপমা রেখেছেন, যে বলেছিলঃ 'হে আমার প্রতিপালক, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং ফেরাউন ও তার কর্মকাণ্ড থেকে আমাকে পরিত্রাণ দেন এবং আমাকে জালিম লোকদের থেকে রক্ষা করুন।'" (কুরআন, ৬৬:১১)

[১১] কুর'আনের বর্ণনা মোতাবেক আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন। যখন শিশু মুসা (*আলাইহিস সালাম*)-কে সিন্দুকে করে তার মা নীল নদীতে ভাসিয়ে দেন, তখন ওই সিন্দুক ফেরাউনের রাজ দরবারের ঘাটে থামে, তখন আসিয়া ওই সিন্দুক থেকে শিশু মুসাকে নিজ দায়িত্বে নেন এবং তার স্বামী ফেরাউনকে রাজি করিয়ে শিশু মুসাকে লালন-পালন করতে থাকেন।

পরবর্তীতে ফেরাউনের দরবারে নবি মুসা (*আলাইহিস সালাম*) যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন, তখন তিনি নবি মুসার প্রতি ঈমান আনেন। ঈমান আনায়নের পর ফেরাউন তার প্রতি নির্যাতনের স্টিম রোলার চালালেও তিনি স্বীয় ঈমানে অটল থাকেন এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। -(সম্পাদক)।

আসিয়ার এই কাহিনী আমি বহুবার শুনেছি। আমাকে প্রতিবারই এটা নাড়া দেয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে আসিয়ার এই কাহিনী আমাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি কারণে দারুনভাবে নাড়া দেয়। কয়েক মাস আগে আমি কঠিন এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুণ্যবান ও ফেরেশতা স্বভাবে আত্মাদের সাহায্যের মাধুর্য সত্যই অমূল্য। যখন আপনি কঠিন সময় পার করবেন, তখন একটি টেক্সট মেসেজ (*Text message*), ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস আপডেট, সুহাইব ওয়েব লিস্টারেভের (*Suhaib Webb Listserv*)[৩০] কাছে একটি ইমেইল পাঠানো [আপনার জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে] এবং দেখবেন পুণ্যবান আত্মার এক বাহিনী আপনার জন্য দু'আ করা আরম্ভ করে দিয়েছে। *সুবহানাল্লাহ* (মহিমা শুধু তাঁরই)।

আমি তাই এই অনুরোধটা করি। একজন মানুষ আরেকজনকে সর্বোত্তম যে উপহারটা দিতে পারে, আমি সেটারই অনুরোধ করি। আমি [তাদের কাছে] আন্তরিক দু'আ কামনা করি। আমি যা লাভ করি, তা ছিল অভিভূত করারই মতো। আল্লাহর ওই উপহারের কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমি এমনসব লোকের দেখা পেয়েছি, যারা কিয়াম (তথা রাতের সলাতে) দাঁড়িয়ে আমার জন্য দু'আ করেছে, যারা কাবার সামনে দাঁড়িয়ে আমার জন্য দু'আ করেছে। ভ্রমণরত অবস্থায়, এমনকি সন্তান জন্মদানের সময়ও [তারা আমার জন্য দু'আ করেছে]। এতো এতো দু'আ পাওয়ার পরও একটি দু'আ মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এটা সাধারণ একটা টেক্সট মেসেজ ছিল, যাতে লেখা ছিল: 'জান্নাতে আপনার বাড়ি আপনাকে দেখানো হোক, যাতে করে যেকোনো কষ্ট আপনার জন্য সহজ হয়ে যায়।" আমি এটা পাঠ করি এবং এটা আমায় নাড়া দেয়। হ্যাঁ, এটা আমাকে দারুনভাবে নাড়া দেয়।

ঠিক তখনই আসিয়ার কাহিনী আমার স্মরণে আসে, আর হঠাৎ করে বিস্ময়কর কিছু আমার মনে দোলা দেয়। বস্তুত একজন মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, আসিয়া ঠিক সেরূপ ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুনিয়ার বুকে বিচরণকারী জঘন্যতম স্বৈরাচার ছিল ফেরাউন। আসিয়ার জন্য সে কেবল তার শাসক মাত্র ছিল না, সে ছিল তার স্বামী। আর আসিয়ার শেষ সময়ে ফেরাউন তার ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাতে শুরু করে। কিন্তু অবাক করা কিছু একটা ঘটে। আসিয়া মুচকি হাসতে থাকেন। একজন মানুষ যতটুকু কল্পনা করতে পারে, আসিয়া সে রকম ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্য দিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল।

[৩০] ১৯৭২ সালে জন্ম নেয়া সুহাইব ওয়েব ১৯৯২ সালে ইসলামে দীক্ষিত হন। মিসরের আল-আযহারে তিনি উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন ইমাম ও বেশ জনপ্রিয় বক্তা। –(সম্পাদক)।

এটা কিভাবে সম্ভব? কঠিন নির্যাতনের সময় কিভাবে তিনি হাসতে পারছিলেন? অথচ যখন আমরা সামান্য ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ি কিংবা আমাদের দিকে কেউ যদি বাজেভাবে তাকায়, তখন আমরা তা সামলাতে পারি না। নবি ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*) –আল্লাহ তার প্রতি সলাত এবং সালাম বর্ষণ করুন– তিনি কঠিনতম বিপদে নিপতিত হন, আর তা সত্ত্বেও আগুন তার কাছে ঠাণ্ডা অনুভূত হলো? কিছু লোকের কিছু না থাকার পরও, তারা অভিযোগ উত্থাপনের কোনো কারণ খুঁজে পায় না, অন্যদিকে যাদের 'সবকিছু' থাকার পরও, অভিযোগ ছাড়া তাদের থেকে কিছুই শোনা যায় না, কেন এমনটি ঘটে? কখনো আমরা জীবনের বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেশ ধৈর্য ধারণ করি, অথচ আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলোতে খুব একটা ধৈর্য ধরতে পারি না, কিভাবে এমনটি ঘটে?

বিপদ-মুসিবতকে আমি কঠিন মনে করতাম। কেননা, কিছু জিনিস বহন করাটা বাস্তবিকই কঠিন। আমি একটি মৌলিক তালিকার কথা চিন্তা করতাম, যেখানে বিপদ-আপদের একটি আদর্শক্রম থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রিয়জন হারানোর বেদনা সব সময় ট্রাফিকের টিকিট সংগ্রহ করার ঝামেলা থেকে কঠিনতর। এটাই যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়। এটিই আমাদের কাছে যথাযথ মনে হয়।

কিন্তু, বাস্তবে এটা ঠিক নয়।

যেকোনো ধরনের বিপদ সহ্য করাটা কঠিন কাজ নয়, যেহেতু স্বয়ং বিপদই কঠিন। বিপদের সময় কষ্ট কতটা কঠিন কিংবা কতটা সহজ, সেটার মাপার মানদণ্ড আছে –অদৃশ্য এক মানদণ্ড। জীবনে আমি যা কিছুরই মুখোমুখি হই না কেন, সেটা সহজ হবে নাকি কঠিন হবে, তা ওই বিষয়টির কঠিন বা সহজ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। বরং বিষয়টি সহজ হবে নাকি কঠিন হবে, তা নির্ভর করে আল্লাহর সাহায্যের মাত্রা ও স্তরের ওপর। কোনো কিছুই সহজ না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার জন্য সেটা সহজ না বানাচ্ছেন। না কোনো ট্রাফিক জ্যাম, না কোনো কাগজের টুকরো, [কিছুই সহজ নয়]। আল্লাহ যা আমার জন্য সহজ করে দেন, তার কিছুই কঠিন নয়। না অসুস্থতা, না মৃত্যু, না আগুনে ফেলে দেওয়া, আর না স্বৈরাচারের যুলুমের শিকার হওয়া, [কিছুই আমার জন্য কঠিন হবে না]।

ইবনে আতায়িল্লাহ আল-সিকান্দারি খুব সুন্দর করে বলেনঃ

"কিছুই কঠিন নয়, যদি তুমি সেটা তোমার প্রতিপালকের মাধ্যমে চাও। কিছুই সহজ নয়, যদি তুমি সেটা চাও তোমার যোগ্যতায়।"

ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-কে আগুনে ফেলা হয়। আল্লাহ এই জীবনে আমাদের কাউকে এমন ভয়াবহ পরীক্ষার মুখোমুখি না করুন। কিন্তু এমন কোনো মানুষ নেই, যারা তাদের জীবনে কোনো না কোনোভাবে আবেগ, মানসিক বা সামাজিক আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন। আর এটা ভাববেন না যে, আল্লাহ আমাদের জন্য ওইসব আগুনকে ঠাণ্ডা করতে অক্ষম। আসিয়া শারীরিকভাবে নির্যাতিত ছিলেন, কিন্তু জান্নাতে তার জন্য নির্মিত বাড়ি আল্লাহ তাকে দেখিয়ে দেন। তাই তিনি হেসে দেন। আমাদের চর্ম চক্ষু এই জীবনে জান্নাতের দেখা পাবে না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে, স্রষ্টার সান্নিধ্যে নির্মিত বাড়ির ওই দৃশ্য অন্তরের দৃষ্টিকে দেখানো যায়, যাতে করে প্রতিটি কষ্ট হয়ে যায় সহজ। হয়তো আমরাও ওই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে হাসতে পারবো।

তাই স্বয়ং পরীক্ষাটা সমস্যা নয়। না ক্ষুধা, আর না শীত। বরং ক্ষুধা ও শীত মোকাবেলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমাদের আছে কিনা, সেটাই আসল সমস্যা। যদি থেকে থাকে, তবে না ক্ষুধা, আর না শীত আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে। এগুলো আমাদেরকে কষ্ট দেবে না। সমস্যা তখনই আবির্ভূত হয়, যখন ক্ষুধা আসে, তখন যদি খাবার না থাকে। সমস্যা তখনই আসে, যখন তুষার ঝড়ে চারদিক নুয়ে পড়ে, তখন যদি কোথাও আশ্রয় পাওয়া না যায়।

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চান, বানাতে চান আমাদেরকে বলীয়ান এবং তিনি চান, আমরা যেন তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, ওইসব ক্ষুধা, পিপাসা ও শীত পাঠানোর সাথে সাথে আল্লাহ খাবার, পানি এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করে থাকেন। আল্লাহই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, কিন্তু এটার সাথে তিনি পাঠাতে পারেন *সবর* (ধৈর্য), এমনকি উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি এটার সাথে পাঠাতে পারেন *রিদা* (তথা তুষ্টির) মতো গুণকে। হ্যাঁ, আল্লাহ (ﷻ)-ই আদমকে এই দুনিয়াতে নামিয়ে দেন, যেখানে তাকে চেষ্টা, সংগ্রাম করতে হবে এবং তাকে মুখোমুখি হতে হবে পরীক্ষার। কিন্তু সেইসাথে তিনি তার ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কুরআন আমাদেরকে বলে:

> "তিনি বলেন (অর্থাৎ আল্লাহ বলেন), 'জান্নাত থেকে নেমে যাও –সবাই, তোমরা একে অপরের দুশমন। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত আসবে, –যারাই সেটার (অর্থাৎ আমার হেদায়েতকে) অনুসরণ করবে, না তারা (এই দুনিয়াতে) গোমরাহ হবে, আর না তারা (আখিরাতে) কষ্ট ভোগ করবে।"(কুরআন, ২০:১২৩)

নবি (ﷺ) তায়েফের প্রান্তরে যে দু'আ করেছেন, সম্ভবত সেটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় দু'আ। রক্তাক্ত ও আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি আপন প্রতিপালককে ডাকেন:

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"আমি তোমার চেহারার দীপ্তির মাঝে আশ্রয় চাচ্ছি, যে দীপ্তিতে বিদায় নেয় আঁধার এবং এই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি বিষয় লাভ করে পূর্ণতা।"

বস্তুত আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে পরীক্ষা করেন এবং ওই ব্যক্তির ঈমানের স্তরের অনুপাতে তিনি সে পরীক্ষা নেন। কিন্তু সেইসাথে আল্লাহ তাঁর ঐশ্বরিক সহায়তাও পাঠিয়ে থাকেন, যেকোনো পরীক্ষাকে যেটা বানিয়ে দেয় সহজ এবং যেকোনো আগুনকে যেটা আরামদায়ক শীতল করে দেয়। আর এভাবেই শীঘ্রই তিনি পাঠাতে পারেন স্বীয় ঐশ্বরিক মদদ, যেটার বলে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মাঝেও আমরা তাঁর আলোর ঝলকে হবো ধন্য এবং তাঁর সান্নিধ্যে জান্নাতে নির্মিত বাড়ি করবে আমাদেরকে হাস্যোজ্জ্বল।

অন্যের দ্বারা পাওয়া আঘাতঃ কিভাবে মানাবেন ও সারাবেন

আমি যখন বেড়ে উঠছিলাম, বিশ্ব তখন এক যথার্থ অবস্থানে ছিল। তবে একমাত্র সমস্যা ছিল, আসলে কিন্তু তা সে রকমটা ছিল না। আমি বিশ্বাস করতাম, সব কিছুই সর্বদা "ন্যায্যতার" ভিত্তিতে হবে। আমার কাছে এটার মর্ম ছিল, কারো প্রতি কোনো রকম অন্যায় করা হবে না এবং যদিবা করা হয়, তবে তিনি ন্যায়বিচার লাভ করবেন। আমার বিশ্বাস মোতাবেক বিষয়াদি হওয়ার জন্য আমি কঠিন লড়াই করেছি। তদপুরি, আমার সংগ্রামে আমি এই জীবনের একটি মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করে গেছি। আমার শিশুসুলভ আদর্শবাদে আমি এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি যে, এই দুনিয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্পূর্ণ। মানুষ হিসেবে আমরাও স্বাভাবিকভাবে অসম্পূর্ণ। তাই আমরা সর্বদা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি। আর ওইসব বিশৃঙ্খলাতে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা অনিবার্যভাবে অন্যকে আঘাত দিয়ে থাকি। এই দুনিয়া তাই সব সময় ন্যায্য হবে না।

এর মানে কি এই নয় যে, আমরা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামিয়ে দেবো বা সত্যকে পরিত্যাগ করবো? অবশ্যই না, বরং এটার অর্থ হচ্ছেঃ এই দুনিয়া –এবং অন্য কিছুকে– আমরা অবাস্তব মানদণ্ডের ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো না। কিন্তু সেটা সব সময় সহজ নয়। এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতিময় এক দুনিয়াতে কিভাবে আমরা বাস করবো, যেখানে লোকজন আমাদেরকে হতাশ করে, এমনকি আমাদের নিজেদের পরিবারও আমাদের হৃদয় ভেঙে চুরমার করে? এবং সম্ভবত, সবচেয়ে কঠিনতম বিষয় হলোঃ কিভাবে আমাদের প্রতি অন্যায় করা সত্ত্বেও আমরা ক্ষমা করবো? আর কঠোর না হয়েও কিভাবে আমরা শক্তিশালী হবো, অন্যদিকে দুর্বল না হয়েও কিভাবে নরম থাকবো? কখন আমরা আঁকড়ে ধরবো, আর কখন আমরা ছেড়ে দেবো? মাত্রাতিরিক্ত যত্ন, তদারকি কখন তার মাত্রা ছাড়ায়? আমাদের যতটুকু ভালাবাসা উচিত, তার থেকে বেশি ভালোবাসা বলে কিছু আছে কি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার আগে, সবার আগে আমাদেরকে নিজেদের গতানুগতিক জীবনের বাইরে পা রাখতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে, কষ্ট পাওয়া বা অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষ আমরাই প্রথম না আমরাই শেষ। আমাদের পূর্বে যারা দুনিয়াতে পা রেখেছেন, তাদের সংগ্রাম এবং তাদের সাফল্যগুলো অধ্যয়ন করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কষ্ট ছাড়া কখনো সমৃদ্ধি আসে না এবং সাফল্য কেবল আপ্রাণ চেষ্টারই ফসল, আমাদেরকে এটার স্বীকৃতি দিতেই হবে। আর ওই সংগ্রামে সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকে, অন্যের দেওয়া আঘাত প্রতিরোধ ও তা উতরে ওঠা।

আমাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ যে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, আমাদের নবিগণের দীপ্তিময় উদাহরণসমূহের স্মৃতিচারণ আমাদেরকে সেটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করুন, নবি নুহ (আলাইহিস *সালাম*) স্বীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা ৯৫০ বছর নির্যাতিত হয়েছেন। কুরআন আমাদেরকে বলে:

> "তাদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়ও (তাদের রসুলকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা আমাদের বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'সে তো এক বিকারগ্রস্থ!' এবং তাঁকে বের করে দেওয়া হয়।" (কুরআন, ৫৪:৯)

নুহ এতোটই আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন যে, শেষমেশ তিনি স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেন:

> "আমি তো অসহায়, এখন আপনি (আমাকে) সাহায্য করুন।"
> (কুরআন, ৫৪:১০)

অথবা আমরা স্মরণ করতে পারি, কিভাবে নবি (ﷺ)-এর ওপর যে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল এবং রক্তাক্ত হওয়া পর্যন্ত এই বর্ষণ অব্যাহত ছিল এবং [আমরা স্মরণ করতে পারি] কিভাবে সাহাবিগণকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং কিভাবে তাদেরকে অনাহারে রাখা হয়েছিল। এসবই ছিল অন্যের হাতে নির্যাতনের নমুনা। এমনকি আমাদের সৃষ্টি হওয়ার আগেই ফেরেশতারা পর্যন্ত মানুষের এই প্রকৃতিকে ঠিক উপলব্ধি করেছিল। আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি ফেরেশতাদেরকে জানান, তখন তাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল মানুষের এই সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকটির ব্যাপারে। আল্লাহ আমাদেরকে বলেন:

> "স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেন: 'আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।' তখন তারা বলে, 'আপনি কি এমন কাউকে সেখানে পাঠাতে যাচ্ছেন, যে কিনা সেখানে ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?" (কুরআন, ২:৩০)

একে অপরের প্রতি জঘন্য পর্যায়ের অন্যায় করার যে সম্ভাবনা মানুষের আছে, সেটাই এই জীবনের দুঃখজনক বাস্তবতা। এবং এরপরেও আমাদের অনেকেই বেশ আশীর্বাদপুষ্ট। আমাদের অনেকেই এমন ধরনের বিপদের মুখোমুখি হয়নি, যা অন্যরা সারা জীবন জুড়ে ভোগ করেছে। আমাদের চোখের সামনে আমাদের পরিবারকে নির্যাতন করা হচ্ছে কিংবা তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এমন দৃশ্য আমাদের অনেককেই দেখতে হবে না। তদপুরি, আমাদের মাঝে খুব কম লোকই বলতে পারবে যে, কোনো না কোনোভাবে অন্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া কিংবা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরবাড়ি ধ্বংস করার দৃশ্য দেখার যে অনুভূতি, আমাদের অনেককে কখনোই সেটা ভোগ করতে হবে না, তথাপি আহত হৃদয়ের কান্নার অনুভূতি কেমন, আমাদের অনেকেই সেটা জানে।

এগুলো এড়ানো কি সম্ভব? আমার মতে, হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো এড়ানো সম্ভব। সকল ধরনের কষ্ট ও ভোগান্তিকে আমরা কখনো এড়িয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের মনোযোগের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে আমরা বড় ধরনের বিপর্যয়কে প্রতিহত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সকল আস্থা, নির্ভরতা ও প্রত্যাশা অপর একজন মানুষের স্থাপন করাটা হবে অবাস্তব ধর্মী ও নিরেট বোকামিতুল্য কাজ। মানুষ মাত্রই ভুল করে, এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের জন্য কাম্য হবে নিজেদের আস্থা, নির্ভরতা ও প্রত্যাশাকে শুধু আল্লাহর ওপর স্থাপন করা। আল্লাহ বলেন:

> "... যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ভাঙ্গে না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ।" (কুরআন, ২:২৫৬)

এটা জানা যে, আল্লাহই হলেন একমাত্র হাতল, যা কখনো ভেঙে যাবে না, তিনিই আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করবেন।

তদপুরি, একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভালোবাসতে পারবো না, কিংবা আমাদের ভালোবাসা কমানো উচিত। আমরা কিভাবে ভালোবাসি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ ছাড়া কিছুই যেন আমাদের ভালোবাসার চূড়ান্ত বস্তু না হয়। কিছুই যেন আমাদের অন্তরে আল্লাহর আগে চলে না আসে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান যেন ওই পর্যায়ে না পৌঁছায়, যেখানে ওই বস্তু ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন 'ভালোবাসা'

আসলে ভালোবাসা নয়, বরং এ ধরনের ভালোবাসাই ইবাদত এবং কষ্ট ছাড়া এটা অন্য কিছুই সৃষ্টি করে না।

কিন্তু যখন আমরা উল্লেখিত সবকিছুই ঠিকঠাক মতো করি, তথাপি অন্যের দ্বারা আমরা আঘাত পাই – আর বাস্তবে অপরিহার্যভাবে এ রকমটাই ঘটে থাকে, তখনকার ব্যাপারটা কি? যেটা সব থেকে কঠিন, কিভাবে আমরা সেটা করবো? কিভাবে আমরা ক্ষমা করতে শিখবো? কিভাবে আমরা নিজেদের ক্ষত চিহ্ন মুছে দিয়ে মানুষের প্রতি সদয় হতে শিখবো, যদিও ওই মানুষগুলো আমাদের প্রতি সদয় নয়?

আবু বকর *রাদিয়াল্লাহু আনহু* (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর ঘটনাতে ঠিক এটারই এক অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার কন্যা আয়েশা (রা.)-এর প্রতি সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপভাবে অপবাদ আরোপ করা হয়। আবু বকর (রা.) লক্ষ্য করেন যে, এই গুজব রটানোর পেছনে তার খালাতো ভাই মিসতাহ জড়িত ছিলেন, যাকে তিনি এতদিন আর্থিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আবু বকর ওই অপবাদ রটনাকারীকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। এর ঠিক পরপরই আল্লাহ নিচের আয়াতটি নাযিল করেন:

> "তোমাদের মাঝে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এই কসম খেয়ে না বসে যে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবী ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীগণকে কোনো সাহায্য করবে না। [বরং] তাদেরকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করো। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? বস্তুত আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (কুরআন, ২৪:২২)

এই আয়াত শ্রবণের পর আবু বকর (রা.) ঠিক করে ফেলেন যে, তিনি আল্লাহর ক্ষমা চান, তাই তিনি ওই লোককে অর্থ দেওয়া আবার চালুই করেননি, বরং সেটার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন।

এ ধরনের ক্ষমার গুণ একজন ঈমানদার ব্যক্তির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ঈমানদারদের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

> "যারা বড় ধরনের অপরাধ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে এবং যারা রাগান্বিত অবস্থাতেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকে।" (কুরআন, ৪২:৩৭)

অন্যের প্রতি আমরা যে ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি করি, সেই সচেতনতা বোধই যেন সানন্দে ক্ষমা করতে আমাদের ধাবিত করে। সর্বোপরি আমাদের মানবতা এই বাস্তবতা দ্বারা চালিত হওয়া উচিত যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে নানবিধ পাপের কাজ করে আমরা আল্লাহর সাথে অন্যায় করি। আল্লাহর তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায়? তা সত্ত্বেও আল্লাহ, যিনি মহাবিশ্বের মালিক, তিনি প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাতে [আমাদেরকে] কেবল ক্ষমাই করে যান। ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানানোর আমরা কে? আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, এই আশা যদি করি, তবে আমরা কেন অন্যদেরকে ক্ষমা করতে পারবো না? এই কারণে নবি (ﷺ) আমাদেরকে এভাবে শিক্ষা দেন:

> "অন্যের প্রতি যারা দয়া দেখায় না, আল্লাহও তাদের প্রতি কোনো দয়া দেখাবেন না।" [মুসলিম]

আল্লাহর এই দয়া লাভের আশা যেন আমাদেরকে অন্যকে ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এটা যেন আমাদেরকে একদিন এমন দুনিয়াতে প্রবেশ করায়, যেটা সত্যিকার অর্থেই নিখুঁত ও যথার্থ।

দুনিয়ার জীবন যেন এক স্বপ্ন

এটা কেবলই একটা স্বপ্ন ছিল। ক্ষণিক কালের জন্য এটা আমাকে আচ্ছন্ন করে। তথাপি ওই দুঃস্বপ্নে আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করি, সেটা এক বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাও সেটা ক্ষণস্থায়ী। চোখের পলক ফেলার মতো। কিন্তু আমি কেন স্বপ্ন দেখি? আমাকেই বা কেন আমার ঘুমের মাঝে ওই ধরনের ক্ষয়, ভয় ও দুঃখের অনুভূতি অনুভব করতে হবে?

বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এটা এমনই এক প্রশ্ন, যা যুগ যুগে জিজ্ঞাসিত হয়ে আসছে। আর অনেকের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর তার ঈমানের দিকে পথচলা কিংবা সেখান থেকে বিচ্যুতি নির্ধারণ করেছে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, জীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস, উচ্চতর ব্যবস্থা বা চূড়ান্ত গন্তব্যে বিশ্বাস রাখা অনেক সময়ই এসব বিষয় নির্ভর করে কেবল এই একটি প্রশ্নের জবাবের ওপর। তাই এই প্রশ্ন করার অর্থ হলোঃ চূড়ান্ত বিচারে জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা।

কেন আমরা কষ্ট ভোগ করি? ভালো লোকদের সাথেই কেন খারাপটি ঘটে? স্রষ্টা যদি থেকেই থাকে, তবে শিশুরা কেন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাবে, আর অপরাধীরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে? সর্বপ্রেমময় এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একক স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কিভাবে সম্ভব, যিনি এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটতে দেন?

সত্যই যদি আল্লাহ ন্যায়বিচারক ও কল্যাণময় হয়ে থাকেন, তবে ভালো লোকদের সাথে কেবল '*ভালো*' এবং মন্দ লোকদের সাথে কেবল '*মন্দ*' পরিণতি ঘটার কথা ছিল না কি?

প্রকৃতঅর্থে এর উত্তর হচ্ছেঃ হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণভাবে খাঁটি কথা। ভালো মানুষেরই পরিণতি কেবল ভালো হয়। মন্দ মানুষের পরিণতি কেবলই মন্দ হয়। কেন? কারণ, আল্লাহই সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ এবং তিনিই সবচেয়ে প্রেমময়। আর তাঁর জ্ঞানে কিংবা তাঁর প্রজ্ঞায় নেই কোনো ঘাটতি বা কমতি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, জ্ঞান ও উপলব্ধিতে আমাদেরই কমতি বা ঘাটতি রয়েছে।

লক্ষ্য করুন, "ভালো মানুষের পরিণতি কেবল ভালো হয়। মন্দ মানুষের পরিণতি কেবল মন্দ হয়" এই বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে 'ভালো' ও 'মন্দ'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। যদিও দুনিয়াতে যত লোক রয়েছে, ভালো ও মন্দের সংজ্ঞাও ঠিক তত, তথাপি ভালো ও মন্দের একটি বোধগম্য উপলব্ধি [সবার মাঝে] বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানোতে সফল হওয়াকে সবাই 'ভালো' বলে মেনে নিতে একমত হবে। অন্যদিকে নিজের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বা গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়াটা 'মন্দ' বলে বিবেচিত হবে। ভীষণভাবে ওজনহীন হওয়ার কারণে আমার লক্ষ্য যদি ওজন বাড়ানো হয়, তবে ভারী হওয়াটা আমার জন্য ভালো বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে বিপজ্জনকভাবে মোটা হওয়ার কারণে আমার লক্ষ্য যদি ওজন কমানো হয়, তবে মোটা হওয়াটা হবে মন্দ। আমার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে একই ঘটনা হতে পারে ভালো কিংবা মন্দ। তাই আমার দৃষ্টিতে 'ভালো' নির্ভর করছে আমার ব্যক্তিগত অর্জনের ওপর। এদিকে চূড়ান্ত 'ভালো' নির্ভর করছে আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ওপর।

কিন্তু আমার লক্ষ্যটা কি?

এ প্রশ্নটা আমাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যেহেতু এটা আমাদের অস্তিত্বের উচ্চতর বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিষয়ে কথা আসলেই অপরিহার্যভাবে দুটো পৃথক বিশ্ব-দর্শনের আবির্ভাব ঘটে। প্রথম বিশ্ব-দর্শনের মতে, এই জীবনটাই বাস্তবতা, এটাই চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল এবং আমাদের সকল চেষ্টার লক্ষ্যও এই দুনিয়া। দ্বিতীয় বিশ্ব-দর্শনের মতে, এই জীবন কেবল একটি সেতু, একটি মাধ্যম, যা স্রষ্টার অসীম বাস্তবতার মোকাবেলায় একটি ঝলক ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম দলভুক্ত লোকদের জন্য এই দুনিয়াটাই সব। সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার লক্ষ্য এই দুনিয়া প্রাপ্তি। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলভুক্ত লোকদের জন্য এই জীবন শূন্যের পানে ধেয়ে চলছে। কেন? কারণ অসীমের সাথে যত বড় সংখ্যাই তুলনা করা হোক না কেন, তা শূন্যে পরিণত হয়। এই জীবন [তাদের নিকট] কিছুই না। [তাদের নিকট] এটা যেন ক্ষণিকের স্বপ্ন।

এই দুটো আলাদা বিশ্ব-দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রশ্নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। লক্ষ্য করুন, যিনি বিশ্বাস করেন, এই জীবনটাই আসল, এটাই চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল এবং এটাই সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, তবে তার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য হবে, এই জীবনকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ ও আনন্দ এবং বস্তুগত সফলতা দিয়ে ভরে ফেলা। এ নমুনা অনুযায়ী প্রকৃতঅর্থেই 'ভালো' লোকগণ প্রতিটি সেকেন্ডে 'মন্দ' পরিণতি বরণ করছে। এরকম নমুনায় লোকজন এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, এই দুনিয়ায় ন্যায় বলে কিছুই নেই, তাই হয় স্রষ্টা বলে কেউ নেই, আর থাকলেও তিনি ন্যায়বিচারক নন (*ওয়া নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি*)। এটা অনেকটা ওই লোকের মতো, যিনি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখার কারণে এ উপসংহার টেনেছেন যে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের স্বপ্নের ওই অভিজ্ঞতাকে যথাযথ ওজন দিচ্ছি না কেন? তদপুরি, কিছু স্বপ্নের অভিজ্ঞতা তো বেশ ভয়ানক –এবং 'ভালো' লোকের বেলায় প্রায়শই এমনটি ঘটে। আমাদের স্বপ্নে আমরা কি ভয়াবহ ধরনের আতঙ্ক কিংবা চরম মাত্রার প্রশান্তি অনুভব করি না? হ্যাঁ, করি। কিন্তু সেটা এতোটা গুরুত্ব রাখে না কেন?

কারণ, আমাদের "প্রকৃত" জীবনের নিরীখে এটা তেমন কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-দর্শন (তথা ইসলাম অনুযায়ী) এ জীবন একটা স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তাই সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ ও অর্জন দিয়ে ভরে ফেলাটা, এই জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। এই বিশ্ব-দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, স্রষ্টা তা ঠিক করে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে [সেটা] জানিয়ে দিচ্ছেন:

> "আমার ইবাদত করা ছাড়া (অন্য কোনো উদ্দেশ্যে) আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করিনি।" (কুরআন, ৫১:৫৬)

এই বাক্যের বিশেষ গঠন কাঠামোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুরু হয়েছে "অস্বীকৃতি" বা "নাকচ" করার দ্বারা: "*আমি সৃষ্টি করিনি জিন ও ইনসানকে।*" প্রথমেই আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তায়ালা* জীবনের আর সব উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন; অতঃপর তিনি মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত করেন, "*শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করা।*" একজন ঈমানদার হিসেবে আমার নিকট এটার মর্ম হচ্ছে: আল্লাহকে জানা, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করা ছাড়া আমার অস্তিত্বের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটাই একমাত্র কারণ, যার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি, যেহেতু আমার কর্ম ও বিশ্বাস কি হবে, সেটা নির্ধারিত হয় এই উপলব্ধির ভিত্তিতে। আমার চারপাশে যা কিছু আছে

এবং জীবনে আমি যত অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার সবকিছুই নির্ধারিত হয় এই উপলব্ধির আলোকে।

'ভালো' ও 'মন্দে'র সংজ্ঞার আলোচনায় ফিরলে আমরা দেখতে পাই, চূড়ান্ত বিবেচনায়, যা আমাদেরকে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত করে, তা 'ভালো' এবং যা আমাদেরকে ওই উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরায়, তাই 'মন্দ'। তুলনামূলকভাবে, বস্তুগত এই দুনিয়াই যার লক্ষ্য, বস্তুগত জিনিসই তাদের 'ভালো' ও 'মন্দ' ঠিক করে দেয়। তাদের জন্য ধনসম্পদ, মর্যাদা, খ্যাতি কিংবা সম্পত্তি অর্জন করাটা অপরিহার্যভাবে 'ভালো' এবং সম্পদ, মর্যাদা, খ্যাতি বা সম্পত্তি হারানো তো অপরিহার্যভাবে 'মন্দ'। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী, নিরপরাধ ব্যক্তি যখন তার সব বস্তুগত অর্জন হারিয়ে ফেলে, তখন তার মানে দাঁড়াচ্ছেঃ একজন 'ভালো' লোক 'মন্দ' পরিণতির কবলে পড়েছে। বস্তুতঃ ত্রুটিযুক্ত বিশ্ব-দর্শনের পরিণতিতেই এমন ভ্রমের সৃষ্টি হয়। লেন্সই যখন ত্রুটিপূর্ণ, তখন ওই লেন্স দিয়ে দেখা সকল ছবিই হবে ত্রুটিতে ভরা।

দ্বিতীয় বিশ্ব-দর্শনের লোকদের নিকট, আল্লাহর ভালোবাসার সান্নিধ্য লাভের যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা কিছু এই উদ্দেশ্যের কাছাকাছি আমাদেরকে পৌঁছে দেয়, তা ভালো এবং যা কিছু আমাদেরকে ওই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে, তা মন্দ। বিলিয়ন ডলার জেতাটা হবে আমার জন্য হবে চরম মুসিবতের, যদি সেটা আমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আমাকে আমার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরায়। অন্যদিকে চাকরি হারানো, নিজের সকল ধনসম্পদ হারানো, এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়াটাও হবে বাস্তবিকপক্ষে আমার জন্য সীমাহীন আশীর্বাদের, যদি সেটা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, যা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। কুরআনে আল্লাহ এই বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(কুরআন, ২:২১৬)

"হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করো, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হয়তো তোমরা কোনো জিনিস পছন্দ করো, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। বস্তুত আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জানো না।"

একজন ঈমানদার হিসেবে বস্তুগত দৃষ্টির মানদণ্ডে লাভ ও ক্ষতি মাপাটা এখন আর আমার মানদণ্ড নয়। আমার মাপকাঠি এসবের চেয়ে মহান কিছু। পার্থিব

বিবেচনায় আমার কি আছে বা নেই, সেগুলো আমাকে কতটুকু আল্লাহর নিকটবর্তী করে কিংবা আমাকে আমার লক্ষ্য তথা আল্লাহ থেকে কতটুকু বিচ্যুত করে, তার ভিত্তিতেই সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন হবে। এই দুনিয়ার (জীবন) আমার কাছে ওই স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়, কিছু সময়ের জন্য আমি যেটার অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং এরপর আমি জেগে উঠি। ওই স্বপ্নটি কি ভালো ছিল নাকি মন্দ ছিল, সেটা নির্ভর করে জাগ্রত হওয়ার পর আমার অবস্থার ওপর।

অতএব, চূড়ান্ত মানদণ্ডের আল্লাহর ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ শুধু ভালো লোকদেরই মঙ্গল করেন (তথা তাঁর নৈকট্য দিয়ে থাকেন) এবং তিনি শুধু খারাপ লোকেরই কপাল পুড়ান (তথা তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করে)। এই পার্থিব জীবন ও আখিরাতের জীবনে আল্লাহর নৈকট্য লাভই সর্বোত্তম মঙ্গল এবং 'ভালো' মানুষের কপালেই শুধু এই সৌভাগ্য জুটে। এই কারণে নবি (ﷺ) বলেনঃ

> "ঈমানদারের বিষয়টি আসলেই অবাক করার মতো। সবকিছুতেই তার জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং এটা শুধু ঈমানদারের জন্যই। যদি তার কাছে কোনো কল্যাণ পৌঁছায় সে আল্লাহর শোকর আদায় করে, যেটা তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" [মুসলিম]

নবি (ﷺ)-এর বাণী কিংবা কাজের সংরক্ষিত এই বিবরণ তথা এই হাদিসে ব্যাখ্যা মোতাবেক, বাহ্যিকভাবে যা দৃশ্যমান হয়, 'ভালো' এবং 'মন্দ' সেটার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এই হাদিসের ব্যাখ্যা অনুসারে, [কোনোকিছুর] 'ভালো' নির্ধারিত হয়, ওই জিনিস অন্তর্নিহিতভাবে যে উত্তম অবস্থা তৈরি করে তার ওপর [যেমন]: ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা –আর এই দুটো গুণই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর প্রশান্তির বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে, এই জীবন ও আখিরাতে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় মুসিবত। আর 'মন্দ' লোকদেরই এর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। [আল্লাহর নৈকট্য থেকে] 'দূরে সরা বা বিচ্যুত' এসব লোকের সম্পদ বা মর্যাদা বা প্রতিপত্তি বা সম্পত্তি আছে কি নেই, সেগুলো ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সব থেকে মধুর বা সব থেকে ভয়ানক দুঃস্বপ্নে আপনি কি পেলেন আর কি হারালেন, সেগুলো যেমন বাস্তব নয়, গুরুত্বপূর্ণও নয়। তেমনিভাবে [আল্লাহর নৈকট্য থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির অর্জনও] ওই স্বপ্নে পাওয়া জিনিসের মতোই মূল্যহীন ও অনর্থক।

এসব মোহ ও ভ্রম সম্পর্কে আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ

> "এদের বিভিন্ন দলকে পরীক্ষার জন্য পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে আচ্ছাদিত ভোগের যেসব সামগ্রী দিয়েছি, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না। কেননা, আপনার স্রষ্টার দেওয়া রিযিকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।" (কুরআন, ২০:১৩১)

স্থায়ী জীবন তো সেটাই, যেটার সূচনা তখনই হয়, যখন আমরা এই দুনিয়ার [মায়াজাল থেকে] জাগ্রত হই। আর ওই জাগরণের মাঝেই আমরা উপলব্ধি করি ...

এটা [পার্থিব জীবন] ছিল কেবলই এক স্বপ্ন।

বদ্ধ দুয়ার এবং যেসব মায়া-মোহ আমাদেরকে অন্ধ করে রাখে

গতকাল আমার ২২ মাস বয়সী ছেলে প্রথমবারের মতো তার স্বাধীনতা চর্চা করতে চেয়েছিল। গাড়িতে নিজের আসন থেকে কোনো রকম বের হয়েছে, বড়দের মতো সে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে চাইলো। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তার ওপর নজরদারি করছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে, আমি যদি তাকে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে দিই, তবে তা করতে গিয়ে তার ছোট্ট মাথাটুকু সজোড়ে আঘাত পেয়ে থেতলে যাবে। তাই আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম এবং নিজেই গাড়ির দরজা বন্ধ করলাম। এটা তাকে ভীষণভাবে মনোঃক্ষুন্ন করে এবং সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। যে কাজ করতে সে এতো ভীষণভাবে উদগ্রীব, তা করতে কিভাবে আমি তাকে বাধা দিলাম?

এই ঘটনা দেখে আমার মনে আশ্চর্যজনক এক চিন্তার উদ্ভব ঘটে। আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া একই রকম ঘটনাগুলি আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হলো –যখন আমরা ব্যাকুলভাবে কিছু চাই, কিন্তু আল্লাহ সেটা লাভ করার অনুমতি আমাদের দেন না। আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হলো, সেসব সময়ের কথা, যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে আমরা সবাই এই একই ধরনের হতাশায় ভুগি, যখন আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যাশা মোতাবেক হয় না। আর তখন সহসাই বিষয়টি খুব পরিষ্কার হয়ে গেল। [গাড়ির] দরজার আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি আমার ছেলেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিই। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই ছিল না। আমার ছেলে যেভাবে তার সারল্য ও নিষ্পাপ বোধ থেকে কান্না করেছিল, প্রায়শই আমরা সেভাবে বিলাপ করতে থাকি, যেখানে বাস্তবতা হচ্ছে: [ওই না পাওয়াটাই] আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

যখন আমরা বিমানের ফ্লাইট মিস করি, চাকরি হারাই কিংবা আমাদের মনের মানুষকে বিবাহ করতে ব্যর্থ হই, তখন একবারের জন্যও আমরা কি ভেবে দেখেছি যে, হয়তো এমনটি আমাদের মঙ্গলের জন্যই হয়েছে? কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করেন:

> "... হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করো, কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হয়তো তোমরা কোনো জিনিস পছন্দ করো, কিন্তু সেটা

তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জানো না।" (কুরআন, ২:২১৬)

তারপরও কোনো জিনিসের বর্হিভাগ ভেদ করে দেখাটা বেশ কঠিন। মায়া ও মোহজাল ভেদ করে অন্তর্নিহিত সত্যের দেখা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট (মানসিক) শক্তির প্রয়োজন হয়, হয়তো আমরা সে সত্য উপলব্ধি করতে পারি, আবার নাও করতে পারি। ঠিক যেভাবে আমার ছেলেটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে, ওই মুহূর্তে তার ঐকান্তিক চাওয়া থেকে বিরত করাটাই ছিল তার প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি রাখার দাবি, ঠিক তেমনি আমরা প্রায়শই একই রকম অন্ধ হয়ে পড়ি।

ফলশ্রুতিতে, আমাদের জীবনের বদ্ধ দুয়ারগুলোতে আমরা অনিশ্চয়তায় ঘেরা চোখ দিয়ে তাকাতে থাকি এবং [আমাদের জন্য] যেসব দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে, সেটার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতে একদমই ভুলে যাই। যখন আমরা মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারি না, তখন [ঘটনার বাহ্যিকতা] ভেদ করে সামনে তাকানোর অক্ষমতা আমাদেরকে এতোটাই অন্ধ বানায় যে, ওই মানুষটির থেকে উত্তম কেউ যে থাকতে পারে, সে ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধ বনে যাই। যখন আমাদেরকে চাকুরিটা দেওয়া হয় না, কিংবা যখন আমরা সাধের কোনো বস্তু হারিয়ে ফেলি, তখন এক পা পেছনে গিয়ে গোটা দৃশ্যটা (*The bigger picture*) অবলোকন করা আমাদের জন্য ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায়শই আল্লাহ আমাদের থেকে বিভিন্ন জিনিস কেড়ে নেন, যাতে করে সেগুলোর বদলে উত্তম কিছু [আমাদেরকে] দিতে পারেন।

এমনকি ট্রাজেডিও এজন্য ঘটতে পারে। সন্তান হারানোর চেয়ে বড় কোনো বেদনা কেউ কল্পনা করতে পারে না। তথাপি এই ক্ষতিও পারে আমাদেরকে রক্ষা করতে এবং উত্তম কিছু দিতে।

নবি (ﷺ) বলেন:

"(আল্লাহর) কোনো বান্দার সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 'তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের [প্রাণ] হরণ করে নিয়ে আসলে?'

ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন: 'হ্যাঁ।'

আল্লাহ তাদেরকে বলেন: 'তোমরা কি তার কলিজার টুকরোকে তুলে এনেছো?'

তারা উত্তরে বলেন: 'হ্যাঁ।'

আল্লাহ তাদেরকে বলেন: 'আমার বান্দা তখন কি বলে?'

ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন: 'সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং বলেছে: 'আল্লাহর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করি।'

আল্লাহ তাদেরকে বলেন: 'জান্নাতে আমার বান্দার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো এবং এটার নাম রাখো 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)।" [তিরমিযি]

সন্তানের মতো প্রিয় বস্তু যখন আল্লাহ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেন, হয়তো তিনি আমাদেরকে আরও কল্যাণকর কিছু দিতে চাইছেন, তাই তিনি এমনটি করেছেন। হয়তো ওই হারানোর কারণেই আমাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে এবং সেখানে ওই সন্তানের সাথে পার করবো আমরা চিরকালের জিন্দেগি। দুনিয়ার এই জীবনের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং এক চিরস্থায়ী জীবন, যেখানে আমাদের সন্তানের না থাকবে কোনো কষ্ট ও ভয়, আর না থাকবে সেখানে কোনো অসুস্থতা।

আমাদের এই জীবনের অসুস্থতা ও রোগ-বালাইও কিন্তু তেমনটি নয়, যেমনটি আমরা সেগুলোকে ভাবছি। এগুলোর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ আমাদের পাপগুলো ধুয়ে মুছে আমাদের পরিশুদ্ধ করে নিচ্ছেন। যখন নবি (ﷺ) কঠিন জ্বরে ভুগছিলেন, তখন তিনি বলেন:

"মুসলিম যখন কোনো কষ্টে পতিত হয়, এমনকি তা যদি কাঁটার আঘাতও হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ সেটার দ্বারা তার গুনাহগুলো মুছে দেন, যেমনিভাবে গাছ থেকে তার পাতাগুলো ঝরে পড়ে।" [বুখারি]

দুঃখ ও বিরহের বিষয়টিও যে এরূপ, সেটা নবি (ﷺ) অন্য এক হাদিসে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন:

"মুসলিমের ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, অসুস্থতা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্ষতি কিংবা নৈরাশ্য আসে –এমনকি তা যদি [দেহে] কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার মতো ঘটনাও হয়, তবে আল্লাহ সেগুলোর মাধ্যমে তার পাপগুলো মুছে দেন। [বুখারি]

অথবা দারিদ্রের বিষয়টি বিবেচনা করুন। ধনসম্পদ না থাকা যে সম্ভবত একটি আশীর্বাদ হতে পারে, অধিকাংশ মানুষ এটা কল্পনা করতেই পারে না। কিন্তু কারুনের আশেপাশের লোকজনের বেলায় বিষয়টি এমনই ছিল। কারুন নবি মুসা (*আলাহিস সালাম*)-এর সমসাময়িক ছিল এবং আল্লাহ তাকে এতোটাই অঢেল সম্পদ দান করেন যে, তার ধনভাণ্ডারের চাবিখানাও মহামূল্যবান সম্পদ ছিল। কুরআন বলে:

"অতঃপর স্বীয় জাঁকজমকে সজ্জিত হয়ে কারুন আপন সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। পার্থিব জীবনের জন্য যাদের অন্তর কামনাতুর ছিল, তারা বললোঃ 'হায়, কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো, আসলেই সে চরম ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।" (কুরআন, ২৮:৭৯)

কিন্তু কারুনের এই সম্পদ তাকে অহংকারীতে পরিণত করে। সে পরিণত হয় অকৃতজ্ঞে এবং সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। আল্লাহ বলেনঃ

"আর, আমি কারুন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। আল্লাহ ছাড়া এমন কেউই ছিল না যে তাকে সাহায্য করতে পারে। আর সেও পারলো না নিজেকে রক্ষা করতে। আগেরদিন যারা তার মতো মান মর্যাদার কামনা করেছিল, তারা বলতে শুরু করলো, 'দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তিনি সেটাকে সংকুচিত করে নেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না দেখাতেন, তবে আমাদেরকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো কাফিররা সফলকাম হয় না।'" (কুরআন, ২৮:৭৯)

কারুনের এই পরিণতি দেখার পরপরই ওই লোকেরা [আল্লাহর প্রতি] কৃতজ্ঞতা জানায় এই কারণে যে, তারা কারুনের সম্পদ থেকে বেঁচে গেছে।

সম্ভবত, এ ব্যাপারে মুসা (আ,) ও খিযিরের ঘটনার চেয়ে ভালো কোনো উদাহরণ হতে পারে না, যে ঘটনার বিবরণ সূরা আল-কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। নবি মুসা (*আলাইহিস সালাম*) যখন খিযিরের সাথে ভ্রমণ করছিলেন (বিশ্লেষকদের মতে, যিনি মানবরূপী এক ফেরেশতা ছিলেন), তখন নবি মুসা উপলব্ধি করেন যে, পরিস্থিতি যেরূপ দৃশ্যমান হয়, সেটা সব সময় সেরূপ হয় না এবং বাহ্যিকদৃষ্টি দিয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞাকে সর্বদা বোঝা সম্ভব হবে না। খিযির ও নবি মুসা এক জনপদে আসেন, যেখানে [আসতে না আসতেই] খিযির লোকদের নৌকাগুলো ফুটো করে দেন।

বাহ্যিকভাবে, এই কাজ নৌকাগুলোর মালিকদেরকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, যেহেতু তারা দরিদ্র। পরবর্তীতে খিযির ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে [তিনি তাদের কোনো ক্ষতিই করেননি, উল্টো] তাদেরকে এবং তাদের নৌকাগুলোকে তিনি রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন বলেনঃ

"(খিযির) বলেন, 'এখানেই আমার ও আপনার মাঝে সম্পর্ক শেষ হলো। আমি আপনাকে ওইসব ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানাবো, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি ধৈর্য ধরে রাখতে পারেননি। নৌকার বিষয়টি এরূপঃ এটা ওইসব দরিদ্র লোকের মালিকানাধীন ছিল, যারা সমুদ্রে কাজ করতো। তাই আমি নৌকাটি ফুটো করে দেই, যাতে করে তাদের এই নৌকা ওই রাজার হাত থেকে নিরাপদ থাকে, জোর-জবরদস্তি করে যে কিনা সমস্ত (ভালো) নৌকা দখল করে নিতো।'" (কুরআন, ১৮:৭৯-৭৯)

নৌকাগুলোর ক্ষতিসাধন করে খিযির এসব নৌকাকে ওই রাজার চোখে এগুলো অকেজো প্রমাণ করেন, যে রাজা জোর জবরদস্তির মাধ্যমে সকল নৌকা দখল করছিল। আর ঠিক এমনটিই কখনো কখনো আমাদের জীবনে ঘটে। [বিপদ থেকে] বাঁচানোর জন্যই আমাদের থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া হয় কিংবা আমাদের মর্জির উল্টো পথে আমাদেরকে কোনো জিনিস দেওয়া হয়। এরপরও আমার ২২ মাসের শিশু বালকটির মতো আমরাও মনে করতে থাকি আমাদের (সৌভাগ্যের) দুয়ার বন্ধ হয়ে আছে।

কষ্ট, ক্ষতি এবং আল্লাহর পথ

আমি আজও আমার মরিয়া হয়ে ওঠার সময়ের কথা স্মরণ করি। তীব্র নৈরাশ্যের পরই আসে আত্ম উপলব্ধি, তাই মিনতি করার জন্য আমি স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। যে জিনিস মাপা যাবে, কেনা যাবে, বিক্রি করা যাবে কিংবা যে জিনিস নিয়ে বাণিজ্য করা যায়, আমার মিনতি সেরকম কিছুর জন্য ছিল না। এটা ছিল অধিকতর সত্য এক জিনিসের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা। নিজের ভুলত্রুটিগুলো হঠাৎ করেই আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে পড়ে এবং আপন *নফস* তথা প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হতে আমি মরিয়া হয়ে উঠি। মরিয়া হয়ে উঠি একজন উত্তম মানুষে পরিণত হতে।

আর তাই, নিজের অন্তরকে আল্লাহ (ﷻ)-এর হাতে সমর্পণ করে নিজের পরিশুদ্ধির জন্য দু'আ করি। যদিও আমি সব সময় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, আল্লাহ অবশ্যই সকল দু'আ শোনেন, তথাপি ওই দু'আ কখন –অথবা কিভাবে– কবুল হবে, তার ধারণা আমার ছিল না।

এই দু'আর পরপরই, আমি আমার জীবনের অন্যতম এক কঠিন সময় পার করি। এই অভিজ্ঞতা লাভকালে নিজেকে আমি উজ্জীবিত রাখতাম, হেদায়েত ও শক্তি সঞ্চারের জন্য দু'আ করতাম। কিন্তু আমার আগের দু'আর সাথে এ অবস্থার কোনো যোগসূত্র আমি কখনো খুঁজে পেতাম না। ওই কঠিন সময়টুকু পার হওয়ার পর যখনই আমি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম, কেবল তখনই আমি উপলব্ধি করলাম, কিভাবে আমি পরিণত হয়ে উঠেছি। হঠাৎ করেই আমার দু'আর কথা আমার মনে পড়লো। সহসাই আমি অনুভব করি যে, এই কঠিন পরিস্থিতি নিজেই ছিল আমার ওই দু'আর জবাব, যা আমি এতো কাতরভাবে করেছিলাম।

রুমির বর্ণনার কারুকার্যে বিষয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে:

"যখন কেউ লাঠি দিয়ে কম্বলে আঘাত করতে থাকেন, তার উদ্দেশ্য কম্বলকে আঘাত করা নয়, বরং তিনি চান কম্বল থেকে ধূলাবালি সরাতে। তোমার অন্তরাত্মা 'আমিত্বের' চাদরের ধূলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আর এই ধূলাবালি একবারে সরে যাবে না। প্রতিটি নির্দয় প্রহার এবং প্রতিটি আঘাতের মাধ্যমে একটু একটু করে অন্তর থেকে [এই আমিত্বের ধূলা] সরে যাবে, কখনো অবচেতনভাবে, আবার কখনো সচেতনভাবে।"

প্রায়শই আমরা জীবনে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই এবং এসব ঘটনার মধ্যস্থ সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই না। যখন আমাদের ওপর কষ্ট ও দুর্ভোগ নেমে আসে কিংবা আমরা দুঃখ অনুভব করি, তখন প্রায়শই আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই যে, এগুলো অন্য কোনো কাজ বা অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ কারণ বা ফলাফল। আমাদের জীবনের কষ্ট ও দুর্ভোগ এবং আল্লাহ (ﷻ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক, এই দুটোর মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান, কখনো কখনো আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি না।

ওই কষ্ট এবং ওই প্রতিকূলতা জীবনে বহু উদ্দেশ্য সাধন করে, কষ্ট ও দুর্ভোগের সময়গুলো স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্কের অবস্থা যাচাই এবং তা সংশোধন করে নেওয়ার জন্য কাজ করতে পারে।

জীবনের কঠিন পরিস্থিতিগুলো আমাদের ঈমান, আমাদের আত্মসংযম এবং আমাদের সামর্থ্যের পরীক্ষা নেয়। এই সময়গুলোতেই আমাদের ঈমানের স্তর সুস্পষ্ট হয়। বালা-মুসিবত আমাদের মুখোশ খুলে দেয় এবং ঈমানের নিছক মৌখিক স্বীকৃতির পেছনে লুকানো সত্যকে উন্মোচন করে। কষ্টকর পরিস্থিতি সাচ্চা ঈমানদারদেরকে মেকি ঈমানদারদের থেকে পৃথক করে দেয়। আল্লাহ বলেন:

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' শুধু এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি তো এদের আগেরকার লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, (ঈমানের দাবিতে) কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, কারা (ঈমানের দাবিতে) মিথ্যাবাদী।" (কুরআন, ২৯:২-৩)

কষ্টকর পরিস্থিতি অবশ্যই আমাদেরকে পরীক্ষা করে। আবার এই কষ্ট ও দুর্ভোগ হতে পারে আশীর্বাদ ও আল্লাহর ভালোবাসার এক আলামত। নবি মুহাম্মদ (ﷺ) বলেনঃ

"যখন আল্লাহ কোনো ব্যক্তির কল্যাণ চান, তখন তাকে কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেন।" [বুখারি]

তবুও কষ্ট ও দুর্ভোগ কিভাবে জীবনে আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে, সেটার গভীরতা অধিকাংশ মানুষই আঁচ করতে পারেন না। অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কষ্ট ও দুর্ভোগ প্রকৃতপক্ষে [আত্মাকে] পরিশুদ্ধ করার এক হাতিয়ার, যেটা মানুষকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে আনে। ওই দাম্ভিক লোকের অবস্থা কেমন দাঁড়ায়, হঠাৎ করেই যে নিজেকে এমন পরিস্থিতে আবিষ্কার করে, যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই? ওই লোকের অবস্থা কেমন হয়, যে প্রবল ঝড়ের মাঝে নিজেকে মাঝ সমুদ্রে আবিষ্কার করে? "ডুবা সম্ভব নয়" বলে দাবিদার ওই জাহাজের অবস্থা কি দাঁড়ায়, যার পরিণতি হয় "টাইটানিক"-এর মতো?

দুর্ভাগ্য বলে মনে হলেও এগুলো অবচেতনার ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান। এগুলো [আমাদেরকে] বিনয়ী করে তোলে। আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। আমরা যে কতোটা তুচ্ছ ও নগণ্য এবং আল্লাহ যে কত মহান, এগুলো আমাদেরকে এটাই মনে করিয়ে দেয়। এগুলো আমাদেরকে আমাদের প্রবঞ্চনা, উপেক্ষা ও অবহেলা এবং এলোমেলো চিন্তাধারার আলস্য থেকে জাগিয়ে তোলে এবং আপন স্রষ্টার পানে আমাদের ফিরিয়ে আনে। কষ্ট আমাদের চোখ থেকে আরাম ও আয়েশের পর্দা সরিয়ে ফেলে এবং আমরা কি এবং কোথায় যাচ্ছি, আমাদেরকে তা মনে করায়। আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ

"... এবং আমরা তাদেরকে ভালো (সময়) এবং মন্দ (সময়) দ্বারা পরীক্ষা করেছি, এই কারণে যে, সম্ভবত তারা (আনুগত্যে) ফিরে আসবে।" (কুরআন, ৭:১৬৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

"যখনই আমরা কোনো নবি কোনো জনপদে পাঠিয়েছি, তখনই আমরা সে জনপদের লোকদেরকে কষ্ট এবং দুর্ভোগে ফেলি, যাতে করে তারা বিনম্র হতে শিখে।" (কুরআন, ৭:৯৪)

বিনম্রতার এই শিক্ষা মানব আত্মাকে এতোটাই পরিশুদ্ধ করে যে, [স্বয়ং] আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে মুমিনগণকে আশ্বস্ত করেন এবং এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, এই জীবনে যে কষ্টেরই তারা মুখোমুখি হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য তাদেরকে সমৃদ্ধ ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা। তিনি বলেন:

"তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো, একই রকম আঘাত তো অপর লোকদেরও (অর্থাৎ মুশরিকদের) লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলো পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে করে আল্লাহ মুমিনদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে শহীদ (সত্যের সাক্ষী) হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।" (কুরআন, ৩:১৪০-১৪২)

আত্মশুদ্ধির এই সংগ্রামই আল্লাহর দিকে উত্তোরণের পথের সার নির্যাস। ত্যাগের মাধ্যমে এর সূচনা ঘটে আর সংগ্রামের ঘাম দিয়েই বাধিয়ে নিতে হয়। এটা সে পথ, যে পথের বর্ণনা আল্লাহ এভাবে দেন:

"হে মানুষ! তুমি তোমার রবের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাকো, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।" (কুরআন, ৮৪:৬)

কষ্ট ও দুর্ভোগের প্রতি এক ঈমানদারের প্রতিক্রিয়া

মুসলিমদের জন্য সময়টা এখন দূর্যোগের। কখনো কখনো তো হতাশা না হওয়াটা কষ্টকর। আমাদের অনেকেই অবাক হন, কেন আমাদের সাথে এমন হচ্ছে? আমরা কোনো অন্যায় না করা সত্ত্বেও আমাদের সাথে কিভাবে এসব হচ্ছে? যে দেশটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে সকলের জন্য "স্বাধীনতা", "মুক্তি" ও "ন্যায়বিচারের" অঙ্গীকার নিয়ে, সেখানে আমরা কিভাবে এতোটা বৈষম্যের শিকার হই?[৩১]

এ ধরনের চিন্তা স্বাভাবিক হলেও এসব কিছুকে ছাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হবে। কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদেরকে বিভ্রান্তির মায়াজাল ভেদ করে সামনে তাকাতে হবে এবং এর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই হলোগ্রামের[৩২] অপর পাশে বিরাজমান প্রকৃত সত্যকে দেখতে হলে আমাদের দৃষ্টিকে নতুনভাবে নিবদ্ধ করতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও নবি (ﷺ)-এর শিক্ষায় এ সত্যটি বারবার এসেছে। ওই মৌলিক সত্যটি হচ্ছে, "**এই জীবনে যা কিছু আছে, তার সবই পরীক্ষা।**"

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

> "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, এটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (কুরআন, ৬৭:২)

এখানে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যটা আমাদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর তা হলো: আমাদের পরীক্ষা করার জন্য। ইমারজেন্সি সাইরেনের কথা এক মুহূর্তের জন্য একবার কল্পনা করুন। এটার উদ্দেশ্য কি? বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সেটার ইঙ্গিত ও সতর্কবার্তা এই সাইরেন। এটা শুনলে স্বভাবতই আমরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যখন তারা সাইরেন বাজায়,

---

[৩১] লেখিকা এখানে আমেরিকার কথা বুঝাচ্ছেন –(সম্পাদক)।

[৩২] হলোগ্রাম: এক বিশেষ ধরনের ছবি। লেজার রশ্মি দিয়ে তৈরি করা এ ধরনের ছবিকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে হয় –(সম্পাদক)।

তখন কি ঘটে? আমরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, সেটা জানার জন্য অনুশীলন হিসেবে এটা বাজানো হয়, তখন কি ঘটে? পরীক্ষামূলক সাইরেনের শব্দও ঠিক [জরুরি অবস্থার] সাইরেনের মতোই, কিন্তু এটা শুধুই "পরীক্ষামূলক"। যদিও এটা দেখতে ও শুনতে এবং এর অনুভূতি জরুরি অবস্থার সাইরেনের মতোই, তথাপি এটা ওই সাইরেন নয়। এটা শুধুই একটা পরীক্ষা। আর ওই পরীক্ষার ওই গোটা সময় জুড়ে আমাদেরকে বারবার এটাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

এই জীবন সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে ঠিক এটাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এটা দেখতে, শুনতে ও অনুভূতির দিক দিয়ে পুরোপুরি আসলের মতোই। সময় সময় এটা আমাদেরকে ভীত করবে। সময় সময় এটা আমাদেরকে কাঁদাবে। নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হওয়ার বদলে সময় সময় এটা আমাদেরকে পালাতে বাধ্য করবে। কিন্তু এই জীবন এবং এর মধ্যে যা আছে, তার সবই পরীক্ষা। এই জীবন সত্যিকার অর্থে আসল জীবন নয়। জরুরি সম্প্রচার ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের মতো এটা আমাদেরকে আসল [জীবনের] জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। পরীক্ষামূলক সাইরেনের অপর পার্শ্বে যে বাস্তব অবস্থা রয়েছে, এটা আমাদেরকে তারই প্রশিক্ষণ দেয়।

এখন, পরীক্ষামূলক সাইরেনের বেজে ওঠাটা যদি কোনো চমক সৃষ্টিকারী বিষয় না হয়, তখন কি হবে? যদি প্রতিটি ঘরে এই আগাম বার্তা দিয়ে দেওয়া হয় যে, পরীক্ষামূলক সাইরেন বাজানো হবে, তখন পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে? আল্লাহ (ﷻ), (মহিমান্বিত তিনি), আমাদের নিকট এই বার্তা পাঠিয়েছেন, কিছু সময়ের জন্য এটা বিবেচনা করুন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى
كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"আর পার্থিব জীবন এক ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-ঐশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা সবর ইখতিয়ার করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ়

(কুরআন, ৩:১৮৬)

সংকল্পের কাজ।"

একবার চিন্তা করুন তো, এই সতর্কবার্তার সাথে সাথে আমাদের পূর্বে গত হওয়া হাজারো সম্প্রদায়, যারা একই ধরনের পরীক্ষার শিকার হয়েছে, তাদের বিবরণও আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

(কুরআন, ২:২১৪)

"তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের আগেরকার লোকদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। এমনকি রসুল এবং তার সাথের ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল – আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটে।"

অতএব, শুধু সাইরেন বাজার ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি এবং এটা নতুন কিছুও নয়। ধরুন, আমাদের জাতিকে একথা জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তারা অনন্য কোনো জাতি নয় (*অর্থাৎ অন্যান্য জাতিগুলোকে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তাদেরকেও সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে*)[৩৩]। এসব কিছুর পর, যখন পরীক্ষামূলক সাইরেন বেজে উঠলো, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? সেটা যদি একটা ড্রিল বা অনুশীলন হয়, তবে এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, খটকা লাগারও কিছু নেই। ওই সময় আমরা উদ্বিগ্ন হই না, এমনকি আতঙ্কিতও হই না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা (সেই সাইরেনে) সাড়া দেই।

আর এখানেই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার জন্য আমরা এহেন আচরণ করি? কে আমাদের পরীক্ষা করছেন? প্রকৃতপক্ষে, কে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছে? *CNN, C-Span* নাকি আমেরিকান জনগণ?[৩৪] না, [এদের কেউই না]। এরা সবাই

---

৩৩ – (সম্পাদক)।

৩৪ আমেরিকার প্রেক্ষাপটে লেখা বিধায় এই উদাহরণগুলি এনেছেন লেখিকা। অন্যান্য দেশেও একইভাবে সেসব দেশের সরকার, গোয়েন্দা বিভাগ, মিডিয়া বা জনগণের নাম এ স্থানে আসবে – (সম্পাদক)।

সেই ইলিউশন বা বিভ্রমের এক একটি অংশ। সবাই পরীক্ষার এক একটি অংশ। এদের সকলকেই পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা কাজ করি একজন বিচারকের জন্য, আর কেবলই একজন বিচারকের জন্য। আমরা সেই মহান সত্য সত্তার (*আল-হাক্কের*)[৩৫] জন্যই শুধু কাজ করি। আমরা কাজ করি, কেননা, আমরা জানি, তিনিই সবকিছু দেখছেন। আর তিনিই সে একক সত্তা, যিনি এই পরীক্ষার বিচার করবেন।

যখনই আমরা এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করবো, তখনই নাটকীয় কিছু ঘটে যায়। এসবই যে একটি পরীক্ষা, বিষয়টি যখনই আমরা আত্মস্থ করে ফেলবো, তখন আমাদের প্রশ্নগুলোই সহসা বদলে যাবে। "কিভাবে এমনটা ঘটতে পারে?" "এটা এতো অন্যায্য কেন?" এ ধরনের প্রশ্ন করার বদলে আমাদের প্রশ্নগুলো হয় এরূপ: "এ অবস্থায় আমার করণীয় কি?" "এই পরীক্ষায় আমি কিভাবে উত্তীর্ণ হবো?" "এখান থেকে আমাকে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে?" "এই ভ্রম বা মায়া ভেদ করে, যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আমার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং এই যে পরীক্ষা –এসবের স্রষ্টার নৈকট্য আমি কিভাবে অর্জন করবো?" "একটা জাতি হিসেবে কিভাবে আমরা এই পরীক্ষাকে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবো?" এবং "এই পরীক্ষাতে আমরা কিভাবে ওই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজে লাগাবো, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য লাভের একটা উপায় হিসেবে একে (অর্থাৎ এই পরীক্ষাকে) সৃষ্টি করা হয়েছে?" "*আল্লাহু আকবার*" (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ)।

আল্লাহ (ﷻ)-এর পরীক্ষার সৌন্দর্য এখানেই নিহিত যে, পরীক্ষা আসছে একথা আমাদের শুধু জানিয়েই দেননি বরং এসব পরীক্ষায় সফল হওয়ার যথার্থ ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন তিনিই বাতলে দিয়েছেন। আর তা হলো: *সবর* (ধৈর্য) এবং *তাকওয়া* (আল্লাহ সচেতনতা)।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

"দুনিয়ার জীবন এক ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-ঐশ্চর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা সবর ইখতিয়ার করো এবং তাকওয়া

[৩৫] আল-হাক্ক: মহান আল্লাহ তা'আলার একটি নাম – (সম্পাদক)।

Contents

অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (কুরআন, ৩:১৮৫-১৮৬)

অপর এক আয়াতে, আমাদের বিরুদ্ধে করা চক্রান্তগুলির ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা এই দুটো জরুরি উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"তোমাদের কোনো মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল (সবরকারী) হও এবং মুত্তাকি হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।"

(কুরআন, ৩:১২০)

এসব পরীক্ষায় আমাদের সাফল্যের ম্যানুয়েলের অংশ হিসেবে পূর্বেকার লোকেরা যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন কিভাবে তারা তাতে সাড়া দিয়েছিল, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাও জানিয়ে দিচ্ছেন:

"লোকেরা তাদেরকে বললো: 'বিশাল এক সেনাদল তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, তাই তাদেরকে ভয় করো।' কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরও মজবুত করলো এবং তারা বলছিল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।' এরপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এলো এবং কোনো ক্ষতিই তাদেরকে স্পর্শ করেনি। আর আল্লাহ যাতে রাজী, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল। এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।" (কুরআন, ৩:১৭৩-১৭৫)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেনঃ

"আর কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা লোক ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে তারা দুর্বল হয়নি, নত হয়নি। আল্লাহ সবরকারীদেরকে ভালোবাসেন। একথা ছাড়া তাদের আর কোনো কথা ছিল না – 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং কাজে-কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘনকে তুমি ক্ষমা করো। আমাদের পা সুদৃঢ় রাখো এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। হে ঈমানদারগণ! যদি তোমার কাফেরদের আনুগত্য করো, তারা তোমাদেরকে (ঈমানের) বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।" (কুরআন, ৩:১৪৬-১৫০)

আল্লাহ (ﷻ) এসব ঘটনা আমাদেরকে জানাচ্ছেন, যাতে করে আমাদে পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের আচরণ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহন করতে পারি তাদের প্রতিক্রিয়া ছিলঃ "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম রক্ষক।' তাদের প্রতিক্রিয়া ছিলঃ "হে আমাদের প্রভু, আমাদের পাপ এবং কাজে-কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘনসমূহ ক্ষমা করো, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" পরীক্ষাটা কি, সেটা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা ছিল না, বরং তাদের দৃষ্টি চোখের সীমা অতিক্রম করে প্রসারিত ছিল। তারা ইলিউশন বা বিভ্রান্তির মায়াজাল ভেদ করে তাকাতেন এবং নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন যিনি আছেন এসবের পেছনে। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলাই যে এসব পরীক্ষা নিচ্ছেন, তারা শুধু এতটুকুই উপলব্ধি করেনি, বরং এসব থেকে তাদেরকে কেবল আল্লাহই রক্ষা করতে পারেন, সেটাও তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তারা ক্ষমা, সব্‌র এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্র তথা তাকওয়া সমুন্নত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাঁরই সাহায্য লাভের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেছিলেন।

তবে সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুমিনদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন এবং তাদেরকে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেনঃ

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে একই রকম আঘাত তো তাদেরও (অর্থাৎ বদরে মুশরিকদেরও) লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আল আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে (আল্লাহর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছে এবং কে সবর করেছে, তা এখনো প্রকাশ করেননি?" (কুরআন, ৩: ১৩৯-১৪২)

জীবনকে আমরা যে লেন্স দিয়ে দেখি, একবার যখন আমরা তা বদলে ফেলবো, তখন আমাদের অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার ধরন ব্যাপকভাবে বদলে যাবে। আমাদের পূর্ববর্তী নেককারগণ যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন সেটা তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে শুধু বৃদ্ধিই করেছিল। কুরআন বর্ণনা করছেঃ

"মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তারা বলে উঠলো, 'এটা তো তা-ই, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যার ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" (কুরআন, ৩৩:২২)

যতক্ষণ না আমরা ওই লেন্সটি বদলাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের পক্ষে "কিভাবে আমাদের সাথে এমনটি ঘটলো?" এ জাতীয় প্রশ্ন ভেদ করে, পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার জন্য দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রসারিত করা সম্ভব হবে না। (বস্তুত এ পরীক্ষা হলো) স্রষ্টার সৃষ্ট এক হাতিয়ার, যার উদ্দেশ্য হলোঃ (মুমিনদের) পরিশুদ্ধ করা (তাদের ঈমানকে) মজবুত করা এবং আপনার, আমার এবং আমাদের সকল শত্রুর যিনি স্রষ্টা, তাঁর নৈকট্য অর্জন করা।

এই জীবনঃ কয়েদখানা নাকি স্বর্গ?

আমি তখন বিমান বন্দরে। নিরাপত্তা লাইনে দাঁড়িয়ে। আর অপেক্ষা করছিলাম আনুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছোট একটি মেয়ের দিকে আমার নজর পড়লো। মেয়েটি ছিল তার মায়ের সাথে। ছোট্ট মেয়েটি কাঁদছিল। স্পষ্টত সে ছিল অসুস্থ। তার মা ব্যাগ থেকে বের করে তাকে কিছু ঔষধ দিল। মেয়েটির দুঃখজনক অবস্থা আমাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিলো। সহসা আমার কাছে একটা বিষয় ধরা পড়লো। আমার মনে হলো, আমি এমন কাউকে দেখছি, যে একটি ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। এই নিষ্পাপ ও পবিত্র আত্মাখানি পার্থিব এক দেহে বন্দি, যাকে অসুস্থ হতে হয়, কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

আর ঠিক তখনই নবি (ﷺ)-এর ওই হাদিসের কথা আমার মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলেনঃ

> "এই দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।" [সহিহ মুসলিম]

আর প্রথমবারের মতো এই হাদিসের বক্তব্য আমি আগের চেয়ে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করলাম। কাফিররা এই দুনিয়া ভোগবিলাসে পার করবে, অন্যদিকে মুমিনগণ এই জীবনে হালাল ও হারামের মাঝে আটকে থাকতে বাধ্য এবং নিজেদেরকে উপভোগের জন্য আখিরাত পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই, হাদিসটিকে যারা এভাবে ব্যাখ্যা করেন, তারা একে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন না বলে আমি মনে করি। একইভাবে অপরকিছু মানুষের ধারণা এই হাদিসের তাৎপর্য হচ্ছেঃ এই দুনিয়ার জীবন হবে মুমিনের জন্য হবে দুদর্শায় পরিপূর্ণ এবং কাফিরের জন্য এই দুনিয়া পরম সুখের।

কিন্তু, [হাদিসটির তাৎপর্য এরূপ], আমি আদৌ তা মনে করি না।

সহসাই আমার মনে হলো, আমি যেন ওই ছোট্ট মেয়েটির মাঝে এই হাদিসের প্রকৃত বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পেলাম এক বন্দী আত্মাকে, বন্দি এই কারণে যে, সে মূলতঃ এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, এক উন্নততর জগতের, যে জগতে তাকে কখনো অসুস্থ হতে হয় না।

কিন্তু [পরিস্থিতি] এটার বিপরীত হলে, কেমন হবে? আত্মা যখন ইতোমধ্যেই ভাবতে শুরু করে যে, সে জান্নাতেই আছে। তখন ওই আত্মা কি কখনো অন্য কোথাও যেতে চাইবে? এর চেয়ে ভালো কোথাও? না। সে তো *ঠিক সেখানেই আছে*, যেখানে সে থাকতে ইচ্ছুক। ওই আত্মার কাছে এর চেয়ে 'উন্নত' কোনো নিবাস থাকতে পারে না। যখন আপনি স্বর্গেই আছেন, তখন আপনি অন্য কোথাও যাওয়ার কল্পনাও করতে পারবেন না। অন্য কিছুর জন্য আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করবে না। এর চেয়ে অধিক কিছুও চাইবেন না। আপনি যেখানে আছেন, তাতেই আপনি সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। এটাই একজন অবিশ্বাসীর মানসিকতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

(কুরআন, ১০:৭)

"নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার আয়াতগুলো সম্বন্ধে গাফেল।"

অবিশ্বাসী আত্মার জন্য এই অনিবার্যভাবে কষ্টকর, হতাশায় পরিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াই হলো স্বর্গ। এতটুকুই তারা জানে। এ অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখুন, এমন এক দুনিয়া, যেখানে আপনাকে পতিত হতে হয়, রক্তাক্ত হতে হয় এবং শেষ অবধি সেখানে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, সেটাই আপনার জানা একমাত্র স্বর্গ। এর ভয়াবহ যাতনার কথা একবার কল্পনা করুন।

[এই দুনিয়ার চেয়ে] উন্নত কোনো স্থান থাকতে পারে, যারা এটা বিশ্বাস করে না, যারা এই দুনিয়াকেই সর্বোত্তম পাওয়া হিসেবে বিশ্বাস করে, এই দুনিয়ার অপূর্ণতা দেখে খুব সহজেই তারা চরম বিচলিত হয়ে উঠে। খুব সহজেই তারা রাগে ও ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং সহসাই তারা বিধ্বস্ত হয়। কেননা, এই দুনিয়াই তো (তাদের বিবেচনায়) স্বর্গ হওয়ার কথা ছিল। এটার চেয়েও সমৃদ্ধ কিছু যে আছে, তারা সেটা উপলব্ধি করে না। তাই তারা কেবল এটাকেই পেতে চায়। এটার পেছনেই তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। স্রষ্টার দেওয়া প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি সামর্থ্য, প্রতিটি সুযোগ এবং প্রতিটি নেয়ামতকে তারা কেবল এই দুনিয়া হাসিলের জন্য ব্যয় করে, (কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো) সেখানে তাদের জন্য (স্রষ্টার তরফ থেকে) যা ধার্য করা হয়েছে, তা ছাড়া কিছুই তাদের কাছে ধরা দেবে না।

তাদের আত্মা এই পার্থিব দেহের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে, যেহেতু তাদের বিবেচনায় এ দেহই তাদের একমাত্র স্বর্গ – বর্তমান ও ভবিষ্যতেও। তাই একে

সে ছেড়ে যেতে চায় না। যেকোনো মূল্যে এই দেহকে সে (অর্থাৎ অবিশ্বাসী আত্মা) আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। (অবিশ্বাসী) আত্মাকে মৃত্যুর সময় তার এই 'স্বর্গ' থেকে তুলে নেওয়াটাই তার জন্য সব থেকে ভয়ংকর আযাব। অবিশ্বাসীদের মৃত্যুকে আল্লাহ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন তাদের আত্মাকে টেনে হিঁচড়ে দেহ থেকে বের করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেনঃ

"ওই (ফেরেশতাদের) শপথ, যারা (পাপাচারীদের আত্মাকে) ক্ষিপ্রতার সাথে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে।"

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا

(কুরআন, ৭৯:১)

এটা ছিন্নভিন্ন হয়। কেননা, আত্মা চায় না দেহকে ছাড়তে। সে তো বিশ্বাস করতো সে স্বর্গেই আছে। এর থেকেও শ্রেষ্ঠতর, আরও বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে, তা সে কখনোই ভাবেনি।

ঈমানদার আত্মার জন্য বিষয়টি পুরোপুরি ভিন্ন। ঈমানদার ব্যক্তি তো আছে কয়েদখানায়, সে তো কোনো স্বর্গে নেই। কেন? কয়েদি বলতে কি বুঝায়? যে কোথাও আটকা পড়ে আছে, সেই তো কয়েদি। কয়েদিকে নিজের আবাস থেকে দূরে রাখা হয়, এক জায়গাতে আটক অবস্থায়। অপরদিকে তার অবস্থা হলো সে চায় এখান থেকে উত্তম কোথাও যেতে। দুনিয়াবি দেহ ঈমানদারদের জন্য এক কয়েদখানার মতো, এটা এজন্য নয় যে, ঈমানদার আত্মার জন্য দুনিয়ার এই জীবন চরম দুর্দশাগ্র বরঞ্চ বিশ্বাসী আত্মা এর থেকে উন্নততর এবং শ্রেষ্ঠতর কোথাও যাওয়ার জন ভীষণভাবে ব্যাকুল। আপন নিবাসে ফিরে যেতে সে আকুল।

ঈমানদারের জন্য, এই দুনিয়ার জীবন যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, পূর্ণতায় ভরপুর যে জীবন তার জন্য অপেক্ষা করছে, তার তুলনায় এই জীবন কয়েদখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আত্মার যা কিছু অনুরাগ-আসক্তি, তা হলোঃ মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য এবং তাঁর কাছে যে জান্নাত আছে, তার প্রতি। এটা সেখানেই যেতে চায়। কিন্তু এই দুনিয়ার জীবন আত্মাকে সেখানে ফিরে যাওয়া থেকে আটকে রাখে –ক্ষণিকের জন্য হলেও। এটা একটা বাধা এবং এক কয়েদখানা। যদিও একজন বিশ্বাসীর আত্মাই এই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত স্বর্গের সন্ধান লাভ করে, তথাপি তার আত্মা এর থেকেও বেশি কিছু কামনা করে। সে আপন গৃহে ফিরতে চায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য আত্মাকে দেহ নামক এই কারাগারে থাকতেই হবে। বাড়ির ফিরে যাওয়ার জন্য মুক্তি পাওয়ার আগে, এই 'কারাবাস' তাকে করতেই হবে। ঈমানদার আত্মার অনুরাগ-আকর্ষণ কখনোই তাকে বন্দি করে রাখা এই দেহের

সাথে নয়। দণ্ড যখন সমাপ্ত হয় এবং কয়েদিকে যখন বলা হয়, সে এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারে, তখন সে কখনো কারাগারের গারদ ধরে বসে থাকবে না। আর তাই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের মৃত্যুকে একেবারে ভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"ওই (ফেরেশতাদের) শপথ, যারা (ঈমানদারদের আত্মাকে) অত্যন্ত মৃদুভাবে বের করে আনে।"

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

(কুরআন, ৭৯:২)

ঈমানদার আত্মা খুব সহজেই দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। 'তার "কারাদণ্ড" সমাপ্ত হয়েছে, আর এখন সে বাড়ি ফিরেছে। কাফিরদের আত্মা যেমন দুনিয়ার দেহকেই সর্বোত্তম আবাস ভেবে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে, ঈমানদারদের আত্মা তেমনটি কখনোই করে না।

আর, তাই আমাদের প্রিয় নবি (ﷺ) যে নিখুঁত উপমা দিয়েছেন, তার থেকে উত্তম কোনো উপমা আমি কল্পনা করতে পারছি না। সত্যই এই পার্থিব জীবন ঈমানদারদের জন্য কয়েদখানা এবং কাফেরদের জন্য এটা এক স্বর্গ। আমাদেরকে সবাইকে একই আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি এমনভাবে আমাদের জীবন কাটাবো যে, যখন ডাক আসবে, তখন আমরা কারাগারের গারদ আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবো? নাকি এমন জীবন কাটাবো, যখন ডাক আসবে, তখন তা হবে আমাদের মুক্তির ডাক। তা হবে ঘরে ফেরার ডাক।

সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক

গড়ার উদ্দেশ্যেই তিনি আপনাকে ভাঙেন। দেওয়ার জন্যই তিনি আপনাকে রাখেন বঞ্চিত। এই জীবনের জন্য আকুল না হয়ে আপনি যেন জান্নাতের জন্য ব্যাকুল হন, সেজন্যই তিনি আপনার অন্তরে সৃষ্টি করেছেন বিরহ ও বেদনা।

স্রষ্টার সন্ধানে

আমার গোটা জীবন আমি স্রষ্টার সন্ধানে ব্যয় করেছি। কিন্তু আমি নিজে তা বুঝতেই পারিনি।

[আমাদের] জীবনে, সম্পর্ক ও সাথির মাঝে, সকল কিছুর মাঝে যে জিনিসগুলো আমরা সবাই খুঁজে ফিরি, আমরা যদি সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখি, তবে আমরা দেখতে পাবো, আস্তিক-নাস্তিক সবাই আসলে স্রষ্টাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। গভীরভাবে ভেবে দেখলে উপলব্ধি করবেন স্রষ্টাই সকল কিছুর রূপকার, নকশাকার। আপনি আস্তিক হন বা নাস্তিক, স্রষ্টাই আপনার চাহিদা, আপনার আকর্ষণ, আপনার বাসনা সবকিছুর রূপকার। বস্তুত প্রাকৃতিক বিন্যাসকে সচল রাখতেই অন্তরের মাঝে স্রষ্টা এসব অনুঘটকের জন্ম দিয়েছেন। ওই প্রাকৃতিক বিন্যাসই: তাওহিদ (এক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে অন্বেষণ করা, তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা)।

আমি এবং আপনি যেসব জিনিস চাই, এক মুহূর্তের জন্য তা নিয়ে একটু ভাবুন তো। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাথির মাঝে আমরা কি দেখতে চাই? (তাদের মাঝে) কোন জিনিসটি পাওয়ার আশায় ছুটছি? আর কোন কথাটুকু শোনার জন্য আমরা সবকিছু দিতেও রাজি?

"আমি তোমার (ভালোমন্দের) দিকে খেয়াল রাখছি।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি, সবসময়। আর ওই ভালোবাসা কখনো শেষ হয়েও যাবে না, বদলেও যাবে না।"

"তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো।"

"আমি তোমাকে কখনো হতাশ করবো না।"

"আমি তোমাকে কখনো দুঃখ দেবো না।"

"আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে চলে যাবো না।"

"(বিপদে-আপদে) সর্বদা আমাকে তুমি সাথে পাবে।"

"আমি তোমার কদর করি।"

"আমি তোমাকে (তোমার চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যাকে) উপলব্ধি করি।"

"আমি তোমাকে বুঝতে পারি।"

"তুমি কে, সেটা আমি জানি।"

"আমি তোমার অতি নিকটে।"

"আমি তোমাকে মার্জনা করবো।"

"তোমাকে নিখুঁত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।"

"আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাবো না।"

"আমি কখনো তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।"

"তোমার অসতর্কতায় তোমার কোনো বিপদ না হয়, সেদিকে আমি নজর রাখছি।"

"আমি এটা (অর্থাৎ কোনো ঝামেলা বা মুসিবতের) দেখছি।"

"আমি তোমার কথা শুনছি। সত্য-সত্যই মনোযোগ দিয়েই শুনছি।"

"তাদেরকে আমি তোমাকে আঘাত করতে বা কষ্ট দিতে দেবো না।"

"সর্বদা আমি তোমায় রক্ষা করবো।"

"আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাবো না।"

"তুমি কখনো একা নও।"

"কখনো আমি তোমায় একা রেখে যাবো না।"

"তোমার আশেপাশে সবকিছু যখন একে একে ঝড়ে পড়বে, তখনও আমি তোমায় আগলে রাখবো।"

"তোমার জন্য যা সবচেয়ে ভালো, আমি তোমার জন্য কেবল সেটাই চাই।"

"যখন তুমি কেবল ভুলই করছো, তখনো আমি শুধু তোমায় ক্ষমা করবো।"

"তুমি প্রতিদান দিতে অক্ষম হলেও আমি সব সময় তোমায় শুধু দিয়েই যাবো।"

"যখন তুমি আমার বিরোধিতা করছো, তখনও আমি তোমার প্রতি দয়া করে যাবো। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না।"

"যাই করো না কেন, আমি তোমাকে সব সময় ক্ষমা করতে সক্ষম।"

"দুর্বলতা ও দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"আমি তোমাকে দেবো শান্তি ও স্বস্তি।"

"আমি তোমাকে খুশি করে দেবো।"

"আমিই তোমাকে দেবো দৃঢ়তা।"

"আমিই তোমায় দেবো শক্তি ও সাহস।"

"আমিই তোমাকে সারিয়ে তুলবো।"

"আমিই তোমাকে দেবো সম্মান ও প্রতিপত্তি।"

"সর্বদা আমি তোমাকে স্বস্তি দিয়ে যাবো।"

"আমার জন্য তুমি যত সামান্য কিছুই করো না কেন, আমি সেটার কদর করবো এবং তোমাকে সেটার প্রতিদান দেবো।"

"যত যা কিছুই ঘটুক, যখনই তুমি আমার দিকে ফিরবে, আমাকে তোমার জন্য সেখানে উপস্থিত পাবে।"

"আমার বিপক্ষে তুমি যা-ই করো না কেন, আমি তোমাকে সব সময়ই ক্ষমতা করতে সক্ষম।"

বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা যখন ভাবছি যে, আমরা একজন ভালো স্বামী কিংবা একজন ভালো স্ত্রী খুঁজছিলাম, অথবা খুঁজছিলাম একটা ভালো চাকুরি কিংবা রাশি রাশি অর্থ বা সম্মান, তখন আমরা সত্যিকার অর্থে আসলে স্রষ্টাকেই খুঁজছিলাম। ফলশ্রুতিতে ওই স্বামী, ওই স্ত্রী, ওই চাকুরি, ওই অর্থ অথবা ওই সম্মান যখন আমাদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ, তখন আমাদের হতাশ হওয়াতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

এমনকি এই শূন্যতা সৃষ্টির পেছনেও উদ্দেশ্য আছে। সে শূন্যতা পূরণের জন্য আমাদের ধাবিত করার জন্য। সমস্যা হচ্ছে, আমরা একে ভুল জিনিস দিয়ে পূর্ণ

করতে চাই। আমাদের মাঝে যা কিছু আছে, তার সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে শূন্যতা পূরণের এই যাত্রায় সত্যিকারের পূর্ণতাকে খুঁজে পেতে, খুঁজে পেতে আল্লাহকে। এমনকি শয়তান ও নফসকেও স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যদি এদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ যথাযথ হয়। শয়তান ও নফস আমাদের শত্রু, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ নিজেদেরকে আমরা কিভাবে এদের থেকে নিরাপদ রাখবো? মানুষেরা কি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে? অর্থবিত্ত পারবে সহায়তা করতে? দুনিয়াবি ক্ষমতা বা অস্ত্র কি পারবে আমাদেরকে এসব চরম শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে? কোথায় পাবো সেই 'একমাত্র' আশ্রয়স্থল, যেখানে আমরা শয়তান এবং নিজেদের নফস থেকে নিরাপদ? আল্লাহই সেই আশ্রয়স্থল। আসলে এসব (অর্থাৎ এই সব শূন্যতা, শয়তান ও নফসের বিরোধিতা, বিপদ-মুসিবত) কিছুর উপমা সেই ঝড়ের মতো, যাকে পাঠানো হয় আমাদেরকে একমাত্র আশ্রয়ের দিকে ধাবিত করে আনবে। আমাদের তাড়িয়ে আনবে সেই মহান সত্তা আল্লাহ (*আযযা ওয়া জালের*) দিকে।

এমনকি আপনার পাপও আপনাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। কেননা, [তিনি ছাড়া আর কে আছে], যিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন? নিজের পাপের বিপর্যয় ও বিভীষিকা হতে বাঁচার জন্য [তিনি ছাড়া] আর কার কাছে আপনি আশ্রয় নেবেন? [তিনি ছাড়া] এমন কেউ কি আছে, যিনি আপনার পাপগুলির যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বা সেগুলো মুছে দিতে, এমনকি সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম?

আপনার ভয়ও হতে পারে স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। যখন আপনি ভয় পান, তখন (আল্লাহ ছাড়া আর) কে আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম? যখন আপনি অসহায় ও নিরুপায় হয়ে মাঝ দরিয়ায় আটক, তখন আর কে আপনাকে দিতে পারে স্বস্তি ও নিরাপত্তা? যখন আপনি দারিদ্রে নিপতিত, তখন আর কে আছে যে আপনাকে রিযকের যোগান দিতে পারে? যখন আপনি কঠিন শোকে নিমজ্জিত, তখন কে আছে এমন যে আপনাকে টেনে তুলে? যখন আপনি ভেঙে পড়েন, তখন আর কে পারে আপনার চূর্ণ-বিচূর্ণ অন্তর আর জীবনকে সারিয়ে তুলতে? কে আছে এমন যে মৃতের মাঝে সঞ্চার করতে পারে জীবনের আলো? আপনাকে দিতে পারে আরোগ্য, এমন কে আছে? আর কে পারে আপনাকে রক্ষা করতে? যখন আপনি পথহারা, তখন আর কে আছে যে আপনাকে পথের দিশা দিতে সক্ষম?

তিনি (অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা) ছাড়া আর কে?

আপনি ভেবেছিলেন ঝড়-ঝাপটা, উত্তাল সমুদ্র, ভয়, দুঃখ-বিরহ, ভুলভ্রান্তি, হারানোর বেদনা, হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণ এ সবকিছুই আপনার জন্য অমঙ্গলজনক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছেঃ এ সবগুলোই এক একটি মাধ্যম মাত্র। এগুলো সবই স্রষ্টার নৈকট্য লাভের একটি বাহন মাত্র। এগুলো আপনাকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়। এগুলো আপনাকে পূর্ণতা, সুখ ও নতুন জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনে। এগুলো আপনাকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেখানেই (অর্থাৎ মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে) ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।[৩৬] আপনি মনের গহীনে আসলেই যা খুঁজছিলেন, তার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য।

ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে সেই মহান সত্তা *রব্বুল আলামিনের* সান্নিধ্যে।

[৩৬] এজন্যই আমরা বলি – *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন* – (সম্পাদক)।

সলাতঃ জীবনের ভুলে যাওয়া উদ্দেশ্য

সময়ের পরিক্রমায় মানুষ অনেক সফরই করেছে। কিন্তু একটা সফর এমন, যা দুনিয়ার কেউই করেনি।

কেউই না, তবে একজন ছাড়া।

এমন এক বাহনে করে তিনি সেই ভ্রমণ করেছেন, যাতে কোনো মানুষ কখনো চড়েনি। এমন এক পথে যে পথ কোনো মানবাত্মা কখনো দেখেনি। এমন এক স্থানের উদ্দেশ্যে, যেখানে কোনো সৃষ্টি পা রাখেনি। এটা ছিল একজন মানুষের সফর, মহান স্রষ্টার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। এটা ছিল আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সর্বোচ্চ আসমানে গমনের সফর।

এটা ছিল 'আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ' (মহিমান্বিত যাত্রা)।

এই সফরে আল্লাহ তাঁর হাবিব রসুল (ﷺ)-কে সপ্ত আসমানে নিয়ে যান, যেখানে জিব্রাইল ফেরেশতারও প্রবেশের অনুমতি নেই। দুনিয়াতে নবি (ﷺ)-এর মিশনে প্রতিটি দিক-নির্দেশনা, প্রতিটি আদেশ পাঠানো হতো ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে। কিন্তু একটি আদেশ ছিল এর থেকে ব্যতিক্রম। একটি আদেশ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে তা প্রেরণের বদলে আল্লাহ পাক স্বয়ং নবি (ﷺ)-কে নিজের কাছে তুলে নেন।

এ হুকুমটা ছিল সলাত বা নামাজের। নবি (ﷺ)-কে সলাতের প্রথম যে আদেশ দেওয়া হয়, তা ছিল দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্তের। নবি (ﷺ) আল্লাহর কাছে তা সহজ করার আর্জি পেশ করায়, এই আদেশকে পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে তিনি পাঁচে নির্ধারিণ করেন, তবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব ঠিকই বহাল রাখেন।

এই ঘটনার পর্যালোচনা করে ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে সলাতকে পাঁচ ওয়াক্তে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল এবং আমাদের জীবনে সলাতের প্রকৃত গুরুত্ব ও অবস্থান তুলে ধরতেই এমনটি করা হয়েছে। সত্যি সত্যি দিনে পঞ্চাশ বার সলাত আদায়ের দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন। সলাত আদায় ছাড়া আমরা কি অন্য কিছু করতে পারতাম? উত্তর হলোঃ না।

আর সেটাই হলো আসল কথা (যেদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই)[৩৭]। আমাদের জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা আছে কি? প্রকারান্তরে যেন একথাই বলা হচ্ছেঃ সলাতই আমাদের প্রকৃত জীবন, আর বাদবাকি যা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে পূর্ণ করি, সেসবই কেবল আনুষঙ্গিক।

তা সত্ত্বেও আমরা ঠিক এর বিপরীত তরিকায় জীবন যাপন করি। সলাত তো এমন জিনিস, যা খুব কষ্টে-সৃষ্টে আমাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করি; যখন সময় পাই – যদি তা পাই। আমাদের জীবন সলাতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না; বরং সলাতই আমাদের 'জীবনের' আশেপাশে ঘুরপাক খায়। যদি আমরা শ্রেণিকক্ষে থাকি, তবে সলাতের চিন্তা মাথায়ই আসে না – আসলেও ঘটনাচক্রে। যদি শপিংমলে থাকি, তবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্যের মূল্যছাড়ের চিন্তাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। [সামান্য] বাস্কেটবল (অথবা ফুটবল বা ক্রিকেট) খেলা দেখার জন্য আমরা যদি নিজেদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে (অর্থাৎ মাথাকেই) ভুলে যাই তখন বুঝতে হবে, কোথাও না কোথাও মারাত্মক রকমের সমস্যা রয়েছে।

এতো তো গেল তাদের কথা, যারা কোনো রকম সলাত আদায় করেন। কিন্তু এমনও মানুষ আছে, যারা নিজেদের জীবনের এই উদ্দেশ্য (তথা সলাতকে) কেবল দূরেই নিক্ষেপ করেনি, বরং একে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে। অথচ সলাত পরিত্যাগ করার বিষয়ে যে কথাটি আমরা বিবেচনার না, তা হলোঃ যিনা বা ব্যাভিচার করলে কেউ কাফির হয়ে যায়, এই মত কোনো ইসলামি চিন্তাবিদ কখনো পোষণ করেননি। চুরি করলে, মদ পান করলে বা মাদক গ্রহণ করলে কেউ কাফিরে পরিণত হবে, এমন মত কখনো কোনো ইসলামি স্কলার পোষণ করেননি। খুন করলে কেউ অমুসলিম হয়ে যায়, কোনো আলেম কখনো এরকম দাবি করেননি। কিন্তু সলাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে কিছু আলেমের মত হলো, সে আর মুসলিম থাকে না। নিম্নের হাদিসটির মতো কিছু হাদিসের ওপর ভিত্তি করে এ মতটি প্রতিষ্ঠিতঃ

> "সলাতই আমাদের ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্য রেখা। তাই যে এটা পরিত্যাগ করে, সে কাফিরে পরিণত হয়।" [আহমদ][৩৮]

[৩৭] – (সম্পাদক)।

[৩৮] নিম্নের হাদিসটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্যঃ "বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলোঃ সলাত পরিত্যাগ করা।" (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান –*১ম খণ্ড*, *হাদিস নং: ১৪৯*, *হাদিস একাডেমী প্রকাশিত*)।

একটা কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে নবি (ﷺ) সেটার ব্যাপারে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেন। শয়তান কি অপরাধ করেছিল, সেটা একবার ভাবুন তো। সে তো আল্লাহকে মানতে অস্বীকার করেনি। সে তো শুধু একটি সেজদা দিতেই অস্বীকার করেছিল। তাহলে ভেবে দেখুন তো, আমরা যে হাজারো সেজদা দিতে অস্বীকৃতি জানাই, তার কি পরিণতি হবে।

এই অস্বীকৃতির ভয়াবহতা একবার কল্পনা করুন। তারপরও চিন্তা করে দেখুন আমরা সলাতের বিষয়টি কত হালকাভাবেই না গ্রহণ করি। বিচার দিবসে প্রথম যে জিনিস সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তা হচ্ছেঃ সলাত, তথাপি সলাত আমাদের কাছে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়। নবি (ﷺ) বলেনঃ

> "পুনরুত্থান দিবসে বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি ঠিক মতো সলাত আদায় হয়ে থাকে, তবে সে সাফল্য ও নাজাত লাভ করবে। কিন্তু এতে যদি তার ঘাটতি থাকে তবে সে ব্যর্থ হবে এবং সে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে শামিল হবে।" [তিরমিযি, হাদিস নং ২৪৯]

ওই দিন জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীদের প্রশ্ন করবেন, কেন তারা এ আগুনে প্রবেশ করেছে। আর কুরআন আমাদের জানিয়ে দিয়েছে তাদের সর্বপ্রথম জবাব কি হবেঃ "কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবেঃ আমরা সলাত আদায়কারী ছিলাম না।" (কুরআন, ৭৪:৪২-৪৩)

আমাদের মাঝে কতজন ওইসব লোকের মধ্যে শামিল হবে, যারা বলবে, "আমরা সলাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না অথবা আমরা ঠিক সময়ে সলাত আদায়কারীদের মধ্যে ছিলাম না অথবা আমরা ওইসব লোকের দলে শামিল নই, যারা সলাতকে তাদের জীবনের সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতো?" ব্যাপারটা কেমন, আমরা যদি ক্লাসে থাকি কিংবা কর্মক্ষেত্রে অথবা ফজরের সময়ে অসারের মতো ঘুমিয়ে থাকি, তথাপি আমাদেরকে শৌচাগার [বা ওয়াশরুমে] যাওয়ার প্রয়োজন হলে, তার জন্য আমরা ঠিকই সময় বের করে ফেলি? আসলে এই প্রশ্নটি অবান্তর শুনায়। এর জন্য সময় বের না করার বিষয়টি আমরা বিবেচনাই করতে পারি না। এমনকি জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে অংশ নেওয়ার সময়ও যখনই (টয়লেটে) যাবার সময় হয়, তখন তাতে আমরা যাবোই। কেন? কারণ তাতে সাড়া না দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী লজ্জাকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিণতিই একে একটা অনৈচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করে।

এমন বহু মানুষ আছেন, যারা বলেন, যখন তারা কর্মক্ষেত্রে বা বিদ্যালয়ে কিংবা ঘরের বাহিরে থাকেন, তখন সলাত আদায় করার সময় তারা পান না। কিন্তু আমাদের মাঝে ক'জন কখনো এই কথা বলেছেন যে, যখন তারা বাহিরে থাকেন

অথবা কাজে থাকেন অথবা বিদ্যালয়ে থাকেন, তখন শৌচাগারে যাওয়ার সময় তাদের থাকে না, তাই তারা ডাইপার পরাই পছন্দ করেন (এবং তাতেই তাদের প্রয়োজন সারেন)? ক'জন আছেন, যারা ফজরের সময় ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও ঘুম ভেঙে উঠতে চাই না, বরং তার বদলে বিছানা নষ্ট করতে পছন্দ করি? বাস্তবতা হচ্ছে, বিছানা ছেড়ে আমরা সবাই উঠি অথবা শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করি অথবা কাজ রেখে ঠিকই আমরা শৌচাগারে যেতে পারলেও [দুঃখজনকভাবে] আমরা সলাত আদায়ের জন্য সময় করতে পারি না।

বিষয়টা হাস্যকর শুনালেও, বাস্তবতা হচ্ছে আমরা আমাদের দেহের বা শরীরী চাহিদাকে আমরা নিজেদের আত্মার চাহিদার উপরে স্থান দেই। আমরা আমাদের শরীরকে খাওয়াই। কেননা, এমনটি না করলে আমরা মারা পড়বো। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন বহু লোক আছে, যারা আত্মাকে অনাহারে রাখে এবং এ কথা একেবারে ভুলে যায় যে, সলাত আদায় না করলে, আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের এত যত্নের এই শরীরের স্থায়িত্ব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, অন্যদিকে আমাদের অবহেলার পাত্র আমাদের আত্মা, যার স্থায়িত্ব চিরকালের।

সলাত এবং নিকৃষ্টতম চুরি

সত্য-সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো, পাওয়ার পর তা হারিয়ে ফেলা। বিচ্যুত হওয়ার অসংখ্য পথ রয়েছে, নিজের দ্বীন [বা ধর্ম] থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছুই হতে পারে না। কখনো কোনো বোন তার হিজাব খুলে ফেলে ভিন্ন ধরনের জীবন বেছে নেয়, আবার কখনো কোনো ভাই, যে সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশ সক্রিয় ছিল, সে ভুল লোকদের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু এরকম প্রতিটি গল্পেই সর্বোপরি কোনো না কোনোভাবে, কোথাও না কোথাও আমাদের ভাই ও বোনেরা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে বহু দূরে চলে যান।

দুঃখজনক হলেও এই গল্পগুলো একেবারেই বিরল নয়। কখনো কখনো তাদের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না যে, কেন এমন হলো? কিভাবে হলো? একথা ভেবে আমাদের অবাক লাগে যে, কিভাবে এরকম একটা মানুষ, যে দ্বীনের ওপর এতো মজবুত ছিল, সে আজ সেখান থেকে এতো দূরে সরে যেতে পারলো।

এ নিয়ে অবাক হওয়ার সময় প্রায়শই আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে, আমাদের ভাবনার চেয়েও এসব প্রশ্নের উত্তর বেশ সহজ ও সরল। মানুষ নানা ধরনের পাপে লিপ্ত হয়, কিন্তু এসব মানুষের অধিকাংশের মধ্যেই একটি কমন (*Common*) পাপ দেখা যায়। যে ব্যক্তি পাপে পূর্ণ জীবন যাপন করে, তার মাঝে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। ওই ব্যক্তি কখনো সরল পথে ছিল, পরবর্তীতে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়েছে অথবা কখনোই সে সরল পথে ছিল না, যেটাই হোক না কেন, একটি বিষয় উভয় ক্ষেত্রে একই রকম। ওই ব্যক্তি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আগে সর্বপ্রথম সলাতকে পরিত্যাগ করে, হালকা হিসেবে গ্রহণ করে, অবহেলা করে কিংবা সলাতকে অবজ্ঞা করে।

কেউ যদি সলাত আদায় করে, তথাপি সে পাপাচারে পূর্ণ জীবন অব্যাহত রাখে, তাহলে সে সলাত শুধুই শারীরিক কিছু কাজই থেকে যাচ্ছে, তাতে প্রাণ বা আত্মা নেই। লক্ষ্য করবেন, সলাতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট রয়েছে, প্রায়শই যা উপেক্ষা করা হয়। আমাদের স্রষ্টার সাথে এক পবিত্র সাক্ষাতের পাশাপাশি সলাত সর্বাপেক্ষা বাস্তব এক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আল্লাহ বলেনঃ

"তুমি পাঠ করো কিতাব হতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়ে এভং সলাত কায়েম করো। সলাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বোত্তম। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।" (কুরআন, ২৯:৪৫)

যখন কেউ সলাত পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা একই সাথে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও বর্জন করে। এটা স্মরণে রাখা জরুরি যে, সলাত পরিত্যাগের এই অভ্যাস একদিনে হয় না, বরং তা তৈরি হয় ধাপে ধাপে। নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে দেরী করে সলাত আদায়ের মাধ্যমে তা শুরু হয়। এরপর এক সলাতের সাথে আরেক সলাত মিলিয়ে পড়া শুরু হয়। শীঘ্রই সলাত একেবারেই বাদ পড়তে শুরু করে। কোনো কিছু বুঝার আগেই, ওই ব্যক্তির জন্য সলাত পরিত্যাগ একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়।

এদিকে চোখে দেখা গেলেও এ সময় আরেকটি ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রতিটি দেরী করে আদায় করা সলাত বা প্রতিটি ছেড়ে দেওয়া সলাতের সাথে সাথে শুরু হ এক অদৃশ্য লড়াই, শুরু হয় শয়তানের লড়াই। সলাত পরিত্যাগের মাধ্যমে মা আল্লাহর দেওয়া সুরক্ষা বর্ম ফেলে দেয় এবং কোনো নিরাপত্তা বর্ম ছাড়াই তারা যুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শয়তানের হাতে চ যায়।

এই বাস্তবতা প্রসংগে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"আর যে দয়াময় আল্লাহর যিকির বা স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সাথি।" (কুরআন, ৪৩:৩৬)

অতএব, এ ব্যাপারে কারো অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সলাত পরিত্যাগ করাই হয় অধঃপতিত জীবনের সিঁড়ির প্রথম ধাপ। যারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রয়োজন পেছনে ফিরে দেখা, ফিরে দেখা দরকার কোথা থেকে তাদের এই অধঃপতনের সূচনা হয়েছিল। তাহলে তারা দেখবে যে, এর শুরু হয়েছিল সলাত হতে (অর্থাৎ সলাতের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা থেকে)। একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও সত্য। যারা নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করতে আগ্রহী, তাদের এ কাজও শুরু হয় সলাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং যথাযথ হক আদায় করে তা সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। যখন আপনি বিদ্যালয়, রিজিকের ধান্দা, বিনোদন,

সামাজিক কর্মকাণ্ড, বাজার করা, টিভি দেখা, খেলাধুলা থেকে শুরু করে সবকিছুর ওপর সলাতকে প্রাধান্য দেবেন, কেবল তখনই আপনি পারবেন আপনার জীবনের গতিধারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলাতে।

বাস্তবতার নির্মম পরিহাস হচ্ছে, অনেক লোকই একথা মনে করে প্রতারিত হন যে, সলাত শুরুর আগে প্রথমে তার নিজের জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নিতে হবে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শয়তানের এক বড় ভয়ংকর কৌশল। কেননা, সে জানে, ওই ব্যক্তির জীবনধারাকে বদলে দেওয়ার চালিকাশক্তি ও দিক-নির্দেশনা দেবে সলাতই। এমন লোকের উপমা ওই গাড়ি চালকের মতো, যার গাড়িতে কোনো গ্যাস বা প্রেট্রোল নেই, কিন্তু কোনো রকম জ্বালানী সংগ্রহের আগে তার সফর শেষ করা জন্য জিদ করছে। ওই ব্যক্তি কোথাও যেতে পারবে না। একইভাবে উল্লিখিত মনোভাবের লোকেরা বছরের পর বছর একই অবস্থানে পড়ে থাকে। সলাত আদায় করে না, আর তার জীবনেরও কোনো পরিবর্তন হয় না। শয়তান তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং সে তাতে জয়ী হয়েছে।

এমনটি করার মাধ্যমে আমরা শয়তানকে আমাদের কাছে তা-ই চুরি করার সুযোগ দিই, যা অমূল্য। আমাদের ঘরবাড়ি এবং আমাদের গাড়ি আমাদের কাছে এতটাই মূল্যবান যে, আমরা সেগুলোকে কখনো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার চিন্তাও করি না। তাই সেগুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আমরা শত শত ডলার খরচ করি। আর সেই আমরাই আবার নিজেদের দ্বীন [বা ধর্মকে] একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখি, যাতে করে সব থেকে নিকৃষ্ট চোর যাতে সেটা চুরি করতে পারে। সেই চোর যে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে এসেছে যে, কিয়ামত-তক সে আমাদের সাথে দুশমনীই করে যাবে। সে এমন চোর যে, কেবল মার্সিডিস চিহ্নিত, ধাতু নির্মিত কোনো বস্তুগত জিনিসই মাত্র (যেমনঃ গাড়ি) চুরি করছে না। বরং সে এমন এক চোর যে চুরি করছে আমাদের অনন্ত আত্মা এবং জান্নাতে যাওয়ার চিরস্থায়ী টিকেটখানি।

একটি পবিত্র সংলাপ

রাতের বেলায় একটি সময় আছে, গোটা দুনিয়া যখন রূপান্তরিত হয়। দিনের বেলায় নানা ঝুট ঝামেলা প্রায়শই আমাদের জীবনকে গ্রাস করে রাখে। কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব, শিক্ষাঙ্গন এবং পরিবারের গুরু দায়িত্ব আমাদের মনোযোগের বড় একটা অংশ দখল করে নেয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের সময় ছাড়া চিন্তা, ভাবনা করা, এমনকি স্বস্তিতে দম ফেলার সময়টুকু বের করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের অনেকে এতো গতিময় জীবন কাটায় যে, জীবনে তারা কিসের অভাব বোধ করেন, সেটা পর্যন্ত ধরতে তারা অক্ষম।

তথাপি রাতের বেলায় একটি সময় থাকে, যখন কাজকর্ম শেষ হয়, যান চলাচল থেমে যায় এবং নিঃশব্দতা তখন একমাত্র আওয়াজ। ঠিক এই সময়টিতে গোটা দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এমন একজন আছেন, সদাজাগ্রত যিনি এবং অপেক্ষায় থাকেন, কখন আমরা তাঁকে আহ্বান করি। একটি হাদিসে কুদসিতে আমাদেরকে বলা হয়ঃ "আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াং আমাদের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেনঃ "কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারি? কেউ কি আছো, আমার কাছে চাইবে, যাতে আমি তাকে দান করতে পারি? কেউ কি আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?" [বুখারি ও মুসলিম]

এটা কেবল কল্পনাই করা যায় যে, একজন রাজা আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়ে আমরা যাই চাই, তা দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। এ অবস্থায় আমাদের আচরণ চিন্তা করুন। যে কেউই উপলব্ধি করবে যে, যেকোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এমন একটা সাক্ষাতের জন্য অন্ততঃপক্ষে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবে। আমাদেরকে যদি বলা হয়, ভোর হওয়ার ঠিক ঘন্টাখানেক বাড়ির দরজায় ১০,০০০,০০০ (এক কোটি) ডলারের একটি চেক আমাদের জন্য রাখা হবে, তবে আমরা কি সেটা সংগ্রহের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হতাম না?

মহান আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তা'আলা* আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, ভোর হওয়ার ঠিক আগে রাতের এই সময়টিতে তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন।

বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন তো। গোটা বিশ্ব জাহানের প্রভু আমাদেরকে তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য আহ্বান করছেন। এই মহান প্রভু আমাদের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করেন। অথচ আমাদের অনেকেই তাঁকে অপেক্ষায় রেখে নিজ নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের নিকটবর্তী হন এবং আমরা তাঁর কাছে কি চাই, তিনি তা জানতে চান। সবকিছুর স্রষ্টা আমাদেরকে বলেন যে, আমরা যাই চাই না কেন, তিনি আমাদেরকে তাই দেবেন। তা সত্ত্বেও আমরা ঘুমে বিভোড়। এমন একটি দিন আসবে, যখন প্রবঞ্চনার এই পর্দা সরে যাবে। কুরআন বলেঃ "[তাদেরকে বলা হবে], আজকের এই দিন সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, আর এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, তাই আজকের এই দিনে তোমার দৃষ্টি প্রখর।" (কুরআন, ৫০:২২)

ওই দিনটিতে আমরা সত্যিকার বাস্তবতা দেখতে পাবো। ওই দিন আমরা ঠিকই উপলব্ধি করবো যে, দু'রাকাত সলাত আসমান ও জমিনের সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। প্রতিরাতে আমরা যখন ঘুমে বিভোড়, তখন আমাদের বাড়ির দরজার সামনে যে অমূল্য চেক ফেলে রাখা হতো, ওই দিন আমরা ঠিকই এটা বুঝতে পারবো। এমন একটি দিন আসবে, যখন আমরা কেবল দুনিয়াতে ফেরৎ আসা এবং ওই দু'রাকাত সলাত আদায় করার জন্য আসমানের নিচে সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে রাজি থাকবো।

এমন একটি দিন আসবে, যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওই কথোপকথনের জন্য এই দুনিয়াতে নিজেদের ভালোবাসার সবকিছু, আমাদের অন্তর ও মনকে আচ্ছন্ন করা সবকিছু এবং প্রতিটি মরীচিকা, যার পেছনে আমরা হন্যে হয়ে ছুটেছি, সেগুলোর সবই আমরা ত্যাগ করতে চাইবো। ওই দিন, কিছু লোক থেকে আল্লাহ (ﷻ) তাঁর [দৃষ্টি] ফিরিয়ে নেবেন ... এবং তাদেরকে ভুলে যাবেন, যেমনিভাবে একদিন তারাও আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। কুরআন বলেঃ "সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে ওঠালে? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান? তিনি বলবেন, 'এই রকমই আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আর সেইভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।'" (কুরআন, ২০:১২৫-১২৬)

অন্যদিকে সুরা আল-মুমিনুনে আল্লাহ বলেনঃ

"আজ আর্তনাদ করো না, নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে তোমরা কোনো সাহায্য পাবে না।" (কুরআন, ২৩:৬৫)

এক মুহূর্তের জন্য কি আপনি চিন্তা করতে পারেন, এ আয়াতগুলো কি বলছে? পুরাতন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী আপনাকে ভুলে গেছে, এটা তেমন কোনো

ব্যাপার নয়। এটা তো জগতসমূহের রব তথা প্রভু আপনাকে ভুলে গেছেন। না জাহান্নামের আগুন, না ফুটন্ত পানি, আর না দগ্ধ চামড়া কোনো কিছুই এই আযাবের থেকে ভয়াবহ হতে পারে না।

যেমনিভাবে এর থেকে ভয়াবহ আর কোনো শাস্তি হতে পারে না, ঠিক তেমনি নবি (ﷺ) থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হাদিসে বর্ণিত পুরষ্কারের চেয়ে বড় কোনো পুরষ্কার হতে পারে নাঃ

> "জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি চাও আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিই?' তারা বলবে, 'আপনি কি আমাদের চেহারাগুলি আলোকজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি? রসুল (ﷺ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পর্দা বা আবরণ তুলে নেবেন। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা-এর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই তাদের দেওয়া হয়নি।" [সহিহ মুসলিম][৩৯]

তদপুরি, আল্লাহ (ﷻ)-এর সাথে রাত্রিকালীন এই সাক্ষাতের ফল কেমন, সেটা জানার জন্য কাউকে ওই দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় কাটাতে হবে না। সত্য বলতে কি, এরূপ কথোপকথনের মাঝে কি যে অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি নিহিত রয়েছে, ত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অনুভব করা ছাড়া একে উপলব্ধি করার অন্য কো পথ নেই। একজনের জীবনে এমন অনুভূতির প্রভাব সীমাহীন। শেষরাতে যদি আপ কিয়াম তথা তাহাজ্জুদের স্বাদ নেন, দেখবেন আপনার বাকি জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। হঠাৎ করেই, যে বোঝার ভার আপনাকে নুইয়ে দিতো, তা পরিণত হবে নুরে। যেসব সমস্যা সমাধান ছিল অসম্ভব, সেগুলির সমাধান হবে। আপনার স্রষ্টার সাথে যে নৈকট্য এক সময় ছিল কল্পনাতীত, তা-ই পরিণত হবে আপনার একমাত্র লাইফ লাইনে[৪০]।

[৩৯] সহিহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং– ৩৩৮, হাদিস একাডেমি প্রকাশিত।

[৪০] লাইফ লাইন: যার ওপর একজনের জীবন নির্ভর করে –(সম্পাদক)।

অন্ধকার সময় এবং আসন্ন প্রভাত

একটি বিখ্যাত প্রবাদ অনুসারে, ভোরের পূর্ব মুহূর্তেই অন্ধকার সবচেয়ে গভীরতম হয়। জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে যদিও রাতের সবচেয়ে গভীর বিন্দু আরও আগেই হয়ে থাকে, তথাপি এই প্রবাদের সত্যতা রূপকধর্মী, আর কোনোভাবেই তা বাস্তব অবস্থা থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

অনেক সময়ই, আমাদের জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ের পর পরই আমরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ের সাক্ষাত লাভ করি। প্রায়শই, এ রকম এক সময়, যখন সবকিছুই বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত মনে হয়, তখন সবচেয়ে কম প্রত্যাশার বিষয়ই আমাদের টেনে তোলে এবং এই কঠিন সময় পাড়ি দিতে আমাদের সাহায্য করে। নবি আইয়্যুব (*আলাইহিস সালাম*) কি প্রথমে একে একে সব হারালেন না, অতঃপর তাকে আবার সব ফিরিয়ে দেওয়া হল, বরং আরও অধিক দেওয়া হলো?

হ্যাঁ, নবি আইয়্যুব (*আলাইহিস সালাম*)-এর জন্য ওই আঁধার ঘন রাত্রি সত্য ছিল। আমাদের অনেকের নিকট এই আঁধার ঘন রাত্রির যেন কোনো শেষ নেই। কিন্তু আল্লাহ কখনো রাত্রিকে চিরকালের জন্য দীর্ঘায়িত করেন না। তাঁর অপার করুণাতে তিনি আমাদেরকে সূর্যের আলো দিয়ে ধন্য করেন। তথাপি এমনও সময় যায়, যখন আমাদের মনে হয়, এই কষ্ট ও দুর্ভোগের বুঝি আর শেষ নেই। আর আমাদের অনেকেই দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে এতটাই রুহানি বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত যে, আমরা নিজেদেরকে স্রষ্টার কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শুরু করি। আমাদের অনেকেই আবার এতটাই (রুহানি) অন্ধকারে ডুবে আছে যে, তারা এটা উপলব্ধিই করতে পারে না।

কিন্তু রাতের শেষে যেমনিভাবে সূর্য উদিত হয় হয়, তেমনিভাবে আমাদের প্রভাতও এসে গেছে। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকার মুছে দেওয়ার জন্য রমজানের আলো প্রেরণ করেছেন। তিনি দান করেছেন কুরআনের মাস, যাতে করে তিনি আমাদের (রুহানি) অবস্থা উন্নত করতে পারেন এবং আমাদেরকে আমাদের বিচ্ছিন্নতা থেকে বের করে তাঁর সান্নিধ্যে নিতে পারেন। আমাদের মাঝে বিরাজমান শূন্যতা পূরণের জন্য, আমাদের নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য এবং আমাদের রুহানি দারিদ্র্যের সমাপ্তি টানার জন্য তিনি এই বরকতময় মাস

আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। আমাদের নিকট তিনি পাঠিয়েছেন প্রভাতের আলো, যাতে করে আঁধার থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আলোর খোঁজ পেতে পারি। আল্লাহ বলেনঃ

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে আনার জন্য, আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

(কুরআন, ৩৩:৪৩)

যারাই এই রহমতের প্রত্যাশী তাদের সবার জন্যই আল্লাহ তা'আলার এই রহমত প্রসারিত। এমনকি ভয়ানক পাপীকেও আল্লাহর অসীম করুণা থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন"

"বলোঃ হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করেছো, তারা আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দিবেন। তিনিই অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(কুরআন, ৩৯:৫৩)

করুণা ও ক্ষমার মালিক আল্লাহ। বরকতময় রমজান ছাড়া এমন কোনো সময় নেই, যখন আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অপার করুণা এতো অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। রমজান প্রসঙ্গে নবি (ﷺ) বলেনঃ

রোজাকে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসার আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করবেন নাঃ

নবি (ﷺ) বলেনঃ

"(রোজা রেখে) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং খারাপ কাজ বর্জন করলো না, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" [বুখারি][৪০]

নবি (ﷺ) আমাদেরকে এই বলে সতর্ক করেছেনঃ

"বহু লোকই ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হওয়া ছাড়া রোজা থেকে কিছু হাসিল করে না এবং অনেক লোকই রাতের বেলাতে [সলাতে] দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু রাত্রি জাগরণ ছাড়া সে আর কিছুই পায় না।" [দারিমি]

রোজা অবস্থায় গোটা দৃশ্যপটটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, রোজা মানে কেবল খানা-পিনা থেকে দূরে থাকা নয়। রোজা তো রাখা হয় আরও উত্তম মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য।

এই প্রাণান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্ন থাকার অন্ধকার হতে বের হয়ে আসার সুযোগ প্রদান করা হয়। তবে দিন শেষে যেমন সূর্য অস্ত যায়, ঠিক তেমনি রমজান আসবে আবার চলে যাবে, কিন্তু আপনার আমার হৃদয়ে সে তার নিশানী রেখে যবে।

---

[৪০] *বুখারি, তাওহিদ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত, কিতাবুস সওম, হাদিস নংঃ ১৯০৩।*

আজও এক পুণ্যবানকে দাফন করে এলামঃ মৃত্যু নিয়ে গভীর ভাবনা

পুণ্যবান এক আত্মার দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে আমি প্রবন্ধটা আমার গাড়িতে বসে লিখি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা (ﷻ) তার ও তার পরিবারের রহম করুন। আমিন।

আজ একজনকে আমরা দাফন করলাম। আর এখন, জীবিতদের কাফেলার একজন সাথি হিসেবে আমি নিজ বাড়ির দিকে অন্ততঃ এখনকার মতো ছুটছি।

এখনকার সময়ের জন্য আমি ও আপনি জীবিতদের কাফেলাতে আছি। এটা এজন্য নয় যে, আমরা ভিন্ন কোনো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। এজন্য নয় যে, শুধু তারাই বিদায় নিচ্ছে, আর আমরা থেকে যাচ্ছি। বরং এর একমাত্র কারণ হলো, আমাদের কাফেলাটা পিছিয়ে আছে। এই মুহূর্তে আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরছি, ফিরে যাচ্ছি আমাদের বিছানা, টেলিভিশন, স্টেরিও সেটের কাছে। ফিরছি নিজেদের কর্মক্ষেত্রে, নিজেদের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, নিজেদের ফেসবুক ও জি-চ্যাটের কাছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ফিরছি নিজেদের উৎকণ্ঠা, নিজেদের ভালোবাসার বিষয় ও নিজেদের প্রবঞ্চক মায়াজালগুলির কাছে। কিন্তু বাস্তবতার মিল কেবল এটুকুর মধ্যেই। আসলে আমি তো আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি না, না আমি ফিরছি নিজের বিছানাতে, নিজের টেলিভিশন, নিজের স্টেরিও সেট, নিজের কর্মক্ষেত্র, নিজের পরীক্ষা, নিজের বন্ধু-বান্ধব, নিজের ফেসবুক ও জি-চ্যাটের কাছে। আমি আমার উৎকণ্ঠা, মোহ ও [কামনার] মূর্তির কাছেও ফিরে যাচ্ছি না। বরং আমি ফিরে যাচ্ছি সেখানে, যেখান থেকে আমি শুরু করেছি। আমি তো ওইখানে রওনা দিয়েছি, যেখানে ফিরে গেছেন ওই মৃত ব্যক্তি। সেই একই স্থানের দিকে আমি রওনা হয়েছি। আমি কেবল জানি না, কতটুকু সময় আমাকে চলতে হবে।

আমি ফিরে যাচ্ছি সেখানেই, যেখান থেকে আমার এ যাত্রা (দুনিয়ার জীবন) শুরু করেছিলাম – আল্লাহর দিকে। কেননা, আল্লাহই *'আল-আওয়াল'* (সূচনা) এবং আল্লাহই হলেন *'আল-আখির'* (সমাপ্তি)।

আমার দেহ আমাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। কেননা, বাহন ছাড়া তো এটা আর কিছুই নয়। যখন আমি সেখানে পৌঁছাবো, এই দেহ – এই শরীর পেছনে রয়ে যাবে। যেমনিভাবে ওই মৃত ব্যক্তি তার দেহ পেছনে রেখে গেছেন। আমার দেহ এসেছে মাটি থেকে, আবার সেই মাটিতেই ফিরবে এই দেহখানা, যেভাবে সে এসেছিল। এটা তো একটা খোলস, আমার আত্মাকে ধারণ করে রাখার আধার বা পাত্র, ক্ষণিকের সাথি মাত্র। কিন্তু যখন আমি গন্তব্যে পৌঁছাবো, তখন আমি তা এখানে রেখে যাবো। প্রকৃতপক্ষে এটা আগমন, বিদায় নয়। কারণ ওটাই (তথা আখিরাতই) আমার ঘর। এটা (অর্থাৎ দুনিয়া) নয়। ঠিক এই কারণে পুণ্যবান আত্মাকে যখন আল্লাহ (ﷻ) তাঁর পানে ফিরে যাওয়ার জন্য ডেকে পাঠান, তখন [ওই আত্মাকে] উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'ইরজি'ই': ফিরে এসো। (কুরআন, ৮৯:২৮)[৪৪]

ওই সুন্দর, পুণ্যবান আত্মা, যাকে আমরা দাফন করলাম, তিনি আজ জীবন থেকে বিদায় নেননি। তিনি তো জীবনের আরেক উচ্চ ধাপে এবং আল্লাহর তা'আলার ইচ্ছায় অধিকতর উত্তম এক ধাপে প্রবেশ করেছেন মাত্র। তিনি তার আপন গৃহে পৌঁছেছেন। যেহেতু তার দেহ দুনিয়ার মাটি দিয়ে তৈরি, তাই তাকে সে দেহ দুনিয়াতে রেখে যেতে হয়েছে। এই দেহ নিম্নতর জগতের, যে জগতে আমাদের খাওয়া ও ঘুমের প্রয়োজন হয়, যে জগতে আমরা রক্তাক্ত ও কান্নায় কাতর হই। অতঃপর মৃত্যুবরণ করি। ওদিকে আত্মা হলো উর্ধ্বতর জগতের। আত্মার চাহিদা ও প্রয়োজন কেবল একটাই এবং সেটা হলো: আল্লাহর সান্নিধ্য।

আর তাই, দেহ যখন কান্নায় শোকাতুর, রক্তে রঞ্জিত এবং বস্তুগত দুনিয়ার কষ্টে কাতর, তখন আত্মাকে এসব স্পর্শ করতে পারে না। আত্মাকে কেবল একটি জিনিসই পারে ক্ষতবিক্ষত করতে অথবা আঘাতে জর্জরিত করতে। একটি জিনিসই পারে আত্মাকে হত্যা করতে। তার সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করা মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের যে অপরিহার্য চাহিদা আত্মার মাঝে বিরাজমান, তা থেকে আত্মাকে বঞ্চিত করলেই (আত্মার মৃত্যু) ঘটে। আর তাই আত্মার এই গৃহে প্রত্যাবর্তনে আমাদের কাঁদা উচিত নয়, কারণ সে তো মরেনি। বরং আমাদের তো তার জন্য কাঁদা উচিত, যার দেহ তো জীবিত কিন্তু তার আত্মা মৃত্যুবরণ করেছে।

[৪৪] আয়াতের এই শব্দটির আরবি পাঠ এরূপ: ارْجِعِي

কারণ আত্মাকে যিনি জীবন দান করেন, সেই স্রষ্টা থেকে তার আত্মা দূরে সরে গিয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

এই কারণে ঈমানদার আত্মা দ্রুত গৃহ পানে ধাবিত হয়, এমনকি এই পার্থিব জীবনেও [সে গৃহে ফিরে]।

হে প্রভু, আমার আত্মাকে দান করো এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, নিজ সত্তার মাঝে এক সুরক্ষিত কেল্লা। যাতে করে কেউ ও কোনো কিছু এটাকে বিরক্ত না করে। প্রশান্তি, নীরবতা ও নির্মলতায় পূর্ণ এক স্থান, যা বাহ্যিক দুনিয়ার স্পর্শ থেকে মুক্ত। আমাকে ওই আত্মার পরিণত করুন, যাঁকে আল্লাহ (ﷻ) 'আন-নাফস আল-মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত আত্মা) বলে অভিহিত করেছেন যে, (পূণ্যবান) আত্মাকে আল্লাহ (ﷻ) এভাবে আহ্বান করবেনঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"

(কুরআন, ৮৯:২৭-৩০)

আমার দু'আগুলি কবুল হচ্ছে না কেন?

প্রশ্নঃ আমার দু'আগুলি কবুল হচ্ছে না কেন?

উত্তরঃ এমন একটা আন্তরিক প্রশ্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পুরস্কৃত করুন এবং তিনি আপনাকে সত্যের দিকে হেদায়েত করুন। *আমিন।*

আমি মনে করি, এমন পরিস্থিতিতে যা হয়, তা হলো, আমরা আমাদের উপায়-উপকরণ বা মাধ্যমের সাথে আমাদের লক্ষ্যকে মিলিয়ে ফেলি। উদাহরণস্বরূপ যখন আমরা ভালো স্বামী (বা স্ত্রী) পাওয়ার জন্য দু'আ করি, তখন আমরা কি ভালো বিয়েকে একটি মাধ্যম মনে করি, নাকি আমরা সেটাকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করি? আমার মতে, আমাদের অধিকাংশই এটাকে (জীবনের) লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি, যেটা বিবাহ পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট অধিকাংশ মোহভঙ্গ ও হতাশাকে ব্যাখ্যা করে (পরিহাসের বিষয় হলো, আমরা ভালো জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাই বা না পাই, উভয়ক্ষেত্রেই আমরা আশাহত হতে পারি)। এই দুনিয়ার বাকি সবকিছুর মতোই বিয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের একটি মাধ্যম মাত্র। তাই আমরা যে ভালো জীবন সঙ্গীর জন্য দু'আ করছি, আর সেটা যদি আমরা না পাই, তাহলে সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য অপর একটি মাধ্যম ঠিক করে রেখেছেন। সম্ভবতঃ কষ্টের মাধ্যমে আমাদের মাঝে পরিশুদ্ধি ও সব্‌র (ধৈর্যের) মতো গুণের সৃষ্টি করবে। আর সেটাই আমাদেরকে আমাদের মূল লক্ষ্য তথা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন, হতে পারে এই যে ভালো জীবন সঙ্গীর জন্য আমাদের যে দু'আ, তা যদি তিনি আমাদের দিয়ে দিতেন, তাহলে তা আমাদের (আল্লাহর ব্যাপারে) গাফেল করে তুলতো এবং পরিণামে আমরা আমাদের যে মূল লক্ষ্য (তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি), তাতে একেবারেই উপনীত হতে পারতাম না।

যাহেক, বিষয়টি এভাবে না দেখে, আমার ধারণা, বিপরীতভাবে দেখা আমাদের যাবতীয় সমস্যার কারণ। (আমাদের অবস্থা এমন যে) দুনিয়ায় আমাদের চাহিদাগুলি (তথা ভালো চাকুরি, নির্দিষ্ট ধরনের স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান লাভ করা, বিদ্যালয়, ক্যারিয়ার ইত্যাদি) হচ্ছে আমাদের সমাপ্তি এবং এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম হলেন **'আল্লাহ'**। (এই দুনিয়ার জিনিসগুলো পাবার জন্য আমরা যে দু'আই করি না কেন), বস্তুত এসব দু'আর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ [আল্লাহ

নামক] এই 'মাধ্যমকে' ব্যবহার করে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল করা। এরপর আমাদের মাধ্যম (আল্লাহ) যখন আমাদের অনুকূলে ফয়সালা দেন না, তখন নিদারুন হতাশা আমাদেরকে ভর করে। আকাশের দিকে হাত তুলে আমরা অভিযোগ করতে থাকি যে, আমাদের দু'আ কবুল হচ্ছে না। আমাদের মাধ্যম আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলো না!

কিন্তু, আল্লাহ তো কোনো মাধ্যম নন। তিনি সবকিছুর মূল লক্ষ্য। এই যে দু'আ, সেটারও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করা। দু'আর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হই। তাই আমার মতে, আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতেই সকল সমস্যা নিহিত। এজন্য 'ইস্তিখারার' দু'আকে আমি এতো ভালোবাসি। এটা যথার্থ এক দু'আ। এই দু'আর মধ্যে ঘোষণা করা হয় যে, সবকিছু আল্লাহই ভালো জানেন এবং অতঃপর যা সর্বোত্তম, তা দান করার এবং যা অকল্যাণকর, তা দূর করার আর্জি এই দু'আতে পেশ করা হয়। আপনি যা চাইছেন, সেটা এই দু'আর মূল বিষয় নয়, বরং যা এই দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য সর্বোত্তম, সেটাই এই দু'আর মূল বিষয়। এর মানে এটা নয় যে, আমরা নির্দিষ্ট কোনো জিনিসের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পারবো না। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাঁর কাছে চাওয়াকে ভীষণ পছন্দ করেন।

এর তাৎপর্য হলো, আমরা আমাদের হৃদয়-মন উজাড় করে আল্লাহর কাছে চাইবো এবং আল্লাহ আমাদের জন্য যা পছন্দ করবেন, তাতে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকবো। আর আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা সব দু'আই কবুল করেন, তবে সব সময় আমরা যেভাবে চাই, সেভাবে নয়। আর তা কেবল এজন্যই যে, আমাদের জ্ঞান সীমিত, আর তাঁর জ্ঞান অসীম। তাঁর অসীম জ্ঞানে তিনি আমাদের জন্য তা-ই কবুল করেন, যা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা "আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ", তাতে উপনীত হওয়ার জন্য বেশি উপযোগী হবে।

ওয়াল্লাহু আ'লামু (আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন)।

ফেসবুক: লুকানো বিপদ

আমরা এক *iWorld*-এ বাস করছি। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে *iPhone, ipad, MYspace, YouTube* এবং এসবের ফোকাস [বা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুও] বেশ পরিষ্কার: আমি, আমাকে, আমার (*Me, My, I*)। আমিত্বের এই যে সীমাহীন মোহ, তা দেখার জন্য কারো বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিক্রি বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোকে মানুষের আমিত্বের (*Ego*) নিকট আহ্বান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন অনেক বিজ্ঞাপন আছে, যেগুলো আমাদের প্রবৃত্তির ওই অংশগুলির নিকট আবেদন করে, যেগুলি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভালোবাসে। *Direct TV* আপনাকে বলে: "*Don't watch TV, direct TV!*" এদিকে *Yougurtland* বলে: "সিদ্ধান্ত আপনারই! স্বাগতম আপনাকে দই জাতীয় রেসিপির সীমাহীন সম্ভাবনার ভূমিতে, যেখানে আপনার বরাদ্দ, পছন্দ ও পরিবেশের ওপর কর্তৃত্ব আপনারই।"

শুধু বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিই আমাদের ইগোর নিকট আবেদন জানাচ্ছে বিষয়টি এমন নয়। বরং বৈশ্বিক এক বিস্ময়কর জিনিস আমাদের ইগো বা আমিত্বের চর্চা ও বিকাশের জন্য এক আঁতুড় ঘর (*Breeding Ground*) এবং মঞ্চ বা প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার নাম হলো: ফেসবুক। এমতাবস্থায়, আমি সর্বাগ্রে এ বিষয়টির স্বীকৃতি দেবো যে, ভালো কাজ ও কল্যাণের পথে চলার জন্য ফেসবুক একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। অন্য যেকোনো কিছুর মতো, এটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করেন, তার ওপর। ক্ষুধার্তকে পরিবেশনের জন্য খাবার কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি ব্যবহৃত হতে পারে, আবার কাউকে খুন করার জন্যও ছুরি ব্যবহার করা যায়। ফেসবুক বৃহত্তর কল্যাণের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। সর্বোপরি এক স্বৈরশাসকের ক্ষমতা উপড়ে দিতে ফেসবুকের সহায়ক ভূমিকা ঠিকই আমরা দেখেছি। লোকজনকে সংঘবদ্ধ করা, ডাকা, তাগিদ দেওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ করার মতো কাজে ফেসবুক এক শক্তিশালী হাতিয়ারের হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করা এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ জোরদার করার কাজে ফেসবুক ব্যবহৃত হতে পারে ... অথবা এই ফেসবুকই আমাদের ওপর আমাদের নফসের (তথা নিম্নতর সত্তা বা ইগোর) নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফেসবুকের এমন বিস্ময়কর প্রসার সত্যই এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা ইগো আছে। এটা আমাদের সত্তার এমন একটি অংশ, যেটাকে দমিয়ে রাখা আবশ্যক (যদি না *এনাকিনের*[৮৫] মতো পুরোপুরি মন্দ আত্মাতে পরিণত হতে না চাই)। ইগোকে তার ইচ্ছামত চলার সুযোগ দিয়ে তাকে প্রতিপালন করার বিপদ হচ্ছে, যতই আপনি একে পরিপুষ্ট করবেন, এটা ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর এটা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে, তখন তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। শীঘ্রই আমরা আর আল্লাহর গোলাম না থেকে বরং আমাদের প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হই।

ইগো আমাদের সত্তার এমন এক অংশ, যা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভালোবাসে। এটা ভালোবাসে দৃশ্যপটে থাকতে, স্বীকৃতি লাভ করতে, প্রশংসিত হতে এবং সকলের আরাধ্য ও কাঙ্ক্ষিত হতে। এদিকে ফেসবুক ইগোর এই কামনা পূরণের এক শক্তিশালী প্লাটফর্ম দেয়। এটা এমন এক প্লাটফর্ম দেয়, যেখানে আমার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছবি বা আমার প্রতিটি ভাবনা ও চিন্তা দৃশ্যমান হতে পারে, হতে পারে সবার দ্বারা প্রশংসিত এবং সকলের 'পছন্দকৃত' [*Liked*]। ফলশ্রুতিতে আমিও এগুলোর পেছনে ছুটতে শুরু করি। কিন্তু তখন এগুলো আর সাইবার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এমনকি আমি আমার জীবনও এই দৃষ্টিগোচরতার মধ্যে কাটাতে শুরু করি। সহসাই আমি এমনভাবে জীবন যাপন করতে থাকি যেন আমার প্রতিটি অভিজ্ঞতা, আমার প্রতিটি ছবি, আমার প্রতিটি চিন্তাকে কেউ না কেউ দেখছে। কেননা, আমার ধ্যানে-খেয়ালে কেবল একথা ঘুরছে যে, "আমি এটা ফেসবুকে আপলোড করবো।" এ মানসিকতা অদ্ভূত এক অবস্থার জন্ম দেয়। যেন একটা সার্বক্ষণিক অনুভূতি যে, আমার জীবনটা সব সময় ডিসপ্লে হচ্ছে। লোকজন আমায় দেখছে, সে ব্যাপারে আমি বেশ সচেতন হয়ে উঠি। কেননা, ফেসবুকে সবকিছুই আপলোড করা যায়, যা অন্যরা দেখতে ও কমেন্ট করতে পারে।

[৮৫] এনাকিন – বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর 'স্টার ওয়ার্স' খ্যাত এক কাল্পনিক মুভির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রাথমিক অবস্থায় সে ভালোর পক্ষে থাকলেও পরবর্তীতে নিজ ইগোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ খারাপ সত্তায় পরিণত হয়। লেখিকা মুভি প্রিয় পাশ্চাত্যবাসীর বুঝের জন্য – এ উদাহরণ টেনেছেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ –"ইবলিস"। নিজ ইগোকে প্রাধান্য দিয়ে সে চির নিকৃষ্ট ও বহিষ্কৃত হয় – (সম্পাদক)।

তদপুরি, এটা নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবাস্তব ও মেকি মনোভাব তৈরি করে, যেখানে আমি ভাবতে থাকি, আমার নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপই বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শীঘ্রই আমি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হই। পরিণত হই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুতে। আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – এটাই মুখ্য খবর। আমার জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের গুরুত্ব সীমাহীন। ফলে আরও শক্তিশালী "আমি কেন্দ্রীক" এক বিশ্ব তৈরি হয়, যেখানে আমিই সবকিছুর কেন্দ্র।

প্রকৃতপক্ষে, এই ফলাফল – সম্পূর্ণভাবে বাস্তব অবস্থার বিপরীত। আল্লাহর মহত্ত্ব ও বিশালতার সত্যতাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর সামনে নিজের অসহায়ত্ব ও প্রয়োজনের ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করাই জীবনের পরম লক্ষ্য। লক্ষ্য হলো নিজেকে সরিয়ে আল্লাহকে সমস্ত জিনিসের কেন্দ্রে বাসানো। কিন্তু ফেসবুক এটার ঠিক বিপরীত বিভ্রান্তিকে স্থায়ী করতে চায়। এটা আমার এ চিন্তাধারাকে জোরদার করে যে, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজ ও ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। সহসাই গুরুত্বপূর্ণ খবরে পরিণত হয়, কি দিয়ে সকালের নাস্তা করলাম কিংবা মুদি দোকান থেকে নতুন কি কিনে আনলাম, যা প্রকাশ করার মতো জরুরি হয়ে পড়ে। যখন আমি একটা ছবি আপলোড করি, তখন কেউ সেটাকে অভিনন্দন জানাবে, কেউ সেটা দেখবে এবং সেটাকে [লাইকের মাধ্যমে] স্বীকৃতি দেবে, এই অপেক্ষায় থাকি। লাইক বা কমেন্টের সংখ্যা দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য এখন সংখ্যায় প্রকাশ করা যাচ্ছে। যখন আমি কোনো পোস্ট আপলোড করি, তখন কেউ এটাকে 'লাইক' দেবে বলে অপেক্ষায় থাকি। (ফেসবুকে) আমার ক'জন 'বন্ধু' আছে, তা নিয়ে আমি সব সময় বেশ সচেতন, এমনকি তার সংখ্যা নিয়ে আমি প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হই (বন্ধু, উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে এটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা, ফেসবুকে তাদের তথাকথিত 'বন্ধু'দের শতকরা ৮০ ভাগকেই কেউ চিনেও না)।

আরও পাবার এই যে একাগ্রতা এবং প্রতিযোগিতা, কুরআনে সেটার উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

(কুরআন, ১০২:১)

ধনসম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রতিযোগিতা হোক কিংবা ফেসবুকে 'লাইক' বা বন্ধু সংগ্রহের প্রতিযোগিতা হোক, সবগুলোর ফলাফল একই। আর তা হচ্ছেঃ আমরা সেগুলো দ্বারা চরমভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছি।

ফেসবুক আরেকটা মারাত্মক বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আটকে রাখে, তা হলোঃ অন্যদের বিষয়ে আগ্রহ, তারা কি করছে, তারা কি পছন্দ করে। তারা আমার ব্যাপারে কি চিন্তা করে। অন্যরা আমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করে, ফেসবুক আমাকে এই চিন্তায় মশগুল রাখে। শীঘ্রই আমি সৃষ্ট বস্তুর কক্ষপথে পা বাড়াই। ওই কক্ষপথে আমার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমার সংজ্ঞাসমূহ, আমার দুঃখ-বেদনা, আমার সুখ-শান্তি, আমার আত্মমূল্যায়ন, আমার সফলতা ও আমার ব্যর্থতা সবই সৃষ্টবস্তু কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যখন আমি ওই কক্ষপথে বাস করি, তখন আমার উত্থান ও পতন নির্ভর করে সৃষ্টবস্তুর ওপর। লোকেরা যখন আমাকে নিয়ে খুশি, আমিও তখন উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত। যখন তারা আমায় নিয়ে অসুখী, তখন আমি একেবারে ভেঙে পড়ি। কোন বিষয়ে আমার অবস্থান কি, লোকেরাই সেটা নির্ধারণ করে। আমি যেন এক কয়েদি, কারণ আমি আমার সুখ, আমার দুঃখ ও বেদনা, আমার পূর্ণতা ও আমার হতাশার চাবিকাঠিগুলি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছি।

আল্লাহর কক্ষপথের পরিবর্তে যখন আমি সৃষ্টির কক্ষপথে প্রবেশ করি এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকি, তখন আমি সেখানকার কারেন্সি বা মুদ্রা ব্যবহার করতে শুরু করি। লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহর কক্ষপথে বিনিময় ব্যবস্থার ভিত্তি হলোঃ তাঁর সন্তুষ্টি কিংবা তাঁর অসন্তুষ্টি, তাঁর পুরস্কার কিংবা তাঁর শাস্তি। ওদিকে সৃষ্টির কক্ষপথের মুদ্রা বা বিনিময় ব্যবস্থা হচ্ছেঃ মানুষের প্রশংসা অথবা তাদের সমালোচনা। যতই আমি এই কক্ষপথের গভীরে থেকে গভীরে যেতে থাকি, ততই আমি এর লেনদেনের এই ব্যবস্থার প্রতি অধিকহারে আকৃষ্ট হতে থাকি এবং এসব হারানোর ভয় ও আশঙ্কা উত্তোরত্তর আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা "মনোপলি"[৪৬] খেলি, তখন আমি এর কারেন্সি (খেলনা হওয়া সত্ত্বেও) অধিক, আরও অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিছু সময়ের জন্য ধনী হতে (অন্ততঃ এ ধরনের অনুভূতি)[৪৭] ভালোই লাগে। কিন্তু খেলা শেষ হয়ে যাবার পরে "মনোপলি" খেলার খেলনা টাকা দিয়ে বাস্তব জগতের কিছু কি আমি কিনতে পারি?

[৪৬] "মনোপলি" (*Monopoly*) : লুডুর মতো এক ধরনের বোর্ড গেইম। যাতে অন্যদের হারিয়ে সবচেয়ে ধনী ও সম্পদশালী হওয়ার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা মত্ত হয় – (সম্পাদক)।

[৪৭] – (সম্পাদক)।

মানবীয় প্রশংসার কারেন্সি এই মনোপলি খেলার খেলনা টাকার মতোই। কিছু সময়ের জন্য এগুলো সংগ্রহ করতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু খেলা শেষে এগুলো মূল্যহীন। দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের বাস্তবতার নিরিখে এসবের (অর্থাৎ মানবীয় প্রশংসা বা সমালোচনার) বিন্দু পরিমাণ মূল্য নেই। তা সত্ত্বেও কেন জানি আমার ইবাদত বন্দেগির মধ্যেও আমি এসব অর্থহীন কারেন্সির ব্যাপক আকর্ষণ বোধ করি। এর ফল আমি গুপ্ত শিরক – রিয়ায় (তথা লোক দেখানো ইবাদত বন্দেগি) আক্রান্ত হই। সৃষ্টির কক্ষপথে বসবাসের ফলশ্রুতিতে রিয়ার মতো শির্কের জন্ম হয়। যতই আমি এই কক্ষপথের গভীর থেকে গভীরে ঢুকতে থাকি, ততই মানুষের প্রশংসা, অনুমোদন এবং তাদের স্বীকৃতি আমাকে গ্রাস করতে থাকে। যতই কক্ষপথের গহীনে প্রবেশ করতে থাকি, ততই হারানোর ভয় আমাকে পেয়ে বসে – মান-সম্মান হারানোর ভয়, সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়, প্রশংসা হারানোর ভয়, স্বীকৃতির হারানোর ভয়।

উপরন্তু, যতই আমি মানুষের ভয়ে কাঁপবো, ততই আমি (এদের) দাসত্বে আবদ্ধ হবো। সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তি তখনোই অর্জন করা যাবে, যখন আমি আল্লাহ ছাড়া অপরাপর সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তির ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবো।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

> নবি (ﷺ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে: "হে আল্লাহর রসুল, আমাকে এমন এক কাজের সন্ধান দেন, যে কাজ করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবে এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। তিনি (ﷺ) বলেন: "নিজেকে দুনিয়া থেকে অনাসক্তি অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যা আছে (অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু)[৪৮] তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।" [ইবনে মাজা] [৪৯]

[৪৮] অনুবাদক।

[৪৯] ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি শীর্ষক অধ্যায়), হাদিস নং: ৪১০২, তাহক্বীক আলবানি: সহিহ।

লক্ষনীয় বিষয় হলো, মানুষের স্বীকৃতি ও ভালোবাসার পেছনে আমরা যত কম ছুটবো, ততই আমরা সেগুলো পেতে থাকবো। অন্যের ওপর যত কম নির্ভরশীল হবো, ততই তারা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট এবং আমাদের সঙ্গ লাভে আগ্রহী হবে। এই হাদিস আমাদেরকে এই নিগূঢ় সত্যেরই শিক্ষা দেয়। সৃষ্ট বস্তুর পরিমণ্ডল ও বলয় ভেঙে যখন আমরা বের হতে পারবো, তখনই আমরা স্রষ্টা ও মানুষের সাথে সম্পর্কে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবো।

অতএব, ফেসবুক এক শক্তিশালী মাধ্যম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই এটাকে নিজের স্বাধীনতা ও মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করুন। এটা যেন আপনাকে আপন সত্তা ও অন্যের মূল্যায়নের দাসে পরিণত করার অস্ত্রে পরিণত না হয়।

তাওয়াক্কুল: এমন হাতল আঁকড়ে ধরা, যা কখনো ভাঙ্গে না

তার তখন বিধ্বস্ত অবস্থা। তার বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য পুষ্টির একমাত্র উৎস তার থেকে বিদায় নিয়েছে। (বেঁচে থাকার) এই একটি অবলম্বনই তার জানা ছিল, আর সহসা আজ সেটাও বিলুপ্ত হয়েছে। (মায়ের গর্ভের) স্বাভাবিক উষ্ণ দুনিয়া হঠাৎ করেই যেন হিম শীতল ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো, আর তার চারপাশ ঘিরে কেবল অপরিচিত মুখ। নবজাতক আর্তনাদ করে উঠলো। তার মনে হলো, এখানেই বুঝি তার জীবন শেষ।

সদ্যজাত শিশুটি অনুভব করতে পারেনি যে, কেউ একজন তার দিকে খেয়াল রাখছেন। তার জন্য (শুরু থেকেই) একটা পরিকল্পনা ছিল। তার থেকে যা কিছু কেড়ে নেওয়া হলো, সে জায়গায় তার প্রতিপালক তাকে পূর্বের চেয়ে উত্তম জিনিস দান করলেন। যে পুষ্টি সে আগে লাভ করতো (তার মায়ের) রক্ত থেকে, এখন ওই পুষ্টিই লাভ করে মায়ের দুধ থেকে। মায়ের গর্ভের প্রাণহীন যে দেয়াল এক সময় বিবেচিত হতো তার একমাত্র আধার, শীঘ্রই পরিবারের স্বজনদের কোমল পরশ তার স্থান দখল করে নেবে।

তা সত্ত্বেও, সদ্যজাত শিশুটির বিবেচনায়, সে যেন তার সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের অনেকেই সময় সময় নিজেদের এই শিশুর মতো অবস্থায় আবিষ্কার করি। অনেক সময় মনে হয়, সবই বুঝি আমরা হারিয়ে ফেলেছি অথবা মনে হয়, আমাদের সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, কোনো কিছুই যেন আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে হয়নি। কখনো কখনো নিজেদেরকে যেন একেবারে পরিত্যক্ত অসহায় মনে হয়, আর মনে হয় কোনো কিছুই যেন নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক সংঘটিত হচ্ছে না।

কিন্তু ঠিক ওই নবজাতক শিশুটির মতোই অনেক সময় পরিস্থিতি বাহ্যিকভাবে যেমন দেখা যায় বাস্তবে তেমনটি নয়। আর *তাওয়াক্কুল* তথা আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখার তাৎপর্য হচ্ছে, আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের একটি পরিকল্পনা আছে, এই সত্যটি উপলব্ধি করা। *তাওয়াক্কুল* হলো এ কথার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা যে, আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। পরিস্থিতি যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহ আপনার খেয়াল রাখবেন, এই বিশ্বাসের ওপর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই *তাওয়াক্কুল*। দুর্বার সেনাবাহিনী ধেয়ে আসছে, এটা জেনেও পিছু না হটে নবি মুসা (*আলাইহিস সালাম*) যেভাবে লোহিত সাগরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শত বিপদের মাঝে সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং আল্লাহ আপনাকে উদ্ধার করবেনই, এটা জেনে শত বিপদের মাঝে সেভাবে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকার নামই *তাওয়াক্কুল*। আল্লাহ যখন নাড়ির বন্ধন (*Umbilical Cord*) ছিন্ন করার ব্যবস্থা করেছেন, তখন মায়ের দুধ দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করবেন, এ কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখাই *তাওয়াক্কুল*।

তাওয়াক্কুল ছাড়া কোনো ঈমান নেই। সত্যিকার ঈমান যেখানে বিরাজমান, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তাওয়াক্কুলের দেখা মিলবে। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

> "মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করে।" (কুরআন, ৮:২)

কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা এবং আল্লাহর ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে না পারাটা মূলত মানব মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মহাবিশ্বের কিছুই আল্লাহর বিনা অনুমতিতে ঘটে না। এমনকি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না[৫০] (হাদিস)। অস্তিত্বে যা আছে, তার সবকিছুর জীবিকা বা রিযিক তিনিই দান করেন। "সবকিছুর ওপর কেবল তাঁরই ক্ষমতা বিরাজমান।" (কুরআন, ৬৭:১) কি করে আমরা তাঁর ওপর আমাদের সকল আস্থা ও নির্ভরতাকে সমর্পণ না করে থাকতে পারি? ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, "বলো, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন, তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের রক্ষক এবং আল্লাহর ওপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত" (কুরআন, ৯:৫১)

---

[৫০] বস্তুত এটা কুরআনের আয়াত (আনআম, ৬:৫৯) –(সম্পাদক)।

[তাওয়াক্কুলের] বিষয়টিকে কুরআন ব্যাখ্যা এভাবে করেঃ

"যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

(কুরআন, ৬৫:৩)

"বাস্তবতা হচ্ছেঃ অবলম্বন করার মতো মজবুত এমন কোনো জিনিস বা স্থান নেই, যা মানুষের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহই সে হাতল, যা অবলম্বন করলে কখনো ভাঙ্গে না।" (কুরআন, ২:২৫৬)

আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেনঃ

"তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো, তিনি তোমাদের জন্য ঠিক সেভাবে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যেভাবে তিনি পক্ষিকুলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। ভোর বেলায় যদিও তারা খালি পেটে বেরিয়ে যায়, তথাপি সন্ধ্যার সময় ঠিকই তারা ভরা পেটে নীড়ে ফিরে।" [তিরমিযি]

[আর সত্যি সত্যি যখন যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে পারি], পক্ষিকুল ও নবজাতক শিশুর জন্য যেভাবে আল্লাহ রিযিকের বন্দোবস্ত করেন, ঠিক সেভাবেই কল্পনাতীত স্থান থেকে তিনি আমাদেরকে রিযিকের যোগান দিয়ে থাকেন।

তাওয়াক্কুল, আশা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা: গোটা বিষয়টির তিনটি অংশ

শুরুতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিদায় নিতে উদ্যত তার স্বামীর প্রতি আকুতি জানান। "আপনি কি আমাদেরকে এখানে মারা যাওয়ার জন্য রেখে যাচ্ছেন?" [শঙ্কিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠেন]। কিন্তু কোনো জবাব নেই। তিনি আবারও তার স্বামীকে ডাকলেন। তবুও কোনো জবাব নেই। সহসাই তিনি তাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার প্রতিপালকই কি আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ" নবি ইব্রাহিম (আ.) জবাব দিলেন।

এই কথা শোনার পরই বিবি হাজেরার সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। নবজাতক শিশুকে কোলে নিয়ে যদিও তিনি সহসা নিজেকে পানি শূন্য ধু ধু মরুভূমিতে আবিষ্কার করলেন, তথাপি নিশ্চিত দৃঢ়তার সাথে তিনি জানতেন যে, আল্লাহ কখনো তাকে একা ছেড়ে দেবেন না। তার ঈমান ছিল মজবুত, তার বিশ্বাস ছিল অটুট।

নবি ইব্রাহিম (আ.)-এর বিদায় নিতে না নিতেই পিপাসায় তার শিশু সন্তান ইসমাইল কাঁদতে শুরু করে। আল্লাহর প্রতি বিবি হাজেরার পূর্ণ *তাওয়াক্কুল* (আস্থা ও নির্ভরতা) থাকার পরেও তিনি হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন না, এই অপেক্ষায় যে আকাশ থেকে পানি নাযিল হবে।

বিবি হাজেরার অন্তর ছিল আল্লাহর প্রতি নিখাঁদ আস্থায় ভরপুর, কিন্তু অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে তিনি তার সাধ্যানুসারে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মধ্যে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন এবং সন্তানের জন্য হন্যে হয়ে পানির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে থাকেন। যতবারই বিবি হাজেরা পর্বতের চূড়ায় উঠছেন এবং কিছুই পাচ্ছেন না, তিনি না হতাশ হলেন, আর না তিনি আশা হারালেন। তার ইচ্ছা ছিল অদম্য, তাই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিবি হাজেরা এতটাই সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন যে, তার এই কাজের আনুষ্ঠানিকতা '*সাই*' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যার আক্ষরিক মর্ম: 'সর্বাত্মক চেষ্টা করা।'

অনেকেই তাওয়াক্কুলকে হাল ছেড়ে দেওয়া এবং সাধ্যমত চেষ্টা থেকে পিছিয়ে আসার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু কোনোভাবেই *তাওয়াক্কুল* অর্থ: কেউ তার সংগ্রাম থেকে বিরত হওয়া নয়। বিবি হাজেরার এই কাহিনী এ বিষয়ে আমাদের জন্য সর্বোত্তম একটি উদাহরণ উপস্থাপন করে, যা নবি (ﷺ) আমাদের শিক্ষা দান করেছেন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো সে কি (তার উটটি ছেড়ে রেখে) আল্লাহর ওপর *তাওয়াক্কুল* করবে নাকি উটটি বাঁধবে এবং অতঃপর আল্লাহর ওপর *তাওয়াক্কুল* করবে। নবি (ﷺ) বলেন, তার উচিত হবে, তার উটটি মজবুতভাবে বেঁধে রাখা এবং তারপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।

তাওয়াক্কুল অঙ্গ-প্রতঙ্গের কোনো কাজ নয়, আসলে এটা অন্তরের কাজ। তাই অঙ্গপ্রতঙ্গ যখন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাবে, হৃদয় তখন পুরোপুরি নির্ভর করবে আল্লাহর ওপর। এটার তাৎপর্য হচ্ছে, অঙ্গ-প্রতঙ্গের আপ্রাণ চেষ্টার ফলাফল যাই হোক না কেন, এ কথা জেনে হৃদয় পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকবে যে, এই ফলাফল আল্লাহর ভ্রান্তিহীন সিদ্ধান্তেরই পরিণতি।

কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য একজনকে আশায় বুক বাঁধতে হবে, দৈহিকভাবে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে এবং অন্তরকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির হাতে) ছেড়ে দিতে হবে।

একেই বলে জাগরণ

এমন অনুভূতি বর্ণনার ভাষা নেই। একবার ভাবুন তো, আপনি সারাটা জীবন একটা গুহায় বাস করলেন এবং এই বিশ্বাসে যে, এটাই আপনার গোটা দুনিয়া। এরপর হঠাৎ করেই একদিন আপনি বাইরে পা রাখলেন। প্রথমবারের মতো আপনি আকাশ দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন সারি সারি গাছ, পক্ষিকুল এবং সূর্য। জীবনে প্রথমবারের মতো আপনি উপলব্ধি করলেন, যে জগতটা আপনি চিনতেন তার পুরোটাই ছিল ভ্রম, বিভ্রান্তি। প্রথমবারের মতো আপনি অধিকতর সত্য ও সুন্দর এক বাস্তবতা আবিষ্কার করলেন। এই উপলব্ধির উচ্চতাটা একবার অনুভব করুন। ক্ষণিকের জন্য মনে হবে, আপনি যেকোনো কিছু করতে পারেন। সহসাই গুহায় কাটানো আগের জীবনের সকল কিছুই আপনার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। প্রথমবারের মতো আপনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন, সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠলেন, পূর্ণভাবে প্রাণবন্ত হলেন এবং হলেন পুরোপুরি সচেতন। এটা এমন একটা অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটাই সে রুহানি উৎকর্ষ, যা সত্যকে নতুনভাবে আবিষ্কারে ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়।

এটাই প্রকৃত জাগরণ।

একজন ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিই কেবল এই অনুভূতির স্বাদ পান। একজন জন্মগত মুসলিম ব্যক্তি, যিনি দ্বীনে আসেন, তিনিও এই অনুভূতিকে চিনেন। যেকোনো ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ বিমুখ জীবনযাপন করছিলেন, অতঃপর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তিনিও এ অনুভূতির সাথে পরিচিত। এই অবস্থাকে ইবনে কাইয়্যিম (র.) তার *'মাদারিজ আস-সালিকিন'* (আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার স্টেশনসমূহ) গ্রন্থে يَقَظَة (জাগরণ) হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অবস্থাকে তিনি আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম স্টেশন হিসেবে বর্ণনা করেন। কখনো কখনো এই অবস্থাকে 'ধর্মান্তরের উদ্দীপনা' বলা হয়। যখন কেউ প্রথমবারের মতো ধর্মান্তরিত হন কিংবা আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে শুরু করেন, সচরাচর তারা বেশ উদ্দীপ্ত এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকেন, যেটা অন্যদের মাঝে দেখা যায় না। রুহানি উৎকর্ষের কারণেই এই প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় এবং এটাই এই অবস্থার সহজাত বৈশিষ্ট্য।

'জাগরণ' স্টেশনের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

আল্লাহ ইবাদতকে সহজ করে দেন:— এই অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বেশ সহজতর হয়। এই পর্যায়ে ব্যক্তি এতটাই উদ্দীপ্ত ও সতেজ থাকে যে, সদ্য আবিষ্কৃত ওই বাস্তবতার জন্য সে সহজেই সকল কিছু কুরবানি করতে পারে। এই উদ্দীপনা এই ব্যক্তিকে এক নিমিষেই ০ থেকে ৬০ এ নিয়ে যেতে পারে। এটা অনেকটা রুহানি স্টেরয়েড[৫১] গ্রহণের মতো। এই যে শক্তি আপনি লাভ করেন, তা আপনার নিজ সত্তা থেকে আসে না, বরং আপনাকে দেওয়া সাহায্য থেকে আপনি এই শক্তি লাভ করেন। এই ক্ষেত্রে এই সাহায্য আসে আল্লাহর তরফ থেকে। অনেকে এতো বেশি, এত দ্রুত বদলে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু দ্রুত বদলে যাওয়াটা কোনো সমস্যা বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আসল সমস্যা হলো: অহমিকা। সমস্যা হলো সহজেই হতোদ্যম হয়ে পড়ার মধ্যে। আল্লাহ যদি আপনাকে এমন কোনো উপহার দেন, যার সাহায্যে আপনি অধিক হারে কিছু করতে সক্ষম হন, তাহলে তা ব্যবহার করাতে দোষের কিছু নেই। তবে ওই সক্ষমতা লাভের জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দেবেন না। বরং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করুন। আর মনে রাখবেন, (প্রাথমিক পর্যায়ের) এই উজ্জীবিত মানসিক অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। আপনি হয়তো এর সাহায্যে অল্প সময়েই ০ থেকে ৬০ এ পৌঁছে যেতে পারেন, কিন্তু উজ্জীবিত অবস্থা পার হয়ে গেলে, আশা হারাবেন না এবং নিজেকে পিছলে "০"-তে ফিরে যেতে দেবেন না।

ক্ষণস্থায়িত্ব:— এই জীবনের অন্য সব অবস্থার মতো আত্মার এই উজ্জীবিত অবস্থাও ক্ষণস্থায়ী। জীবন সরলরেখার মতো সোজা নয়। আল্লাহর দিকে চলার পথটাও নয়। এই বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে, এ অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর হতাশা ও নৈরাশ্যের জন্ম দিতে পারে।

আত্মার এই অবস্থার লুকায়িত বিপত্তিসমূহ:

রুহানি জাগরণের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে না আসাই প্রকৃতপক্ষে আত্মার এ অবস্থার অজানা বা লুকায়িত দুটো বিপত্তি উৎসারিত হওয়ার কারণ। এই বিপত্তি দুটো আল্লাহর পথে শুরু করা যাত্রাকে স্থবির করে দেওয়ার দুটো কারণও বটে। এই বিপত্তি দুটো হচ্ছে: [১] অহমিকা/আত্মতুষ্টি এবং [২] নৈরাশ্য। অহংকারী ব্যক্তি ইতোমধ্যেই এ রকমটাই ধারণা করে যে, সে যথেষ্ট উন্নতি করছে, তাই সে প্রচেষ্টা

[৫১] এক প্রকারের শক্তিবর্ধক –(সম্পাদক)।

বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে আশাহত ব্যক্তি তো ধরেই নিয়েছে, তার পক্ষে যথেষ্ট উন্নতি করা কখনোই সম্ভব না, তাই সেও চেষ্টা থামিয়ে দেয়। [মজার ব্যাপার হলো] দুটো ভিন্ন ভিন্ন রোগ একই পরিণতির দিকে ধাবিত করে। আর তাহলো আল্লাহর পথে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দেয়।

অহমিকা:– রুহানি জাগরণের এই পর্যায়ে অধিক ইবাদতের যে শক্তি সৃষ্টি হয়, সেটা এই বিশেষ অবস্থার একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এই শক্তি আল্লাহর তরফ থেকে আসে, ব্যক্তির নিজের তরফ বা তার যোগ্যতায় নয় – এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে প্রথম বিপত্তির সৃষ্টি হয়। বিষয়টি যারা ঠিক মতো উপলব্ধি করে না, ইবাদতের এই বর্ধিত শক্তিকে তারা ভুলভাবে নিজেদের দ্বীনদারি বা তাকওয়ার উচ্চমান বলে মনে করতে থাকে। এই ভুল ধারণা বেশ ভয়ংকর। কেননা, এটা ব্যক্তির মাঝে অহংকার এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় দ্বীনদার ভাবার রোগ সৃষ্টি করে। আত্মিক জাগরণের এই উন্নত "দ্বীনদার অবস্থা" বস্তুত আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক উপহার, এটা উপলব্ধি করার পরিবর্তে (এই নতুন) ইবাদতগুজার বান্দা নিজের মাঝে এক প্রকার লুকানো গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এবং এই একইরকম উদ্দীপনা দেখায় না, তাদেরকে সে খাটো করে দেখতে শুরু করে।

হতাশা ও নৈরাশ্য:– জীবনের অন্য সব অবস্থার মতো "উন্নত" আত্মিক জাগরণও যে ক্ষণস্থায়ী[৫২] এটা উপলব্ধি করতে না পারার ফলে এই বিপত্তির জন্ম নেয়। এটার মানে এই নয় যে, আপনি ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা কোনো ভুল করেছেন। রমজান যে আত্মিক উৎকর্ষতা আমার-আপনার মধ্যে নিয়ে আসে, তা মনের মাঝে কেমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা অনেকেই উপলব্ধি করেন। উন্নত আত্মিক অবস্থায় এই অস্থায়ী অবস্থা জীবনেরই এক স্বাভাবিক চিত্র। আর এটি এমন একটি শিক্ষা, যা আবু বকর (রা.)-কেও শিখতে হয়েছে।

[৫২] জীবনের বিভিন্ন অবস্থা মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রেম, তাকওয়া, ইবাদত-বন্দেগি প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে। এর একটি অবস্থা সত্যকে চেনার প্রাথমিক পর্যায়। এছাড়াও বিপদ-মুসিবত, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি নানা বিষয় ব্যক্তি ভেদে দ্বীনদারীর গভীরতার মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি অবস্থাকে সবর ও শোকরের সাথে অতিক্রম করা দ্বীনদারীর ওপর যথাযথভাবে কায়েম থাকার জন্য অপরিহার্য। একইভাবে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধির প্রাথমিক পর্যায়ের অনুভূতি চিরস্থায়ী নয়। জীবনের চড়াই-উৎরাই, আল্লাহর পরীক্ষা সামনে আসবেই। সেক্ষেত্রে যথাযথ ঈমানি মানে কায়েম থাকার জন্যই লেখিকার এই উপলব্ধি ও পরামর্শ –(সম্পাদক)।

একদিন আবু বকর (রা.) এবং হানযালা (রা.) নবি (ﷺ)-এর কাছে আসেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রসুল, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন, 'তা কি রকম?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসুল, যখন আমরা আপনার সাথে থাকি, তখন আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আমাদেরকে এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা তা সরাসরি দেখতে পাই। তারপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পদের মধ্যে নিমগ্ন হই, সে সময় আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি! আমার কাছে থাকার সময় তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি তোমরা সে অবস্থায় থাকতে এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকিরের ওপর থাকতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় এবং রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু, হে হানযালা! কিছু সময় (আল্লাহর যিকিরে) এবং কিছু সময় (দুনিয়াবি কাজে ব্যয় করো) অর্থাৎ আস্তে আস্তে (চেষ্টা করো)। এ কথাটি তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন।" [মুসলিম][৫০]

রুহানি উৎকর্ষতার উচ্চ অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পরঃ

এই [রুহানি] যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছেঃ কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, আপনি একই রকম উদ্দীপনা সব সময় অনুভব করবেন না, এটা এজন্য নয় যে, আপনি কোনোকিছুতে ব্যর্থ হয়েছেন। (রুহানি প্রেরণার) উচ্চ মুখী প্রবলতার পর যে নিম্নমুখী প্রবণতার সৃষ্টি হয়, তা এ পথের স্বাভাবিক অংশ। যেমনিভাবে নবি (ﷺ) আবু বকর (রা.)-কে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এসব উত্থান-পতন এই [রুহানি] পথের স্বাভাবিক অংশ। আমরা যদি সব সময় আত্মার উচ্চতম উৎকৃষ্টতায় অবস্থান করতাম, তখন আমরা মানুষ থাকতাম না, ফেরেশতা হয়ে যেতাম। আমরা কি করি, মূলতঃ সাফল্য তার ওপর নির্ভর করে না। বরং প্রশ্ন হলোঃ যখন আত্মা নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে, যখন আমলের সেই আমেজটা আমরা আর সে রকম অনুভব করছি না, তখন আমরা কি করি। এই পথে সাফল্যের চাবিকাঠি হলোঃ যখন আপনি উদ্দীপনার তলানীতে পৌঁছে গেছেন, তখনও আপনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, এ কথা জেনে যে, এটাই এ পথের স্বাভাবিক অবস্থা।

---

[৫০] মুসলিম, কিতাবুত তওবাহ, হাদিস নং: ৬৮৫৯ – (সম্পাদক)।

শয়তানের ফাঁদঃ

মনে রাখবেন, আপনি কোন অবস্থায় আছেন, তার ওপর ভিত্তি করে শয়তান আপনাকে কাবু করার নানা চেষ্টা চালাবে।

যখন আপনি [রুহানি] উচ্চতায় অবস্থান করেনঃ– যখন আপনি রুহানি বা আত্মিক উচ্চতায় অবস্থান করেন, তখন সে চাইবে আপনাকে অহংকারী বানাতে। সে চাইবে, আপনি যেন অন্যদের খাটো করে দেখেন। শেষমেশ সে আপনাকে নিজের সম্পর্কে এতটাই আত্মতুষ্ট করে তুলবে যে, নিজের অবস্থা উন্নয়নের জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করা দরকার, তার প্রয়োজন আপনি আর বোধ করবেন না। কেননা, আপনি তো ইতোমধ্যেই বিশাল উন্নতি হাসিল করেছেন (এবং আশেপাশের সবার থেকে আপনি উত্তম। আপনার নিজের দুর্বলতাগুলির যথার্থতা প্রমাণের জন্য সে (অর্থাৎ শয়তান) আপনাকে অবিরাম আপনার চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে আমলে পিছিয়ে আছে, এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি হিজাব না পড়েন, তবে সে আপনার মনে এ ভাবনা সৃষ্টি করবে যে, হিজাবিদের কেউ কেউ আছে, যারা এমন অন্যায় কাজ করে। আমি অন্তত সেগুলো করি না। আর আমি এমন অমুক অমুক ভালো কাজ করি, যেগুলো এসব হিজাবিরা করে না!"[৫৪] অথবা আপনি যদি সলাতে অমনোযোগী হন, তখন হয়তো ভাবতে পারেন, "অন্ততপক্ষে, আমি তো আর অমুকের অমুকের মতো ক্লাবে যাই না, মাদক গ্রহণ করি না।" মনে রাখবেন, আল্লাহ কোনো (গ্রাফ পেপারে) "কার্ভ" (*Curve*)-এ আপনার গ্রেডিং করছেন না (অর্থাৎ অন্যের সাথে তুলনায় আপনার গ্রেডিং হচ্ছে না)[৫৫]। অন্যরা কি করছে, তাতে কিছু যায় আসে না। কিয়ামতের দিন আমাদের সবাইকে (হিসাবের জন্য যার যার হিসাব নিয়ে)[৫৬] একাকী দাঁড়াতে হবে। আমরা যেন আল্লাহর পথে চেষ্টা থামিয়ে দেই, সে লক্ষ্যে শয়তান এসব চিন্তা-ভাবনা ও মনোভাবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

---

[৫৪] লেখিকা মূলতঃ মুসলিম মা-বোনদের লক্ষ্য করে বইখানি লেখায় হিজাবিদের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে যাদের দাড়ি আছে বা টাখনুর ওপর কাপড় পরেন, তাদের কথা আসতে পারে – (সম্পাদক)।

[৫৫] – (সম্পাদক)।

[৫৬] – (সম্পাদক)।

যখন আপনি তলানিতে:– অন্যদিকে যখন (আমলের দুর্বলতার কারণে) আপনার আত্মিক মনোবল নিম্নমুখী, তখন শয়তান আপনার ওপর ভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে। সে নৈরাশ্য দিয়ে আপনাকে পাকড়াও করতে চাইবে। সে আপনাকে বিশ্বাস করাতে চাইবে যে, আপনি একটা অপদার্থ, আর তাই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কোনো মানে নেই। সে আপনার মনে একথা বদ্ধমূল করে দিতে চাইবে যে, আপনি পুরোপুরি ব্যর্থ আর আপনি যাই করুন না কেন, যে ঈমানি ও রুহানি উচ্চতায় আপনি এক সময় ছিলেন, সেখানে আর কখনো ফিরতে পারবেন না। কিংবা সে চাইবে আপনার মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে যে, আপনি এতটাই 'খারাপ' যে স্বয়ং আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করবেন না। যার ফলশ্রুতিতে, আপনি নিজেকে (ঈমান ও আমলে) আরও অধঃপতিত হওয়ার সুযোগ করে দেবেন। আপনি হয়তো এক সময় (ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে) উচ্চ অবস্থানে ছিলেন, পরবর্তীতে নিজের প্রতি খারাপ ধারণা জন্মাতে থাকে। ইবাদত-বন্দেগিতে গাফেলতি শুরু হলে আপনার এমনও হতে পারে যে, আপনি যখন ইতোপূর্বে দ্বীনদারীর দিক থেকে অগ্রসর ছিলেন, তখন আপনি অন্যের ভুলক্রটি বা তাদের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। শেষ পর্যন্ত এটা এক আত্মঘাতী পরিণতি ডেকে আনে, কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ে এর ফলাফল দাঁড়ায়ঃ আপনি নিজেকেও ভুল করার বা দুর্বলতা প্রদর্শনের অনুমতি দেবেন না।

যেহেতু আপনি নিজেকে আর সব মানুষের মতো মানুষ মনে করছেন না এবং আপনারও ভুল-ক্রটি-কমতি হতে পারে, এ কথা মানতে পারছেন না, ফলশ্রুতিতে যখন আপনি ভুল করে ফেলেন, তখন নিজের প্রতি এতটাই কঠোর হন যে, আশা হারিয়ে ফেলেন। ফলে হাল ছেড়ে দেন। এর পরিনামে আপনি আরও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারেন, যা আপনার হতাশাকে আরও খারাপ দিকে নিয়ে যায়। আর এটা আপনার এক আত্ম-সৃষ্ট অবিরাম দুষ্টচক্রের রূপ ধারণ করে। শয়তান আরও চেষ্টা করবে আপনাকে এটা বিশ্বাস করাতে যে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া বা তাঁর ইবাদত বন্দেগি করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এমন একজন 'খারাপ' মানুষ হয়ে এসব করা আপনাকে কেবল একজন মুনাফিকে পরিণত করবে মাত্র। শয়তান আপনাকে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ করতে চায়। এটাই তার চাওয়া। এসবই অতি অবশ্যই মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু শয়তান যা করে, তাতে সে বেশ দক্ষ। কারণ, যখন আপনি পাপ করেন, তখনই আপনাকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে – আরও অধিক হারে – কম কোনো অবস্থাতেই নয়।

এই নিম্নমুখী সর্পিল প্রতারণার জাল থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হলে, মনে রাখবেন, এই যে আত্মিক নিম্নমুখী প্রবণতা এটা কিন্তু এই পথেরই একটা অংশ। মনে রাখবেন, 'ফুতুর' তথা পতন মানুষের জীবনেরই একটি অংশ। তাই একবার যখন আপনি উপলব্ধি করেন যে, এই রুহানি পতনের অর্থ এই নয় যে, আপনি ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা আপনি একজন মুনাফিক {যেমনটি আবু বকর (রা.) ভেবেছিলেন}, তখন এই অবস্থায় পৌঁছার পরও আপনি হাল ছেড়ে দেওয়া থেকে নিজেকে সামলাতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হলো: আপনাকে এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যা আপনার জন্য "ন্যূনতম মান" হিসেবে কাজ করবে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আপনি যেমনই বোধ করুন না কেন, যতই হতোদ্যম বা যত মনমরা হতাশ বোধ করেন না কেন, কম করে হলেও এইটুকু আপনি অবশ্যই করে যাবেন। আপনি উপলব্ধি করেন, যখন আপনি আপনার উদ্দীপনার একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছাবেন, তখন একাজগুলি করা আপনার জন্য অবশ্যই কঠিন হয়ে উঠবে, তথাপি এগুলো সম্পন্ন করার জন্য আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ, যথা সময়ে ৫ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা এমনই একটি "ন্যূনতম" কাজ। আপনার মন চাচ্ছে না বলে যতই আপনি অনুভব করেন না কেন, এ ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ আপোস করা যাবে না। এই ৫ ওয়াক্ত সলাতকে নিজের প্রাণবায়ুর মতো বিবেচনা করতে হবে। যখন আপনি পরিশ্রান্ত কিংবা আপনার মেজাজ ভালো নেই, তখন যদি শ্বাস না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, আপনার অবস্থা কেমন হবে, একবার ভাবুন তো।

'ন্যূনতম' অভ্যাসের মধ্যে আরও কিছু ইবাদত অন্তর্ভুক্ত থাকা উত্তম। উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণে কম করে হলেও প্রতিদিন অল্প অতিরিক্ত কিছু সলাত, যিকির-আযকার কিংবা সামান্য পরিমাণ হলেও প্রতিদিন কুরআন থেকে কিছু না কিছু অধ্যয়ন করার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা। মনে রাখবেন, অনিয়মিতভাবে অনেক পরিমাণে আমলের চেয়ে আল্লাহ পাক অল্প পরিমাণ হলেও নিয়মিত আমল পছন্দ করেন। যখন আপনার আত্মিক উদ্দীপনা বা প্রেরণা একবারে তলানীতে গিয়ে ঠেকে তখনও যদি আপনি মৌলিক বিষয়গুলির ওপর কায়েম থাকতে পারেন, তবে ঈমানি জজবাতে সওয়ার হয়ে পুনরায় আপনি নিজের অবস্থানে ফিরে আসবেন, *ইনশাআল্লাহ*। আল্লাহর ইচ্ছায় যখন আপনি পুনরায় উঠে দাঁড়াবেন, তখন আপনি আবার আগের থেকে (ঈমান ও আমলে) আরও 'উচ্চে' উঠতে সক্ষম হবেন।

জেনে রাখুন, আল্লাহর দিকে যে পথ চলে গেছে, তা কোনো সমতল ভূমি নয়। আপনার ঈমান কখনো বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ অবস্থানে পৌঁছাবে কখনো বা আবার তা কমে যেতে পারে। আপনার ইবাদতের সামর্থ্য কখনো উচ্চে অবস্থান করে আবার কখনো সে শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু জেনে রাখবেন, প্রতিটি পতনের পরেই আছে উত্থান। তাই ধৈর্য ধারণ করুন, ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন, আশাহত হবেন না এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে যান অব্যাহতভাবে। এ পথ বন্ধুর। এই পথে যেমন উত্থান থাকবে, তেমনি থাকবে পতন। তবে জীবনের আর সবকিছুর মতোই এই পথেরও আছে সমাপ্তি। আর ওই সমাপ্তি যে চরম ফায়দা ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে, তা সফরের সবটুকু কষ্ট উসুল করে দেবে। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

(কুরআন, ৮৪:৬)

"হে মানব সম্প্রদায়, নিশ্চিতভাবে, তোমরা আপন প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাকো, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।"

নারীর মর্যাদা

সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়ানোর জন্য আমি দুনিয়ায় আসিনি। আমার এ দেহ সর্বসাধারণের ভোগের সামগ্রী নয়। আমাকে নেহায়াত পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনা যাবে না, আর না আমি হবো আরেক জোড়া জুতা বিক্রির জন্য একজোড়া পা মাত্র। আমি আত্মা ও মেধাসম্পন্ন আল্লাহর এক বান্দী। আমার আত্মা, আমার হৃদয়, আমার চারিত্রিক সৌন্দর্যই নির্ধারণ করবে আমার মূল্য। তাই আমি তোমাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠির ইবাদতও করবো না, আর না তোমাদের ফ্যাশনের চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আমার আত্মসমর্পণ তো সর্বোচ্চ সত্তারই সমীপে।

নারীর ক্ষমতায়ন

নবি (ﷺ)-এর একজন সাহাবি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যখন এক শহরে প্রবেশ করেন, তখন অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি ইসলামের দাওয়াতের সারাংশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমি এসেছি একজন দাসের উপাসনা থেকে তোমাদেরকে স্বাধীন করতে এবং সকল দাসের সর্বময় প্রভুর দাসত্বের অধীনে তোমাদের নিয়ে আসতে।"

এই বক্তব্যের মাঝে লুকিয়ে আছে মূল্যবান ঐশ্বর্য ভাণ্ডার। এই শব্দমালার নিচে আবদ্ধ ক্ষমতায়নের চাবি ও সত্যিকার স্বাধীনতার একমাত্র পথ।

একটু ভেবে দেখুন, যেই মুহূর্তে আপনি বা আমি আমাদের সফলতা, আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের সুখ বা আমাদের মূল্য স্রষ্টা বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নির্ধারণ করার অধিকার দিই, ঠিক ওই মুহূর্তে আমরা নীরব কিন্তু ধ্বংসাত্মক এক দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। যে জিনিস আমাকে আমার মর্যাদার মাপকাঠি, আমার সফলতা এবং আমার ব্যর্থতাকে সংজ্ঞায়িত করে, সে জিনিসই তো আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর সেটাই আমার প্রভুতে পরিণত হয়।

তথাকথিত যে প্রভু নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করেছে, বিভিন্ন কালে সে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী যেসব মানদণ্ড নারীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তা হলোঃ পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে, আল্লাহ তাঁর নিজ থেকেই নারীকে নারীত্বের এই মর্যাদা দান করে সম্মানিত করেছেন এবং পুরুষের তুলনায় নয়। অথচ পশ্চিমা নারীবাদ দৃশ্যপট থেকে যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে দিল, তখন পুরুষ ছাড়া আর কোনো মানদণ্ড বাকি থাকলো না। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য নারীবাদীরা বাধ্য হলো, পুরুষের সাথে তুলনায় নিজেদের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে। আর এর মাধ্যমে সে এক ত্রুটিপূর্ণ ধারণা কবুল করে নিল। সে পুরুষকে নিজের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই একজন নারী কখনো পূর্ণ মানব নয়, যতক্ষণ না সে তার নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড তথা পুরুষের মতো হতে না পারছে।

পুরুষ যখন ছোট করে চুল কাটে, তখন সেও ছোট করে চুল কাটতে চাইলো। পুরুষ যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, তখন সেও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাইলো। নারী এ সমস্ত জিনিস শুধু একটি কারণেই হস্তগত করতে চাইলো, তা হলোঃ তার মানদণ্ড "পুরুষ"-এর তা আছে।

কিন্তু একথা সে উপলব্ধি করলো না যে, নারী ও পুরুষের মাঝে বৈশিষ্ট্যের যে বৈচিত্র রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আল্লাহ উভয়কে সম্মানিত করেছেন, তাদের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নয়। পুরুষকে আমরা যখন মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেই, সহসাই নারীত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হেয় বা হীন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সংবেদনশীল হওয়াটা অমর্যাদাকর, আর পুরোদমে মা হওয়াটা তো রীতিমত অধঃপতিত হওয়ার শামিল। পুরুষালি বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত আবেগ শূন্য নিরেট যুক্তিবাদ এবং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত নিঃস্বার্থ মায়া ও মমতার দ্বন্দ্বে যুক্তিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরুষের যা আছে এবং পুরুষ যা করে, তার সবকিছুকে যখন আমরা উত্তম হিসেবে মেনে নেই, তখন তার অবশ্যম্ভাবী বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা ঘটে তা হলোঃ পুরুষের যদি এটা থাকতে পারে, তবে আমরাও সেটা পেতে চাই। পুরুষরা কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলে আমরা ভেবে নিই যে, এটাই উত্তম, তাই আমরাও সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে চাই। যেহেতু পুরুষরা সলাতে ইমামতি করে – আর আমরা ধারণা করে নিই যে, ইমাম সাহেব তো আল্লাহর নিকটবর্তী, তাই আমরাও ইমামতি করতে চাই। এমনিভাবে কোনো এক সময় আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, দুনিয়াতে নেতৃত্বের কোনো একটা অংশ লাভ করাটা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটা আলামত।

কিন্তু একজন মুসলিম নারীর নিজেকে এভাবে অবমূল্যায়ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহর দেওয়া মাপকাঠিই তার মাপকাঠি। আল্লাহই তার মূল্যায়ন করবেন, এটার জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন তার নেই।

নারী হিসেবে আমাদেরকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে মর্যাদাকে আমরা তখনই ভূলুণ্ঠিত করি, যখন আমরা যা নই, তা হওয়ার চেষ্টা করি। সত্যি বলতে কি, পুরুষের মতো হওয়ার চেষ্টা করবেন না। যতক্ষণ আমরা পুরুষকে অনুকরণ করার চেষ্টা বন্ধ না করবো, ততক্ষণ নারী হিসেবে আমাদের সত্যিকার স্বাধীনতা মিলবে না। আল্লাহর দেওয়া বৈচিত্রমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে যতক্ষণ না আমরা কদর করবো, ততক্ষণ সত্যিকার মুক্তি আমাদের ভাগ্যে জুটবে না।

অন্যদিকে সমাজে আরেকটি প্রভাবশালী তথাকথিত 'প্রভু' রয়েছে, যে নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করে। আর তা হলোঃ সৌন্দর্যের মাপকাঠি। যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন থেকেই নারী হিসেবে সমাজ আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বার্তা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। আর সেই বার্তাটি হলোঃ "স্লিম হও, আবেদনময়ী (সেক্সি) হও। আকর্ষণীয় হও। অন্যথায় ... তুমি কিছুই নও।"[৫৭]

আমাদেরকে বলা হয় তাদের মতো মেকআপ করতে এবং তাদের মতো ছোট ছোট স্কার্ট পড়তে। নির্দেশনা দেওয়া হয়, রূপসী দেখানোর স্বার্থে নিজেদের জীবন, নিজেদের দেহ এবং নিজেদের আত্মসম্মানকে বলি দিতে। শেষ অবধি আমরা বিশ্বাস করতে থাকি যে, আমরা যাই করি না কেন, আমরা ততটুকু মর্যাদারই অধিকারী, যতটুকু হলে আমরা পুরুষদেরকে তুষ্ট এবং তাদেরকে বিমোহিত করতে সফল হই। ফলে আমরা কাদামাটির নিচে কৃত্রিম জীবনযাপন করি, আর বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের হাতে নিজেদের দেহ তুলে দিই বিক্রির উদ্দেশ্যে।

আসলে আমরা গোলাম, তবে তারা আমাদের ভাবতে শেখায় যে, আমরা মুক্ত-স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাদের পণ্য সামগ্রী, কিন্তু তারা কসম খেয়ে বলে যে, এটাই সফলতা। যেহেতু তারা আপনাকে শিখিয়েছে যে, সবার সামনে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়ানোই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য এবং পুরুষদেরকে আকর্ষণ করা, তাদের জন্য নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করাটাই মূল লক্ষ্য। তারা আপনাকে এ কথা বিশ্বাস করিয়েছে যে, তাদের গাড়ি বাজারজাত করার জন্য আপনার দেহখানা সৃষ্টি করা হয়েছে।

[৫৭] এর সাথে আমাদের দেশে যুক্ত হয়েছে, "তোমার রং ফর্সা করো।" সমাজ, কর্পোরেট ব্যবসা আর মিডিয়ার দৌরাত্মে আমাদের মা-বোনেরা আজ আল্লাহর দেওয়া রূপ-লাবণ্যে সন্তুষ্ট নন। তারা বরং রং ফর্সা করার অসম্ভব এবং স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় সময়, সম্পদ, মেধা এবং নিজের স্বাস্থ্য ধ্বংস করছেন। বিয়ের বাজারে সব ছেলেই ফর্সা মেয়েই খুঁজে, অথচ সে তার মা-বোনের দিকে তাকিয়ে দেখে না। সব মা তার ছেলের জন্য ফর্সা পাত্রী চান, কিন্তু নিজের কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখেন না। কি দূর্ভাগ্যজনক ও অস্বাস্থ্যকর মানসিকতা। ঈমানহীন বস্তুবাদীতা হতে এসবের জন্ম। আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তা কেবলই মাইকেল জ্যাকসনের মতো বিকৃত রূপ ধারণ করা। বরং আসুন আমরা সবাই অন্তরকে আলোকিত করে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হই। রং-এ (তথা গুণ ও বৈশিষ্ট্যে) আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? (*বাকারাঃ ১৩৮*) –(সম্পাদক)।

কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে।

আপনার দেহ, আপনার আত্মাকে এটার চেয়েও উন্নততর কিছুর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এর থেকে অনেক উচ্চতর ও উন্নততর কিছুর জন্যই।

আল্লাহ কুরআনে বলেন: "বস্তুত তোমাদের মধ্যে সেই তো আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী (তথা আল্লাহ ভীরু, নেককার)।" (কুরআন, ৪৯:১৩)

বস্তুত আপনি সম্মানিত। তবে সেটা না পুরুষের সাথে আপনার সম্পর্কের কারণে, না তাদের মতো হয়ে, আর না তাদেরকে তুষ্ট করে। নারী হিসেবে আপনার মর্যাদা আপনার কোমরের মাপ কিংবা কতজন পুরুষ আপনাকে পছন্দ করে, তার সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ হিসেবে আপনার মর্যাদা এসবের চেয়ে উচ্চতর মাপকাঠিতে মাপা হয় এবং তা হচ্ছে: সৎকর্মশীলতা ও তাকওয়ার মাপকাঠি। ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলি যাই বলুক না কেন, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় হওয়ার চেয়েও অনেক অনেক গুণ মহৎ ও উৎকৃষ্টতর কিছু।

আমাদের পূর্ণতা আসে আল্লাহর নিকট হতে এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে। তথাপি একেবারে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে একজন নারী হিসেবে শেখানো হয়েছে যে, যতক্ষণ না একজন পুরুষ এসে আমাদেরকে পূর্ণ করছে, ততক্ষণ আমরা পূর্ণতা লাভ করবো না। আমাদের শেখানো হয়েছে যে, সিনড্রেলার মতো যতক্ষণ না কোনো রাজকুমার এসে তাকে উদ্ধার করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিতান্তই অসহায়। আমাদের বলা হয়, *Sleeping Beauty*-র[৫৮] স্বপ্নের রাজকুমার এসে চুমু না দেওয়া পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আমাদের জীবনের সূচনা হচ্ছে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে: কোনো রাজকুমারই আপনাকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম নয়। আর না কোনো বীরযোদ্ধা পারে আপনাকে বাঁচাতে। বস্তুতঃ শুধু আল্লাহই আপনাকে পূর্ণতা দিতে ও রক্ষা করতে সক্ষম।

[৫৮] *Sleeping Beauty*: একটি জনপ্রিয় পাশ্চাত্য রূপকথা। ডাইনি বা দুষ্টপরী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে এক রাজকন্যা একশ বছর ঘুমিয়ে থাকে। পরে এক রাজকুমার এসে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে দেখে অভিভূত হয়ে তাকে চুম্বন করলে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গে। এখানে লেখিকা সে কল্পকাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন –(সম্পাদক)।

আপনার রাজকুমার একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ হয়তো তাকে আপনার জীবন সঙ্গি হিসেবে পাঠাতে পারেন, কিন্তু সে আপনার মুক্তিদাতা নয়। তিনি (আপনার জীবন সঙ্গি), আপনার চোখের শান্তি হতে পারেন, কোনো অবস্থাতেই আপনার কণ্ঠনালীর জীবনদায়ী বাতাস নয়। আল্লাহর নৈকট্যই আপনার (জীবনদায়ী) বাতাস। তাঁর নৈকট্যের মধ্যেই আছে আপনার নাজাত ও পূর্ণতা, কোনো সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে নয়। কোনো রাজকুমারের মাঝে যেমন নয়, তেমনি কোনো ফ্যাশন বা স্টাইলের মধ্যেও নয়।

তাই আমি আপনাকে বলছি, এসব থেকে মুক্ত হন, মন থেকে এসব শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলুন। আমি আপনাকে বলবো, দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান এবং গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেন যে, আপনি কোনো কিছুরই দাস নন, না কোনো ফ্যাশন, না রূপ-সৌন্দর্য, আর না কোনো পুরুষ, কোনো কিছুরই দাস নন আপনি। আপনি কেবলই আল্লাহর দাস কেবলই আল্লাহর। আমি আপনাকে আহবান করবো দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে, নিজের দেহ দিয়ে পুরুষদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি দুনিয়াতে আসেননি। আপনি এই দুনিয়াতে এসেছেন কেবলই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তাই আপনার সেই সব হিতাকাঙ্ক্ষী যারা আপনাকে 'মুক্ত' করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য কেবল একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলুন, "ধন্যবাদ, (যথেষ্ট হয়েছে), আর না।"

তাদেরকে বলে দেন, আপনি কোনো প্রদর্শনের বস্তু বা সামগ্রী নন। আপনার দেহ সর্বসাধারণের ভোগের সামগ্রী নয়। দুনিয়া ভালো করে জানুক, তারা আপনাকে আর পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনতে পারবে না বা জুতা বিক্রির বিজ্ঞাপনের জন্য আপনাকে কেবল এক জোড়া (সুন্দর) পা সর্বস্বও করতে সক্ষম হবে না। (সকলকে এটা জানিয়ে দিন) আপনি এক (পরিপূর্ণ মানব) আত্মা, একটি চিন্তাশীল সত্তা, স্রষ্টার এক দাস, আর আপনার মর্যাদার ভিত্তি হলোঃ হৃদয় ও আত্মার সৌন্দর্যে এবং নৈতিক চরিত্রের মাধুর্যে। তাই তাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠির উপসনা আপনি করেন না এবং তাদের ফ্যাশন চেতনার কাছে আপনি নিজেকে কখনো সমর্পণ করেন না। আপনার আত্মসমর্পণ হলোঃ সর্বোচ্চ সেই সত্তার নিকট।

সুতরাং, কোথায় ও কিভাবে একজন নারীর ক্ষমতায়ন হবে, এই প্রশ্নের জবাব দানের সময় আমি নিজেকে আমাদের নবি (ﷺ)-এর ওই সাহাবির উক্তির দিকেই ফিরে যাচ্ছি।[৫৯] ঘুরেফিরে আমি এই উপলব্ধির দিকে ফিরে আসি যে, সত্যিকারের মুক্তি ও ক্ষমতায়ন নিহিত রয়েছে নিজেকে অন্যসব প্রভু থেকে মুক্ত করার মধ্যে, নিজেকে অন্য সকল সংজ্ঞা ও মানদণ্ড থেকে মুক্ত করার মাঝেই সত্যিকারের মুক্তি নিহিত।

মুসলিম নারী হিসেবে আমাদেরকে এই নীরব দাসত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। নিজেদের মর্যাদা ও মূল্যমান নির্ধারণে সমাজের তৈরি করা সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজন আমাদের নেই। সম্মানিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে কোনো পুরুষের মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের রক্ষা করা বা পূর্ণতা দেওয়ার জন্য কোনো এক রাজকুমারের আশায় থাকার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের গুরুত্ব, আমাদের মর্যাদা, আমাদের নাজাত এবং আমাদের পূর্ণতা কোনো এক দাস বা সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না।

বরং এসবই নির্ভর করে সকল সৃষ্টি ও সকল দাসের প্রভু – আল্লাহর ওপর।

[৫৯] যা প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে –(সম্পাদক)।

যে সমাজ-সংস্কৃতিতে আমি বড় হয়েছি –তার উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

আমি যখন বেড়ে উঠছি, তখন তুমি (অর্থাৎ আমার সমাজ) আমাকে অচ্ছুত অনাকাঙ্ক্ষিত (*Ugly Duckling*) ছাড়া কিছুই ভাবোনি।[৬০] আর বছরের পর বছর নিজেকে আমি তা-ই ভেবে এসেছি। দীর্ঘ সময় ধরে তুমি[৬১] আমাকে শিখিয়েছো যে, কাঙ্ক্ষিত স্ট্যান্ডার্ড (তথা পুরুষের) একটা বাজে কপি বা নমুনা ছাড়া আমি আর কিছুই নই।

না আমি (পুরুষের মতো) এত দ্রুত দৌড়াতে পারি, আর না আমি এত ওজন তুলতে পারি। (তাদের) সমপরিমাণ অর্থ উপার্জনেও আমি অক্ষম। তদপুরি আমি শুধু কাঁদি আর কাঁদি। আমি বেড়ে উঠেছি এক পুরুষ কেন্দ্রিক দুনিয়াতে, যেখানে আমার (তথা নারীর) কোনো স্থান নেই।

আর যখন আমি পুরুষের মতো হতে পারলাম না, তখন আমি কেবল তাদেরকে তুষ্ট করতে চাইলাম। তোমার দেওয়া প্রসাধনী (মেক-আপ) ব্যবহার করতাম, আর তোমাদের শর্ট স্কার্টগুলো পড়ে নিতাম। আমি আমার জীবন, আমার শরীর এবং আমার আত্মমর্যাদা শুধু রূপসী হওয়ার জন্যই বিলিয়ে দিয়েছি। আমি জানতাম যে, আমি যাই করি না কেন, যতক্ষণ আমার মনিব আমার প্রতি তুষ্ট এবং যতক্ষণ সে আমার রূপ লাবণ্যে বিমোহিত, কেবল ততক্ষণই আমার মূল্য থাকবে।

---

[৬০] লেখিকা এখানে একজন নারী বা কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের মানসিকতা বুঝানোর জন্য ইংরেজিতে "*Ugly Duckling*" পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যদিও "*Ugly Duckling*" জনপ্রিয় কার্টুন কাহিনীর শিক্ষা ভিন্নরূপ এবং ইংরেজি ভাষায় এ শব্দগুচ্ছের অর্থও ভিন্ন। লেখিকা এখানে আক্ষরিক অর্থে একে ব্যবহার করেছেন। "*Ugly Duckling*" হচ্ছে *Hans Christian Andersen* রচিত একটি জনপ্রিয় রূপকথা। এর ভিত্তিতে কার্টুন /এনিমেটেড মুভি ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। একটি রাজহাঁসের বাচ্চা, সে বাচ্চা অবস্থায় এক সাধারণ হাঁসের ঘরে লালিত-পালিত হয়। সে অন্য হাঁসের বাচ্চাগুলির মতো সুন্দর না হওয়ার কারণে তাকে সবাই অপছন্দ করে। কিন্তু শেষে বড় হয়ে সে অনিন্দ্যসুন্দর এক রাজহাঁসে পরিণত হয়। এ গল্পখানা শিক্ষনীয়। তবে এখানে আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ অপাংক্তেও, অপছন্দনীয় ইত্যাদি অর্থে "*Ugly Duckling*" শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে – (সম্পাদক)।

[৬১] এখানে তুমি / তোমার সম্বোধন এর লক্ষ্য হলোঃ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা – (সম্পাদক)।

আর তাই তোমার কসমেটিকসে আবৃত হয়ে আমি নিজের গোটা জিন্দেগি কাটিয়েছি এবং তোমাকে আমার দেহ পর্যন্ত দান করেছি বিক্রয় করার জন্য।

আমি ছিলাম এক গোলাম, কিন্তু তুমি আমাকে শিখিয়েছো যে, আমি স্বাধীন, মুক্ত। আমি ছিলাম তোমার ভোগ্য পণ্য, কিন্তু তুমি কসম কেটে বলেছো, এটাই সাফল্য। তুমি আমাকে শিখিয়েছো যে, আমার জীবনের লক্ষ্যই হলোঃ নিজেকে প্রদর্শন করা, পুরুষের জন্য নিজেকে আকর্ষনীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। তুমি আমাকে একথা বিশ্বাস করিয়েছো যে, আমার দেহখানি সৃষ্টিই হয়েছে তোমার গাড়িগুলি বিক্রি করার জন্য। তুমি আমাকে এ বুঝের ওপর বড় করেছো যে, আমি এক *Ugly Duckling* (অর্থাৎ কোনো কাজেরই নই, অথর্ব, অচ্ছুত, অর্থহীন)। কিন্তু তুমি মিথ্যা বলেছো।

ইসলাম আমায় বলে, 'আমি এক রাজহাঁস। আমি (যে পুরুষের চেয়ে) ভিন্ন কিছু (এটা কোনো এক্সিডেন্ট নয় বরং)[৮২] এটাই হবার কথা ছিল, এ উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। আমার দেহ, আমার আত্মা তো সৃষ্টি হয়েছে আরও উচ্চতর কিছুর জন্য।

> আল্লাহ কুরআনে বলেনঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সব বিষয়ের খবর রাখেন।" (কুরআন, ৪৯:১৩)

তাই আমি সম্মানিত কিন্তু তা পুরুষের সাথে আমার সম্পর্কের কারণে নয়। নারী হিসেবে আমার মর্যাদা আমার কোমরের মাপ বা কতজন পুরুষ আমাকে পছন্দ করে – তার ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ হিসেবে আমার মর্যাদার মাপকাঠি আরও অনেক উচ্চতরঃ সৎকর্মশীলতা ও তাকওয়ার মাপকাঠি। ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলি যাই বলুক না কেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় হওয়ার চেয়েও মহত্তর ও উৎকৃষ্টতর কিছু।

এজন্য আল্লাহ আমায় বলেছেনঃ নিজেকে আবৃত করতে, নিজের সৌন্দর্যকে আড়াল করতে এবং গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে, আমার দেহকে ব্যবহার করে পুরুষকে খুশি করতে আমি এখানে আসিনি, আমি এখানে এসেছি শুধুমাত্র আল্লাহকে

[৮২] –(সম্পাদক)।

সন্তুষ্ট করার জন্য। নারীর দেহকে সম্মান করা ও আবৃত রাখা এবং শুধু উপযুক্তজন তথা আমি যাকে বিয়ে করবো, তাকে দেখানোর নির্দেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নারী দেহের (তথা তার রূপ-সৌন্দর্য ও আবেদন-এর) মর্যাদাকে উন্নত করেছেন।

তাই যারা আমাকে (তথাকথিত) 'স্বাধীন ও মুক্ত' করতে চায়, আমি তাদেরকে শুধু বলি, 'ধন্যবাদ, তবে আর নয়।'

সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়ানোর জন্য আমি দুনিয়ায় আসিনি। আমার এ দেহ সর্বসাধারণের ভোগের সামগ্রী নয়। আমাকে একটা পণ্যের স্তরে বা জুতা বিক্রির জন্য একজোড়া (আকর্ষণীয়) পায়ের স্তরে নামিয়ে আনতে আমি দেবো না। আমিও আল্লাহর এক বান্দী, যার আছে একটি (জীবন্ত) আত্মা, আছ এক মননশীল হৃদয়। আমার মূল্যমান নির্ধারণ করবে আমার আত্মা, আমার হৃদয় এবং আমার নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্য। তাই না আমি তোমাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠির ইবাদত করবো, আর না তোমাদের ফ্যাশনের চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করবো। আমার আত্মসমর্পণ তো সর্বোচ্চ সত্তারই সমীপে।

নিজের রূপ-লাবণ্য প্রদর্শন করে বেড়ানোর পরিবর্তে হিজাব পালনের মাধ্যমে আমি আমার ঈমানের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকি। মানুষ হিসেবে আমার মর্যাদা নির্ভর করে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্কের ওপর, আমি দেখতে কেমন, তার ওপর নয়। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি আমি ঢেকে নিই। আর তাই আমার দিকে যখন তুমি তাকাও, তখন তুমি নিছক কোনো দেহ দেখতে পাও না। আমাকে তখন তুমি দেখ আমার প্রকৃত পরিচয় তথা আল্লাহর একজন অনুগত বান্দি হিসেবে।

দেখ, একজন মুসলিম নারী হিসেবে এই সব নীরব দাসত্ব হতে আমি নিজেকে মুক্ত করেছি। আল্লাহর বান্দা বা গোলামদের কাছে আমি জবাবদিহি করি না। আমি জবাবদিহি করি তাদের মালিকের নিকট।

সলাতে নারীদের ইমামতি সম্পর্কে একজন নারীর ভাবনা

২০০৫ সালের ১৮ই মার্চ আমেনা ওয়াদুদ[৬৩] প্রথম বারের মতো একজন নারী হিসেবে জুমুআর সলাতে ইমামতি করান। পুরুষের মতো হওয়ার অগ্রযাত্রায় ওই দিনটি সত্যই নারীর জন্য বেশ বড় রকমের পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কি আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতা বাস্তবায়নে সত্যিকার অর্থে এগুতে পেরেছি?

আমি তা মনে করি না।

আমরা প্রায়শই যে কথাটি ভুলে যাই, তা হলোঃ আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি নারীকে সম্মানিত করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদ দৃশ্যপট থেকে যখন স্রষ্টাকে মুছে দিল, তখন পুরুষ ছাড়া আর কোনো মানদণ্ড বাকি থাকলো না। ফলশ্রুতিতে, তারা পুরুষের সাথে তুলনায় নারীর মর্যাদা নিরূপণে বাধ্য হলো। আসলে এর মাধ্যমে তারা এক ভ্রান্ত ধারণাকেই মেনে নিল। সে মেনে নিল যে, পুরুষই প্রকৃত মাপকাঠি আর এ ধারণা অনুসারে একজন নারী ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মানব মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ সে ঠিক একজন পুরুষের মতো হতে পারছে।

পুরুষ যখন নিজের চুল কেটে ছোট করলো, নারীও তখন নিজের চুল কাটতে চাইলো। পুরুষ যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিল, তখন সেও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠলো। একজন নারী এ সমস্ত জিনিস শুধু একটি কারণেই হস্তগত করতে চাইলো, তা হলোঃ তার স্ট্যান্ডার্ড তথা মাপকাঠি "পুরুষ"-এর তা আছে।

নারী যা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো, তা হচ্ছেঃ মহান আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ উভয়কেই মর্যাদাবান করেছেন তাদের বৈসাদৃশ্যময় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে,

[৬৩] আমেনা ওয়াদুদ ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক আফ্রিকান-আমেরিকান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি উগ্র নারীবাদী চিন্তা-চেতনা লালন করেন। আমেরিকার মসজিদগুলি এহেন জুমুআর জামাত আয়োজনে অস্বীকৃতি জানালে তিনি এক গির্জায় এই তথাকথিত জুমুআর সলাত আয়োজন করেন। এই কার্যক্রম সকল হকপন্থী ইসলামি চিন্তাবিদগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন –(সম্পাদক)।

তাদের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নয়। আর ১৮ই মার্চ মুসলিম নারীরা ঠিক একই ভুলটিই করলো।

প্রায় ১৪০০ বছর যাবৎ আলেম-উলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সলাতে ইমামতি করবে পুরুষগণ।[৬৪] মুসলিম নারী হিসেবে এই ব্যাপারটি নিয়ে এতো মাথা ঘামানোর কি আছে? যিনি সলাতে ইমামতি করেন, তিনি কোনো দিক দিয়েই রুহানিভাবে শ্রেষ্ঠ নন। কোনো কাজ পুরুষ করছে বলে, সেটাই শ্রেষ্ঠ হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। সলাতে ইমামতি করাটা ইমামতি বা নেতৃত্বের কারণে উত্তম, তা নয়। এটা যদি নারীদের দায়িত্ব হতো কিংবা এটা যদি রুহানি দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর কাজ হতো, তবে নবি (ﷺ) কেন আয়েশা বা খাদিজা অথবা ফাতেমার মতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিয়সী নারীদেরকে সলাতে ইমামতি করতে বলেননি? জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও এই মহিয়সী নারীগণ তো কখনো সলাতের ইমামতি করেননি।

কিন্তু আজ ১৪০০ বছর পর এই দিনে পুরুষদেরকে সলাতে ইমামতি করতে দেখে প্রথমবারের মতো আমাদের মনে এই চিন্তার উদয় ঘটেছে, "এটা তো ইনসাফ হলো না।" আমরা এমনটি ভাবছি, যদিও আল্লাহ ইমামতি করার মাঝে আলাদা কোনো মর্যাদা রাখেননি। আল্লাহর চোখে ইমামের মর্যাদা তার পেছনের সলাত আদায়কারী ব্যক্তির চেয়ে বেশি নয়।

অন্যদিকে কেবল নারীরাই মা হতে পারেন এবং আল্লাহ মাকে দিয়েছেন বিশেষ মর্যাদা। নবি (ﷺ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, মায়ের পদতলে রয়েছে জান্নাত। কিন্তু একজন পুরুষ যাই করুক না কেন, সে কখনো মা হতে পারবে না। তাহলে এটা কেন বৈষম্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না?

---

[৬৪] এখানে নারী পুরুষের সম্মিলিত সলাতের কথা বলা হয়েছে। কারণ, শুধু নারীদের মধ্যে যে সলাতের জামাত হয়, তাতে নারীরা ইমামতি করতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই –(সম্পাদক)।

যখন প্রশ্ন করা হলো, 'আমাদের থেকে উত্তম আচরণ পাওয়ার কে বেশি হকদার?" "তোমার পিতা" কথাটি বলার আগে নবি (ﷺ) তিন তিনবার বলেন, "তোমার মা।" এটা কি লিঙ্গ বৈষম্যবাদের মধ্যে পড়বে? একজন পুরুষ আর যাই করুক না কেন, মায়ের মর্যাদা তার কপালে জুটবে না।

তা সত্ত্বেও, এমনকি আল্লাহ যখন আমাদের নারীদের এমন কিছু দিয়ে সম্মানিত করেন, যা শুধুই নারীসুলভ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, তখন আমরা পুরুষের সাথে তুলনা করে নিজেদের মর্যাদা খুঁজতে ব্যস্ত। এমনকি আমাদের সেই সব তুলনাহীন মর্যাদাসমূহ লক্ষ্য করতেও আমরা ব্যর্থ। আসলে আমরা নারীরাও পুরুষদেরকে মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছি, তাই যে বৈশিষ্ট্যগুলো একান্তই নারীসুলভ, সংজ্ঞাগতভাবে সেগুলো হেয়তর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। লাজুক ও সংবেদনশীল হওয়াটা অপমানজনক, আর মা হওয়াটা তো অধঃপতিত হওয়ার শামিল। পুরুষালি বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত নিরেট যুক্তিবাদ এবং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত স্বার্থহীন মায়া ও মমতার মাঝে যে দ্বন্দ্ব চলে, তাতে যুক্তিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

পুরুষের যা আছে এবং পুরুষ যা করে, তার সবকিছুকে যখন আমরা উত্তম হিসেবে মেনে নেই, তখন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ সিদ্ধান্ত আসে যে, পুরুষের যদি এটা থাকতে পারে, তবে আমরা নারীরাও সেটা চাই। পুরুষরা কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলে আমরা ভেবে নিই যে, এটাই উত্তম, তাই আমরাও সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে চাই। যেহেতু পুরুষরা সলাতে ইমামতি করে – আর আমরা ধারণা করে নিই যে, ইমাম সাহেব তো আল্লাহর নিকটবর্তী, তাই আমরাও ইমামতি করতে চাই। এমনিভাবে কোনো এক সময় আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, দুনিয়াতে নেতৃত্বের কোনো একটা অংশ লাভ করাটা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটা আলামত বহন করে।

একজন মুসলিম নারীর নিজেকে এভাবে অবমূল্যায়ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহই তার মাপকাঠি। সম্মান লাভের জন্য তিনিই তার জন্য যথেষ্ট, এটার জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন তার নেই।

প্রকৃতপক্ষে, পুরুষদেরকে অনুসরণ করার আমাদের এ ক্রুসেডে নারী হিসেবে আমরা একটি বারের জন্যও এই সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে দেখিনি যে, হয়তোবা আমাদের যা আছে, সেটাই আমাদের জন্য উত্তম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল পুরুষের মতো হতে গিয়ে আমরা উন্নততর জিনিসকে বিসর্জন দিয়েছি। পঞ্চাশ বছর আগে, সমাজ আমাদেরকে বলেছে যে, ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য পুরুষরা ঘর থেকে বের হয়, তাই পুরুষেরা শ্রেষ্ঠ। আমরা ছিলাম মা। কিন্তু আমাদেরকে বলা হলো, আরেকজন মানুষকে লালন পালন করার দায়িত্ব ফেলে দিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে পড়ার মাঝেই নারীর স্বাধীনতা নিহিত। আমরা মেনে নিয়েছি, সমাজের ভিত্তি (তথা ভবিষ্যৎ বংশদের) গড়ার চেয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করাটাই শ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র এই কারণে যে, পুরুষরা এই কাজ করে তাই।

তারপর, কাজের শেষে আমাদের কাছ থেকে অতি মানবীয় ভূমিকা আশা করা হতো। আমাকে হতে হবে আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ গৃহিণী এবং সেই সাথে একটা আদর্শ ক্যারিয়ার থাকতে হবে। একজন নারীর একটা ক্যারিয়ার থাকার মধ্যে দোষনীয় কিছু নেই, কিন্তু শীঘ্রই আমাদের বোধোদয় হতে শুরু করে যে, পুরুষকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে আসলেই আমরা নিজেদেরকে বলি দিয়ে ফেলেছি। আমাদের চোখের সামনে আমাদের সন্তানগুলো কেমন যেন অচেনা ও অপরিচিত হয়ে উঠলো এবং যে বিশেষ সুবিধা আমরা বিসর্জন দিয়েছি, তা শীঘ্রই আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি।

আর তাই তো, এখন যখন পশ্চিমা নারীবাদীদের সুযোগ দেওয়া হলো, তখন তারা তাদের সন্তানদেরকে লালন পালনের জন্য বাড়িতে অবস্থান করাকে বেছে নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য মোতাবেক, বাচ্চাসহ মা-দের শতকরা ৩১ জন এবং দুই বা ততোধিক সন্তানসহ মা-দের মাত্র শতকরা ১৮ জন ফুল টাইম (পূর্ণ সময়) কাজ করছেন। ২০০০ সালের প্যারেন্টিং ম্যাগাজিন কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী এইসব কর্মজীবী মা-দের মধ্য থেকে শতকরা ৯৩ জন মা বলেছেন তারা বরং তাদের বাচ্চাদের সাথে বাড়িতে থেকে যেতে চান, কিন্তু 'অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার' কারণে তারা কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এ সমস্ত 'বাধ্যবাধকতা' লিঙ্গ সমতার দাবিদার আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নারীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, যেখানে ইসলাম লিঙ্গ বৈচিত্রতার ভিত্তিতে নারীর কাঁধ থেকে এসব 'বাধ্যবাধকতার' জিঞ্জির অপসারণ করেছে।

মুসলিম নারীগণকে ১৪০০ বছর আগে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার মর্ম উপলব্ধি করতে পশ্চিমা সভ্যতার প্রায় শত বৎসর ব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। নারী হিসেবে আমাকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে মর্যাদাকে আমি তখনই ভূলুণ্ঠিত করি, যখন আমি যা নই, তা হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। পূর্ণ সততার সাথে বলছি, পুরুষের মতো হওয়ার চেষ্টা করবেন না। নারী হিসেবে যতক্ষণ না আমরা পুরুষের অনুসরণের চেষ্টা বন্ধ করবো এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহর দেওয়া বৈচিত্রমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যগুলির সৌন্দর্যের কদর না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সত্যিকার স্বাধীনতা মিলবে না।

যদি নিরেট ন্যায়বিচার এবং মমতার মাঝে বাছাই করতে দেওয়া হয়, তবে আমি মমতাকেই বেছে নেবো। আর যদি আমার পায়ের সামনে দুনিয়াবি নেতৃত্ব ও জান্নাতকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আমি জান্নাতকেই বেছে নেবো।

পৌরষ ও দৃঢ়তার মুখোশ

গত সপ্তাহে আমার বোন ফোন করেছিল। গ্রীষ্মের শুরু থেকেই সে বিদেশে অধ্যয়নরত, তাই স্বভাবতই আমি তার কল পেয়ে পুলকিত বোধ করি। সে কেমন আছে জানার পর, আমি তার নতুন বাড়ি-ঘর সম্পর্কে জানতে চাই। যেহেতু সে একটি মুসলিম দেশে বসবাস করছে, তাই আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আর তাই ক্ষণিককাল বাদে সে আমাকে যা শোনালো, তাতে আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সে এমন এক স্থানের বিবরণ শুরু করে, যেখানে পথচারী পুরুষদের থেকে মৌখিকভাবে নাজেহাল হওয়া ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। (নারীকে লক্ষ্য করে) শিস দেওয়া সেখানে আর অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং তা রীতিমত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এরপর সে তার পরিচিত এক মুসলিম মেয়ের কথা জানালো। মেয়েটি ট্যাক্সি চড়ে যাচ্ছিলো এবং যখন সে গন্তব্যে পৌঁছায়, তখন চালককে সে ভাড়া দেয়। এ সমস্ত দেশে নিয়মতান্ত্রিক মিটার না থাকায় না থাকায় ভাড়ার পরিমাণ কিছুটা অযৌক্তিক হওয়ায় ওই চালক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত বাক বিতণ্ডার মাত্রা বাড়তে বাড়তে এতটাই তুঙ্গে উঠে যে, ওই চালক নারীর কাঁধ ধরে রীতি মতো তাকে ঝাঁকাতে শুরু করে। এই পর্যায়ে ওই মেয়েটি রেগে গিয়ে চালককে অপমান করে বসে। এ সময় ওই চালক এই যুবতীর মুখে ঘুষি মারে।

এই পর্যায়ে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। কিন্তু আমার বোন এরপর যে কথাগুলো বলে, সেগুলো তো আরও ভয়ানক। নিকটেই একদল পুরুষ পুরো ঘটনা দেখছিল, তারা এ অবস্থায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্বভাবতই তারা নারীটিকে সাহায্য করার জন্যই সেখানে ছুটে গিয়েছিল।

কিন্তু না, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

এই পর্যায়ে এসে অবাক বিস্ময়ে আমি ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করি। হঠাৎ করেই পুরুষত্ব সম্পর্কে আমার সকল পূর্ব ধারণাকে আমি প্রশ্ন করতে শুরু করি। আমি অবাক হয়ে ভাবতে বসলাম, কিভাবে একজন নয় বরং বহু সংখ্যক পুরুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন নারীকে নির্যাতিত হতে দেখেও হাত গুটিয়ে বসে একেবারে কিছুই না করে থাকতে পারে। আমার মধ্যে প্রশ্ন জন্ম নেয় যে, আজকের সমাজে

পুরুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার জন্য ঠিক কি ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। পৌরুষের সংজ্ঞা কি এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে, তা কেবল লাগামহীন যৌন কামনা চরিতার্থ করায় পর্যবসিত হয়েছে? রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ইভটিজিং ও শিস দানরত চালকের দলই কি এখন "বীর পুরুষ" (*knight in shining armour*)-এর প্রতিমূর্তির স্থান দখল করেছে? সর্বোপরি, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আজকের যুগে একজন মুসলিম পুরুষ বলতে আসলেই কি বুঝায় তা নিয়ে ভাবতে আমি বাধ্য হলাম। আমি ভাবতে থাকি মুসলিম হিসেবে আমাদের সুপরিচিত সংজ্ঞাগুলো আসলেই কি যথাযথ। আজকের যুগে আশা করা হয় যে, পুরুষরা হবেঃ নির্বিকার, আবেগহীন, ভাবলেশহীন, শক্ত প্রকৃতির এবং অনমনীয়। শারীরিক আগ্রাসনকে মহিমান্বিত করা। আর অপরদিকে আবেগের প্রকাশকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এ অবস্থায় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম পুরুষ বলতে আসলেই কি বুঝায়, তা আমি যাচাই করে দেখবো। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম (শ্রেষ্ঠতম পুরুষ)[৬৫] মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিতে।

আজকের দিনে পৌরষের সবচেয়ে স্বাভাবিক সংজ্ঞা হলোঃ পুরুষের মধ্যে আবেগের প্রকাশ থাকবে কম। এটা প্রায় সার্বজনীন একটা ধারণা যে, কান্নাকাটি একটা "অপুরুষ সুলভ" এবং দুর্বল আচরণ। আর তা সত্ত্বেও নবি (ﷺ) এটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন তার মৃত্যু পথযাত্রী মুমূর্ষ নাতিকে নবি (ﷺ)-এর নিকট দেওয়া হলো, তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। সাহাবি সাদ তাকে বলেন, "এটা কি, ইয়া রাসুলুল্লাহ! নবি (ﷺ) বলেন, 'এটা হলো রহমত, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তার হৃদয়ে এটি দিয়ে দেন। আর আল্লাহ তাঁর দয়াদ্র বান্দাদের প্রতিই দয়া করে থাকেন।" [বুখারি][৬৬]

কিন্তু আজ, পুরুষের নিকট থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে, সে তার কষ্টের অনুভূতিগুলি লুকিয়ে রাখবে। তদুপরি, এর সাথে সাথে শিশুকাল থেকে তাকে এও শিক্ষা দেওয়া হয়ে যে, তার অন্যান্য আবেগ-অনুভূতিগুলিও প্রকাশ করা যাবে না। নবি (ﷺ)-এর যুগেও কিছু কিছু মানুষের এমন ধারণা ছিল। একবার গ্রামের এক লোকের সামনে নবি (ﷺ) তার নাতিদের কপালে চুমো দেন। এই দৃশ্য দেখে ওই গ্রাম্য লোকটি বেশ অবাক হয়ে বলে উঠে, "আমার দশ দশটি সন্তান আছে, আমি তো তাদের কাউকেও কখনো চুমু দেইনি।" নবি (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "যার অন্তরে দয়া-মায়া নেই, সে (আল্লাহর) দয়া পাবে না।" [বুখারি] প্রকৃতপক্ষে, স্নেহ,

---

[৬৫] – (সম্পাদক)।

[৬৬] বুখারি, তাওহিদ প্রকাশনী, হাদিস নং: ৫৬৫৫ – (সম্পাদক)।

মায়া-মমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নবি (ﷺ) ছিলেন অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেন: "কেউ যদি তার মুমিন ভাইকে ভালোবাসে, তবে সে যেন তার ওই ভাইকে বলে দেয়, সে তাকে ভালোবাসে।" [আবু দাউদ]

নবি (ﷺ) তার স্ত্রীগণের প্রতিও অত্যধিক ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, নবি (ﷺ) তার পাশে বসে আহার করতেন। তারা উভয়ে একই পেয়ালা থেকে পানি পান করতেন। পানির পেয়ালার যেখানে আয়েশা তার ঠোঁট রাখতেন, নবি (ﷺ) সেটা দেখে রাখতেন এবং ঠিক ওই স্থানেই তিনি নিজের ঠোঁট রেখে চুমুক দিতেন। আয়েশার খাওয়া (মাংসল) হাড়ের (অবশিষ্ট) অংশ থেকে তিনি খেতেন, যে অংশে আয়েশা মুখ দিয়েছেন, সেখান থেকে তিনি খেতেন। [মুসলিম] পৌরষত্বের ব্যাপারে যে বিষয়টি বহুল প্রচলিত, তার বিপরীতে গিয়ে নবি (ﷺ) গৃহস্থালির কাজেও প্রায়শই সহায়তার হাত বাড়াতেন। আয়েশা থেকে বর্ণিত, "নবি মুহাম্মদ (ﷺ) নিজের জামা নিজেই সেলাই করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং গৃহস্থালির কাজকর্মে সাহায্য করতেন।" [মুসলিম ও বুখারি]

তবে, পুরুষদেরকে কেমন হতে হবে, সম্ভবত সেটার সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হলো যে, তাদেরকে 'শক্ত ও কঠিন প্রকৃতির' হতে হবে। নম্রতা ও কোমলতা সাধারণতঃ নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবি (ﷺ বলেন: "আল্লাহ বিনয়ী, তাই তিনি বিনয় ও নম্রতাকে ভালোবাসেন। বিনয় ও নম্রতা জন্য তিনি তাই প্রদান করেন, যা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর জন্য দান করেন না।" [মুসলিম] তথাপি, পৌরষের আধুনিক সংজ্ঞা থেকে সেই বিনয় ও নম্রতা আজ অনেকখানি হারিয়ে গেছে। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার যে, রাস্তায় কোনো নারীর ওপর যৌন হয়রানি চালানোকে একজন তরুণ পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ভাবছে, অথচ তার পৌরষে কোনো প্রশ্ন উঠছে না, যখন একটা মেয়েকে জনসম্মুখে আঘাত করা হচ্ছে এবং সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষয়টি দেখছে। এটা চিন্তার খোরাক জোগায় যে, বাস্তবিকপক্ষে পৌরষের যে নমুনা আমাদের সামনে বিরাজমান, তা নবি পাক (ﷺ)-এর চেয়ে হলিউডের কোনো গ্যাংস্টার বা গুণ্ডার সাথেই বেশি মিল খায়।

উম্মাহ

এই আঁধারে ঢাকা স্থানই শেষ অবস্থা নয়। মনে রাখবেন, রাতের আঁধার অনুসরণ করেই ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হয়। আর যতক্ষণ আপনার হৃদয়ের স্পন্দন রয়েছে, ততক্ষণ তা মৃত নয়। আপনাকে এখানেই মরতে হবে না। কখনো কখনো সমুদ্র তলদেশ যাত্রাপথের একটা বিরতি মাত্র। আর যখন আপনি একেবারে তলানীতে উপনীত হন, তখন আপনার সামনে সুযোগ আসে বাছাই করার। হয় আপনি ডুবে যাওয়া পর্যন্ত এই তলানীতেই পড়ে থাকবেন, আর না হয় (এখান থেকে) মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে আবার উঠে দাঁড়াবেন – এই সাঁতার (নামক সংগ্রামের মাধ্যমে) আরও শক্তিমান হয়ে এবং মণি-মুক্তা (নামক অভিজ্ঞতা)[৬৭] হতে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে।

[৬] – (সম্পাদক)।

তকমাগুলি তুলে দিন

আপনি কোন ধরনের মুসলিম? প্রশ্নটি বেমানান লাগতে পারে। কিন্তু যারা ইসলামকে নানা নামে বা পরিচয়ে বিভক্ত করে – এর ওপর বিজয়ী হতে চায়, তাদের কাছে এর জবাব দিন-দিন বেশ গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এর থেকে গোলমেলে হলো: আমরা নিজেদের জন্য যেসব তকমা বা লেবেল স্থির করছি।

ভাই বোনদের সাথে কখনো আমাদের মতের অমিল হয়নি, এটা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকের পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু পরিবারের কোনো লোক যদি কোনো ভুল করে, এমনকি বড় ধরনের কোনো ভুল করে অথবা পরিবারের কোনো সদস্য এমন কোনো মত পোষণ করে, যার সাথে আমরা একমত নই, তথাপি আমাদের মধ্য থেকে খুব কম লোকই ওই পরিবারকে ডিভোর্স দিয়ে তথা সম্পর্ক ছেদ করে নিজেদের পারিবারিক পরিচয় পাল্টে নেবে। (দুর্ভাগ্যজনকভাবে) আজ বৃহত্তর মুসলিম পরিবারের (তথা মুসলিম উম্মাহর) জন্য এই কথা আর সত্য নয়।

আজ আমরা আর কেবলই 'মুসলিম' নই। আমাদের কেউ আজ 'প্রগতিশীল', কেউ ইসলামিস্ট', কেউ 'রক্ষণশীল', কেউ 'সালাফি', কেউ 'দেশীয়', আবার কেউ 'অভিবাসী'। প্রতিটি দল একে অপরের প্রতি এতটাই বৈরি ভাবাপন্ন যে, আমরা ভুলেই গিয়েছি যে, আমরা সবাই একই বিশ্বাস ও আদর্শের অনুসারী।

যদিও, আমাদের উম্মাহর মাঝে বাস্তবিকই কিছু কিছু ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তথাপি কোনো এক জায়গায় কিছু একটা ভালো রকম গড়বড় হয়ে গেছে। ইসলামি সীমার মাঝে মতভেদকে শুধু সহ্যই করা হয় না, বরং এটাকে আল্লাহর রহমত হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু যেইমাত্র আমাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারীদেরকে আমরা নানা তকমা বা লেবেল দিই এবং তাদেরকে কোনঠাসা করতে থাকি, তখনই কার্যত আমাদের পতন শুরু হয়। যখনই আমরা এসমস্ত লেবেলকে মেনে নিই এবং এগুলোকে পরিচয়ের মূল উৎস হিসেবে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিই, তখন এর ফলাফল হয় মারাত্মক। ফলশ্রুতিতে আমরা নিজেদের ক্যাম্প তৈরি করি, নিজেদের সভা ও সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করি এবং শীঘ্রই আমরা কেবল তাদের সাথেই সম্পর্ক রাখি, যারা আমাদের সাথে এক মত পোষণ করে। এতে করে উম্মাহর মাঝে আভ্যন্তরীণ সংলাপ বিদায় নিতে থাকে, নিজেদের মতপার্থক্যগুলো আরও বেশি হতে

থাকে এবং আমাদের মতগুলো আরও চরমপন্থী রূপ ধারণ করতে থাকে। আর শীঘ্রই আমরা দুনিয়ার 'অন্যান্য' মুসলিম গোষ্ঠীর কি হলো, সে ব্যাপারে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দিই। এভাবে নবি (ﷺ)-এর দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী এক দেহ তুল্য উম্মাহ হতে আমরা একেকটি অঙ্গ কেটে বাদ দিতে থাকি। 'ভিন্ন' মতালম্বী (যারা এখনো প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ভাই), তারা আমাদের কাছে সম্পর্কহীন অপরিচিতের মতো হয়ে যায়। এমনকি আমরা তাদেরকে এতটাই ঘৃণা করতে শুরু করি যে, যে আমরা আর একই নামে পরিচিত হতে চাই না। বরং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) শত্রুদের সাথে হাত মেলাতে দ্বিধা করি না।

যে মতপার্থক্য এক সময় ছিল রহমত ও আশীর্বাদস্বরূপ, সহসাই তা রূপ নেয় অভিশাপে। পরিণত হয় ইসলামকে পরাস্ত করার হাতিয়ারে। আমাদের শত্রুরা "আমাদেরকে আক্রমণের জন্য একে অপরকে ডাকতে থাকে, যেমন খাবারে শরিক হওয়ার জন্য একে অপরকে দাওয়াত করে।" (আবু দাউদ)

২০০৪ সালের ১৮ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী থিংক ট্যাংক *RAND* (র‍্যান্ড) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্টে তারা ইসলামকে 'সভ্য' বানাতে সাহায্য করার জন্য ইসলামকে মুছে ফেলে সেটাকে পশ্চিমা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আদলে পুনর্গঠনের পরামর্শ দেয়। *Civil Democratic Islam: Partners, Resources, Strategies* শিরোনামের ওই রিপোর্টে শেরিল বেনার্ড লিখেন, "বস্তুত আধুনিকতাবাদ পশ্চিমের জন্য ফায়দা আনে, রক্ষণশীলতা নয়। এই আধুনিকতাবাদের মধ্যে জরুরি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাস থেকে সরে আসা, সেগুলোর মাঝে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা এবং সেগুলো থেকে বাছাইকৃত অংশ উপেক্ষা করা।"

ইসলামের আদর্শ "থেকে সরে আসা, সেগুলোর মাঝে পরিবর্তন আনা এবং বাছাইকৃত অংশ উপেক্ষা করার" জন্য বেনার্ড একটি সহজ কৌশলের সন্ধান দেন এবং তা হচ্ছে: (ইসলামের অনুসারীদের ওপর বিভিন্ন) লেবেল লাগানো, বিভক্তি ছড়ানো এবং (এর মাধ্যমে তাদের) নিয়ন্ত্রণ করা। প্রতিটি মুসলিম দলের ওপর একটি লেবেল বা তকমা লাগানোর পর, তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য এই মহিলা পরার্মশ দেন। "রক্ষণশীল ও মৌলবাদীদের মাঝে মতভেদকে উসকে দেওয়া" এবং "রক্ষণশীল ও মৌলবাদীদের মাঝে সমঝোতাকে নিরুৎসাহিত করার" জন্য বেনার্ড পরামর্শ দেন।

এইভাবে সফলতার সাথে বিভক্তি তৈরি এবং 'আধুনিকতাবাদী'/ প্রগতিশীল' মুসলিমদেরকে সমর্থন করার মাধ্যমে বেনার্ড আশা করেন এক প্রকার 'সুশীল

গণতান্ত্রিক' ইসলাম আবিষ্কার করার, যা কিনা কম পশ্চাৎপদ এবং কম ঝামেলা প্রবণ। আরও নির্দিষ্টভাবে তিনি এমন এক ইসলাম তৈরির আশা করেন, যে ইসলাম পাশ্চাত্যের নব্য রক্ষণশীলদের[৬৮] কর্তৃত্ববাদী এজেন্ডার সামনে মাথা নুইয়ে দেবে।

অতএব যদি ইসলামকে বিকৃত করার প্রথম পদক্ষেপ হয়: (মুসলিমদের) মধ্যে বিদ্যমান লেবেল বা তকমাসমূহ থেকে ফায়দা নেওয়া, তবে আসুন সবাই বলে দিই, '*Thanks, but no thanks.*' আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (কুরআন, ৩:১০৩) আমাদেরকে এবং আমাদের ধর্মকে (তথাকথিত)[৬৯] 'সভ্য' বানানোর যে মিশনে তুমি নেমেছো, সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, তবে তা আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে। বিকৃত ও মান্ধাতার আমলের জিনিসই পুনর্গঠনের মুখাপেক্ষী এবং ভেঙে যাওয়া জিনিসকেই আপনি মেরামত করতে পারেন। আর যখন এটা শুনতে ভালই লাগে যে, তোমরা আমাদেরকে "আধুনিক" বা "মধ্যপন্থী" বলে অভিহিত করতে চাচ্ছো, তবে এসব আতিশয্য আমাদের না হলেও চলবেও। সংজ্ঞাগত দিক দিয়েই ইসলাম মধ্যপন্থী, তাই যতই মজবুতভাবে আমরা ইসলামের মৌলনীতিসমূহ মেনে চলবো, আমরা ততই মধ্যপন্থী হতে সক্ষম হবো। আর প্রকৃতিগতভাবে ইসলাম কালোত্তীর্ণ ও বিশ্বজনীন। তাই প্রকৃতঅর্থে ইসলামিক হতে পারলে আমরা সব সময়ই আধুনিক হতে সক্ষম হবো।

আমরা "প্রগতিশীল"-ও নই, "রক্ষণশীল"-ও নই। "নব্য-সালাফি"-ও না, "ইসলামিস্ট"-ও না। না আমরা "প্রাচীনপন্থী", না "ওহাবি"। অভিবাসীও নই, দেশীয়ও নই। ধন্যবাদ, তোমাদের দেওয়া এসব তকমার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।

আমরা কেবলই মুসলিম। (এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়)[৭০]।

[৬৮] নব্য রক্ষণশীল: "*Neoconservative*" সংক্ষেপে "*Neocon*"। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন। এরা বিশ্বব্যাপী তাদের ধ্যানধারণা ভিত্তিক গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করে – (সম্পাদক)।

[৬৯] – (সম্পাদক)।

[৭০] – (সম্পাদক)।

মুসলিম হও – তবে অবশ্যই মডারেট[৭১] হতে হবে

২০০৪ সালে সিনেটর জন কেরি তার প্রথম প্রেসিডেনসিয়াল বিতর্কের রাতটি দিনের শ্রেষ্ঠ সুবিধাটির (*Favour of the day*) মাধ্যমে শুরু করেন। তাকে করা প্রথম প্রশ্নের জবাবে ব্যাখ্যা করে কেরি বলেন, "গোড়া ইসলামপন্থী মুসলিমদের" (*Radical Islamic Muslims*) (মুসলিমদের থেকে) আলাদা করা এখন আমেরিকার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে:

> "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য আমার কাছে অধিকতর উত্তম এক পরিকল্পনা রয়েছে ... (আর তা হলো)[৭২] গোড়া ইসলামপন্থী" মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে কাজটা শুরু করতে হবে, যাতে করে তারা আমেরিকাকে (বাকি মুসলিম বিশ্ব হতে) বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ না পায়।"

প্রথমে মনে হবে এটা একটা অর্থহীন ও মুর্খতাসুলভ বক্তব্য। মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে, যিনি ইসলাম মেনে চলেন, তাই সংজ্ঞা অনুযায়ীই তিনি "ইসলামিক"। "ইসলামিক মুসলিমগণ" বলা অনেকটা "মার্কিন আমেরিকানগণ" বলার মতোই। তাহলে কেরি কি শুধুই শব্দের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন? নাকি তার এ বক্তব্য এমনকি তার উপলব্ধির চেয়েও বেশি কিছু বলছিল? সকল মুসলিমই কি "ইসলামিক"? সত্য কথা হলো, না, তা নয়। অন্ততঃপক্ষে (তথাকথিত) ভালো মুসলিমরা তো নয়ই।

অধিক থেকে অধিকতর হারে মৌলিক অনুমান হলো: ইসলামই মূল সমস্যা। বিশ্বাসগতভাবে ইসলামের সহজাত প্রকৃতিই যদি হয় চরমপন্থাসুলভ, তবে কোনো জিনিস যত কম "ইসলামিক" হয়, তা ততই ভালো হবে। আর তাই সবচেয়ে লোভনীয় উপাধি "মডারেট মুসলিম" হলেন, পরিমিতভাবে মুসলিম (পুরোপুরি না), আর সে কারণে তিনি একেবারে পুরোপুরি খারাপ নন। এটা যেন একজন কালো

---

[৭১] মডারেট শব্দের অর্থ সাধারণভাবে মধ্যপন্থী করা হয়। তবে বাস্তবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপন্থীরা যখন এই শব্দটি ব্যবহার করে, তখন এর অর্থ হলো: নরমপন্থী বা সহনীয় মুসলিম, নিয়ন্ত্রিত মুসলিম। যিনি পাশ্চাত্য অনুমোদনের ভিত্তিতেই ইসলামের বিধানসমূহ মানেন অথবা যারা ইসলামের বিধানসমূহ মানেন না, কেবল নামেমাত্র মুসলিম পরিচয়ে সন্তুষ্ট –(সম্পাদক)।

[৭২] – (সম্পাদক)।

মানুষকে "মধ্যপন্থী কালো" বলা, যার অর্থ হলো: তিনি খুব একটা উগ্র নন (অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয় যে, নিগ্রো বা কালোরা অত্যন্ত হিংস্র ও উগ্র। মধ্যপন্থীরা কেবল ততটা না) বিপরীতপক্ষে একজন মুসলিম, যিনি বেশ ইসলামিক, উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে তিনি নিশ্চয়ই কট্টরপন্থী, উগ্রবাদী। তাই এরকম উগ্রপন্থী মৌলবাদীকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে এবং তা করতে হবে তাকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে।

বাস্তবিকপক্ষে, মোনা মেফিল্ড[৭৩] এসব নিয়ম ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। যখন তিনি স্পেনে বোমা হামলার ঘটনায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত স্বামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

"আমাদের ঘরে একটি বাইবেলও আছে, ও মৌলবাদী নয়। সে ইসলামকে ভিন্ন ও অনন্য কিছু ভেবেছিল", মেফিল্ড সংশ্লিষ্ট প্রেসকে তার স্বামীর ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা [এভাবে] অবগত করেন।

তার স্বামীকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মেফিল্ড তার স্বামী যে ইসলামের প্রতি অতটা অনুগত না, তা দেখাতে চাইলেন। এমনকি তিনি তার স্বামীর ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যেন ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়াটা তার স্বামীর জন্য অপরাধ হয়েছিল।

মসজিদ পরিচালক শাহরিয়ার আহমেদও মেফিল্ডের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে একই ধরনের পন্থা বেছে নেন। রিপোর্টারদেরকে আহমেদ বলেন, "তাকে একজন মডারেট মনে করা হতো। সে শুক্রবারের জুমুআ আদায়ের জন্য (মসজিদে) এসে উপস্থিত হতো; জুতা খুলে, ওজু করে খুতবা শোনার জন্য কার্পেটের ওপর এসে বসতো। ধর্মভীরু মুসলিমদের মতো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার মতো ধার্মিক সে ছিল না।"

এখানে ইঙ্গিতটা হলো, ব্রেন্ডন মেফিল্ডের অপরাধী বা নির্দোষ হওয়াটা যেন মসজিদে গিয়ে সে কত রাকাত সলাত আদায় করেছে, তার সাথে সম্পর্কিত। এমনকি আহমেদ এটা করতে চাইলেন যে, "বস্তুতপক্ষে সে কম ধার্মিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

[৭৩] মোনা মেফিল্ড: ব্র্যান্ডন মেফিল্ডের স্ত্রী। ব্র্যান্ডন মেফিল্ড একজন আমেরিকান মুসলিম। ২০০৮ সালে সংঘটিত মাদ্রিদ বোম্বিং-এর ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণপঞ্জী যথাযথ নয় এবং এফবিআই (*FBI*) স্বীকার করে যে, তাদের তদন্তে গুরুতর ত্রুটি ছিল। অতঃপর ব্র্যান্ডনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় –(সম্পাদক)।

একজন "গ্রহণযোগ্য" মুসলিমের কেমন হওয়া প্রয়োজন, তার নমুনা হিসেবে এ ধরনের "কম ধার্মিক" আইকনদের ছড়াছড়ি পাওয়া যায় গোটা মিডিয়াজুড়ে। মিডিয়া উদ্যোক্তা এবং *The Trouble with Islam* (ইসলাম নিয়ে সমস্যা) গ্রন্থের লেখক ইরশাদ মানজি[৭৪] এমনি প্রসিদ্ধ আইকনদের একজন। মানজির লেখা বহুল প্রকাশিত এবং প্রথম সারির প্রায় সকল মিডিয়া আউটলেটে তার সরব উপস্থিতি রয়েছে। 'সাহসিকতা'-র জন্য তিনি অপরাহর *Chutzpah* পদকও লাভ করেন।

যদিও মানজি নিজেকে একজন "অস্বীকারকারী মুসলিম" (*Muslim refusenik*)[৭৫] হিসেবে দাবি করেন, কিন্তু মিডিয়া তাকে 'প্র্যাকটিসিং মুসলিম' তথা ইসলাম পালনকারী আদর্শ মুসলিমের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে। *United States Institute of Peace* এর বোর্ড সদস্য ডেনিয়েল পাইপস[৭৬] তাকে "নির্ভীক, মডারেট ও আধুনিক মুসলিম" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাইপসের চিন্তাভাবনার সাথে শান্তির যেমন বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নেই, তেমনি মানজির চিন্তাভাবনার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রবন্ধে ইসলামি বিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ সলাত সম্পর্কে মানজির বোধোদয় তুলে ধরেঃ

> "এর পরিবর্তে সে নিজের মতো করে প্রার্থনা শুরু করে, নিজের পা, হাত এবং মুখ ধৌত করার পর সে মখমলের এক কম্বলে বসে পড়তো এবং মক্কার দিকে মুখ করতো। শেষ পর্যন্ত সে এটাও বন্ধ করে দেয়, কারণ অর্থহীন আনুগত্য এবং অভ্যাসগত আনুগত্যের জালে সে নিজেকে জড়াতে চায়নি।"

দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত ১.৫ বিলিয়ন মানুষের এই অনুশীলন তথা সলাত নিয়ে এমন মন্তব্য মানজি করতে পারে। এ ধরনের সকল অনুশীলনকে সে বর্জনও করতে পারে, কিন্তু প্রার্থনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিছক এমন একজন নারী হিসেবে মানজিকে চিত্রিত করা হচ্ছে না। ইসলামের একজন অনুসারী হিসেবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্গত বিষয় বর্জন করার তার (এই) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে দেখানো হচ্ছে তার মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে। (ধর্মীয়) নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম হিসেবে।

---

[৭৪] ইরশাদ মানজি কানাডায় বসবাসরত একজন লেখিকা। ইসলামের সংস্কার প্রয়োজন –এ ধরনের কথা, কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন –(সম্পাদক)।

[৭৫] *Refusenik*: এমন একজন যে কোনোকিছু পালন করতে অস্বীকার করে, বিশেষতঃ প্রতিবাদস্বরূপ –(সম্পাদক)।

[৭৬] ১৯৪৯ সালে জন্ম নেয়া এক মার্কিন ইতিহাসবিদ। তিনি একজন যুদ্ধবাজ ও ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি –(সম্পাদক)।

সে "অত্যন্ত সাহসী" ও "নির্ভীক" – অতিমাত্রায় ইসলামিক নয়, এমন মুসলিমদের জন্য সে আদর্শস্থানীয়ঃ অনুসরণযোগ্য।

এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে আদর্শ বানানোর মানে দাঁড়াচ্ছে, কাউকে 'অতিমাত্রায় কালো'[৭৭] অথবা 'অতিমাত্রায় ইহুদি' হতে বারণ করা। কেননা, এগুলো মৌলিকভাবেই মন্দ ও উগ্রপন্থী। আর যারা 'মডারেট কালো' বা 'মডারেট ইহুদি' তারাই প্রকৃত অর্থে মুক্তি সংগ্রামী। উদাহরণস্বরূপ, মানজি ওয়াশিংটন পোস্টকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সহিংসতা তো চলতেই থাকবে, তাহলে স্বাধীনতার স্বার্থে সহিংসতার ঝুঁকি কেন নয়?"

হ্যাঁ, স্বাধীনতা সত্যই আবশ্যক। মানজি ভালোই বলেছে। কেরি বলেছে আরও কৌশলের সাথে। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার *Imperial Valley College*-এর বিজনেস ম্যানেজমেন্টের এক প্রফেসর তো সবচেয়ে সত্য কথাই সহজভাবে বলে দিয়েছেন: "ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে শেষ করার একটিই পথ খোলা আছে, আর তা হচ্ছে ইসলাম ধর্মকে চিরতরে খতম করে দেওয়া।"

আপনি যেভাবেই বলুন না কেন, একটি বিষয় নিশ্চিত, আর তা হলোঃ বর্তমান সময়ে ইসলাম সম্পর্কে যখন বলা হচ্ছে, তখন যত কম হবে ততই বেশি (গ্রহণযোগ্য) হবে। (অর্থাৎ যত কম ইসলামিক হওয়া যাবে, ততই পাশ্চাত্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে)[৭৮]।

---

[৭৭] অতিমাত্রায় কালো দ্বারা নিগ্রোদেরকে বুঝানো হচ্ছে। পাশ্চাত্যের শেতাঙ্গদের সাধারণ ধারণা কালোরা উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসী –(সম্পাদক)।

[৭৮] লেখিকা এখানে ইসলাম নিয়ে পাশ্চাত্যের কৌশল তুলে ধরেছেন। সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা তারা করে না, এতে করে মুসলিমরা সচেতন হয়ে যেতে পারে। তাই তারা সূক্ষ্মভাবে মডারেট ইসলামের নামে নতুন এক ধারণা তৈরি করেছে। যেখানে একজন মুসলমান তো থাকবে, তবে সে/ তারা ইসলাম অনুসরণ করবে না। তাহলেই তারা পাশ্চাত্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে –(সম্পাদক)।

অবর্ণনীয় ট্রাজেডি এবং আমাদের উম্মাহর অবস্থা

আমার ধারণা মানুষের মনের গহীনে এমন এক জায়গা আছে, যখন কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না, তখন আমরা সেথায় লুকাই। আর সম্ভবত, মানুষের হৃদয়ে এমন একটা অংশ আছে, যেখানে অচিন্তনীয় ট্রাজেডিগুলি আমরা আজীবন প্রত্যক্ষ করতে পারি। তবে আজ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের লোকদের জন্য ট্রাজেডি আর মনের বা হৃদয়ের কোনো ভাবনা বা প্রতিচ্ছবিমাত্র নয়, বরং এটা তাদের একমাত্র বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

অসহায়ের মতো আমি যখন এসব দেশে চলমান হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করি, আমিও ভেবে পাই না যে, কোথায় যাবো। মনের মাঝে আমি এমন এক জায়গা খুঁজতে থাকি, যেখানে এই সব অর্থহীন কাজের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং কল্পনা করা যাবে যে, আসলে এসব কিছুই ঘটছে না। আমি হারিয়ে যাই। দুঃখ, রাগ ও নৈরাশ্যের মাঝে, আবার বাস্তবতায় ফিরে আসি। কিন্তু শেষ অবধি আমি ফিরে আসি এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি:

কেন?

কেন এমনটি হচ্ছে আমাদের সাথে? গোটা দুনিয়া জুড়ে কেন আমরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছি? কেন আমরা এতটা অসহায় যে, এগুলো থামানোর এতটুকু শক্তি আমাদের নেই? আমরা যে দেশের নাগরিক, রাজনৈতিকভাবে সে দেশেই আমরা কেন এতটা অক্ষম – অধিকারহীন? 'নিজেকে রক্ষা করার অধিকার ইসরাইলের আছে' হোয়াইট হাউজের প্রতিনিধিদের মুখ থেকে মন্ত্রের মতো অবিরাম এই বুলি শোনার জন্য কেনইবা আমরা নিজেদের সবটুকু শক্তি উজাড় করে তাদের বরাবর চিৎকার করি, চিঠি লিখি এবং আহ্বান করি? কেন আমরা এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি? কেন?

আমাদেরকে এই "কেন" প্রশ্নটিই করতে হবে?

আমাদের ধীর-স্থির ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, উম্মাহ (জাতি) হিসেবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থাই বা কি। একটা সময় ছিল দুনিয়া জুড়ে মুসলিমদেরকে যখন সমীহ করা হতো, যখন বন্ধুরা আমাদের ভালোবাসতো আর শত্রুরা ভয়ে কাঁপতো। আর আজ আমরাই পরিণত হয়েছি দুনিয়ার সবচেয়ে সমালোচিত, নিন্দিত এবং ঘৃণিত জাতিতে। সাম্প্রতিক সময়ে *Gallup poll* পরিচালিত সমীক্ষাতে ইসলাম সম্পর্কে প্রায় অর্ধেকের মতো আমেরিকানের মতে ইসলাম "তেমন একটা সন্তোষজনক নয়" অথবা "আদৌ সন্তোষজনক নয়" এবং শতকরা ৪৩ জন আমেরিকান অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অন্তত "অল্প" পরিমাণ হলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে তারা বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। খ্রিস্টান, ইহুদি কিংবা বৌদ্ধদের (প্রতি বিরূপ ধারণার) তুলনায় এ হার দ্বিগুণেরও বেশি।

এদিকে আমাদেরকে যে কেবল ঘৃণা করা হচ্ছে তা-ই নয়, বরং বহু স্থানে আমাদের ওপর চলছে অত্যাচারের স্টিম রোলার, চালানো হয় হত্যাযজ্ঞ এবং কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আমাদের যাবতীয় সহায় সম্পত্তি। যেখানে আমাদের শারীরিকভাবে টার্গেট করা হচ্ছে না, সেখানে অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয় আমাদের অধিকার, মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত, এমনকি কারারুদ্ধ করা হচ্ছে। বস্তুত মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচার ও বাগাড়ম্বর –এখন এক ধরনের গ্রহণযোগ্য গোড়ামীতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যের কদর এতটাই বেড়েছে যে, রাজনৈতিকভাবে সুবিধা আদায়ের স্বার্থে কেউ কেউ এটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

উম্মাহ হিসেবে নিজেদের আমরা এই যে অবস্থায় আবিষ্কার করছি, এর বিস্তারিত বিবরণ ১৪০০ বছর আগেই দেওয়া হয়েছিল।

> নবি মুহাম্মদ (ﷺ) তার সাহাবিগণকে (*রাদিআল্লাহু আনহুম*) উদ্দেশ্য করে বলেন:
>
> "তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য শীঘ্রই লোকজন একে অপরকে ডাকবে, যেন খাবারের টেবিলে শরিক হওয়ার জন্য একে অপরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।"
>
> একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "ওই সময় আমরা কি সংখ্যায় কম হবো, যে কারণে তারা এমনটি করবে?"
>
> তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, "না, বরং ওই সময় সংখ্যায় তোমরা বিপুল হবে, বরং তোমরা হবে ফেনার মতো, যেটাকে (সমুদ্রের) ঝড় আছড়ে ফেলে এবং

আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের হৃদয় থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে '*আল-ওয়াহন*' ঢেলে দেবেন।"

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রসুল, *আল-ওয়াহন* কি?" তিনি উত্তরে বলেন: এই দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" [আবু দাউদ এবং আহমদ কর্তৃক বর্ণিত সহিহ হাদিস]

যেমনিভাবে নবি (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ঠিক তেমনিভাবেই লোকজন খাবারে শরিক হওয়ার জন্য একে অপরকে আমন্ত্রণ জানানোর মতো করেই লোকেরা আমাদেরকে আক্রমণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এই হাদিসে নবি (ﷺ) আমাদের অবস্থা জলের ফেনার ন্যায় হবে বলেও আগাম বার্তা দিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি সমুদ্রের প্রবাহমান তরঙ্গরাজির দিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন তার ওপর ফেনার পাতলা আবরণ, যা সম্পূর্ণ ওজনহীন এবং তাতে সামান্যই সারবস্তু থাকে। বাতাসের হালকা প্রবাহই এটা ধ্বংস করে দিতে পারে। নিজের চলার পথ নির্ধারণ করার মতো ক্ষমতাও এটার নেই, বরং স্রোত এটাকে যে দিকে নিয়ে যায়, সে দিকেই এটা চলে।

এটাই আমাদের বর্তমান অবস্থা, যেমন নবি (ﷺ) বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আবারও ফিরে যেতে হবে সেই একই প্রশ্ন 'কেন'-এর দিকে। নবি (ﷺ) এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, অন্তরগুলো *ওয়াহন* দ্বারা ছেয়ে যাবে। *ওয়াহন* শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে, নবি (ﷺ) অল্প কথায় এটার যে জবাব দেন, তা সুগভীর এক সত্যকে ধারণ করে আছে। তিনি বলেন, "এই দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করা।" নবি (ﷺ) এখানে এমন লোকদের বিবরণ দিচ্ছেন, যারা পার্থিব জীবনে নিয়ে এতটাই মত্ত যে, দুনিয়া তাদেরকে বানিয়েছে নিদারুন স্বার্থপর, বস্তুবাদী, অপরিণামদর্শী এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। তিনি (ﷺ) এমন লোকদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা এতটাই দুনিয়াদার হয়ে পড়েছে যে, তারা নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে।

কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নৈতিকতার ক্ষেত্রে তার অবস্থার কারণে – হয় ভালো থেকে খারাপের দিকে, না হয় খারাপ থেকে ভালোর দিকে ঘটে। আল্লাহ *সুবহানাহু ওয়া তায়ালা* (মহিমান্বিত তিনি) আমাদেরকে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (কুরআন, ১৩:১১) অতএব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে একটি জাতি সুপার পাওয়ার থেকে সমুদ্রের জলরাশির তুচ্ছ ফেনাতে পরিণত হয়। আবার অন্তর ও চরিত্রকে পরিবর্তনের মাধ্যমেই যে জাতি ছিল এক সময় ছিল সমুদ্রের ফেনার মতো, তারাও পুনরায় শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে।

সেজন্য, মুসলিম হিসেবে আমাদের হতাশ হবার কারণ নেই। কারণ আল্লাহর দ্বীনের নাস্‌র (তথা সাহায্য ও বিজয়) প্রতিশ্রুতি আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি আর আমি এটার অংশ হবো কিনা। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদেরকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখন তিনি বলেন, "তোমরা দুর্বল হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি (সত্যিকারের) মুমিন হও।" (কুরআন, ৩:১৩৯)

একনিষ্ঠ ঈমান এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই আল্লাহ (ﷻ) আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। তাই সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আজকের দুনিয়ার সর্বত্র যারা রক্তাক্ত হচ্ছেন, অন্তত তাদের জন্য হলেও উম্মাহ হিসেবে আমাদেরকে জেগে ওঠা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

লোহিত সাগরের নবতর উন্মোচন: মিসরের ঘটনাবলির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

নবি মুসা (*আলাইহিস সালাম*) যখন লোহিত সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন পিছন থেকে ধেয়ে আসছিল এক অত্যাচারী রাজা ও তার বাহিনী। তা দেখে মুসা (*আলাইহিস সালাম*)-এর লোকদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। কেননা, সামনে তারা পরাজয় ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না।

"অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখলো, তখন মুসার সঙ্গিরা বলে উঠলো, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'" (কুরআন, ২৬:৬১)

কিন্তু মুসা (*আলাইহিস সালাম*) ছিলেন এক ভিন্নতর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। তার ছিল রুহানি দৃষ্টি, যা দুনিয়ার কষ্ট-বেদনা ও পরাজয়ের মিথ্যা বিভ্রম ভেদ করে দেখতে সক্ষম। এহেন পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি প্রকৃত অবস্থা দেখতে পেলেন। দৃশ্যমান আপাত অসম্ভব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন সেই সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মার অধিকারী মুসা (*আলাইহিস সালাম*) দেখলেন কেবল মহান আল্লাহর কুদরতকে:

"মুসা বললো, 'কখনোই নয়!আমার সাথে আছেন আমার প্রতিপালক; শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।'"

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

(কুরআন, ২৬:৬২)

"অতঃপর মুসার প্রতি ওহি করলাম, 'তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রতিটি অংশ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল। ওদিকে আমরা অপর দলটিকে সেখানে পৌঁছে দিলাম। মুসা ও তার সঙ্গি সকলকে আমি উদ্ধার করলাম, কিন্তু অপর দলকে আমরা ডুবিয়ে মারলাম।" (কুরআন, ২৬:৬১)

আজ আমরা মিসরে যেন এমনি এক লোহিত সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে। আজকের এই মিসরেও আমাদের ওপর হামলে পড়েছে এক নিপীড়ক ও তার সৈন্য বাহিনী। আজও কিছু লোকের চোখেমুখে শুধুই পরাজয়ের আশংকা। তা সত্ত্বেও কিছু

লোক আছে পথের সমস্ত অবরোধ ভেদ করে শুধুই তাদের দৃষ্টি প্রসারিত, আর তারা কেবল আশাল আলোই দেখে। আজকের এই মিসরে নিপীড়কদের অব্যাহত হামলারও মুখেও কিছু লোক এমন আছে, যারা বলেঃ

"নিশ্চয়ই, আমার সঙ্গে আছেন আমার রব; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।"

قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

কেউ বিস্মিত হতে পারেন, ইতিহাসের এমন সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা কেন প্রাচীন এক ঘটনা স্মরণ করছি। হাজার বছর আগে সংঘটিত ঘটনা আজকের যুগে কিভাবে প্রাসঙ্গিক? কারণ হলো, এটা কোনো সাধারণ গল্প নয়। প্রাচীন কিছুও নয়। এটা এক চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সর্বকালের জন্য এক উপদেশ। ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেনঃ

"নিশ্চিতভাবে এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এগুলো বিশ্বাস করে না।"'

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

(কুরআন, ২৬:৬৭)

এটাই আল্লাহর সত্যতার এক নিদর্শন এবং এই দুনিয়ার এক রহস্য। এটা এক নিদর্শন যে, স্বৈরাচারের কখনো জয় হয় না এবং যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা – সবই এক মায়াজাল, এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আমাদেরকে পরীক্ষা করতে, আমাদের প্রশিক্ষিত করতে এবং পরিশুদ্ধ করতে। সর্বোপরি সাফল্যের উৎস কি, এটা তারই একটা নিদর্শন। আর এটা হলো সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মুখে সফলতার একটি প্রতিচ্ছবি – এমন একটি সময়ে, যখন আমাদের মনে হয়, আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি, পরাজিত হয়েছি এবং বিরুদ্ধবাদীদের সামনে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছি।

কেউ হয়তো এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, সত্য-সত্যই যদি আমরা আল্লাহর পথে থেকে থাকি, তবে বিজয় আমাদের নিকটে সহজে ধরা দিচ্ছে না কেন? কেউ হয়তো অবাক হতে পারেন যে, এতসব প্রবল সংগ্রাম ও কুরবানি ছাড়াই কেন আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের বিজয়ী করে দেন না। এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

(কুরআন, ৭:৯৪)

"আমি কোনো জনপদে নবি পাঠালে তার অধিবাসীদের অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা নমনীয় হয় (অর্থাৎ তাদ্বাররু' পর্যায়ে উপনীত হয়)[৭৯]।"

এখানে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে, বালা ও মুসিবতের পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: তাদ্বারুরু' অবস্থা অর্জন করা। আল্লাহর সামনে বিনীত-বিনম্র হওয়াটাই তাদ্বারুরু', কিন্তু এটা কেবলই বিনয়-নম্রতা নয়। 'তাদ্বারুরু' বিষয়টি বুঝতে হলে, নিজেকে আপনি সমুদ্রের মাঝে কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, আপনি [ওই মাঝ দরিয়াতে] একাকি নৌকার ওপর। কল্পনা করুন, ওই অবস্থায় আপনার ওপর এসে গেছে এক প্রবল ঝড় —আর পাহাড় সমান ঢেউ চারপাশ থেকে আপনাকে ঘিরে ধরেছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ঠিক এই অবস্থায় আপনি আল্লাহর দিকে ফিরছেন এবং তাঁর সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করছেন। এমতাবস্থায়, কি পরিমাণ দীনতা, আল্লাহ ভীতি, তাঁর প্রতি নির্ভরতা ও বিনম্রতায় আপনার অন্তরটা ছেয়ে যাবে, তা একবার ভেবে দেখুন? এটাই তাদ্বারুরু'। আল্লাহ বলেন, তিনি বালা ও মুসবিতের এই সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, যাতে করে তিনি আমাদেরকে এই উন্নত মানসিক অবস্থা উপহার দিতে পারেন। আমাদের জন্য পরিস্থিতি জটিল করার প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তিনি এই অবস্থাগুলি সৃষ্টি করেন, যাতে করে আমরা তাঁর নৈকট্য লাভের অবস্থায় উন্নীত হতে পারি। অন্যথায় আমরা সে অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম না।

মিসরের জনগণ আজ বিনয়-নম্রতা, আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর ওপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার সেই অমূল্য নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। *আল্লাহু আকবার* —আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ এসব কষ্ট ও সংগ্রামের পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ

"আর দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল

---

[৭৯] তাদ্বারুরু (تَضَرُّع) অর্থ: বিনয়ী, বিনম্র বা নমনীয় হওয়া –(সম্পাদক)।

وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি, যাতে তারা (আনুগত্যের দিকে) ফিরে আসে।"

(কুরআন, ৭:১৬৮)

সুরা আল-ইমরানে আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

"তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো, একই রকম আঘাত তো অপর লোকদেরও (অর্থাৎ মুশরিকদের) লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলো পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে করে আল্লাহ মুমিনদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে শহীদ (সত্যের সাক্ষী) হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) সংগ্রাম করেছে এবং সবর ইখতিয়ার (তথা কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ) করেছে, তা এখনো প্রকাশ করেননি?" (কুরআন, ৩:১৪০-১৪২)

এখানে, আল্লাহ কষ্ট ও দুর্ভোগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে "*তামহিস*" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। স্বর্ণকে উত্তপ্ত করে সেটাকে বিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া বর্ণনার জন্য ঠিক এই *তামহিস* শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। যদিও স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু, কিন্তু উত্তপ্ত করা ছাড়া এটাকে পরিপূর্ণভাবে খাদ মুক্ত করা যায় না। উত্তপ্ত করার এই প্রক্রিয়াকে *তামহিস* বলে এবং এর মাধ্যমে স্বর্ণ থেকে সকল খাদ সরানো হয়। মুমিনদের সাথে আল্লাহ এটাই করেন। কষ্ট ও দুর্ভোগের মাধ্যমে মুমিনগণ পরিশুদ্ধ হন, যেমনিভাবে উত্তাপে স্বর্ণ হয় খাদমুক্ত।

আর এভাবেই মিসরীয়রা পরিশুদ্ধ হচ্ছে। অভ্যুত্থানের কিছুদিন আগেও মিসরের যুবকদেরকে বিশ্ব অকর্মণ্যই বিবেচনা করতো। আমরা তাদেরকে পথহারা-বিভ্রান্ত মনে করতাম এবং ভাবতাম তাদের কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। মনে করতাম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফেরা করা, নারীদেরকে শিস দেওয়া কিংবা ইন্টারনেট ক্যাফেগুলোতে হুক্কা টানার জীবনই তারা বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই কষ্ট ও দুর্ভোগ মিসরের যুবকদেরকে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

আর এই যুবকরাই এখন রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সলাত আদায় করছে, আকাশের দিকে দু'হাত তুলে নিজেদের রবের কাছে

ফরিয়াদ করছে। এই মানুষগুলি, কিছুদিন আগেও যাদের সলাতে খুঁজে পাওয়া যেত না, আজ সেনা বাহিনীর ট্যাংকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সেজদা দিচ্ছে। অভ্যুত্থানের কিছু দিন আগেও মিসরের মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝে বৈরিতা সর্বকালের সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিল। আজ মুসলিম ও খ্রিস্টান একে অপরের নিরাপত্তা এবং নিজেদের দেশের স্বার্থে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করছে। এই লোকেরাই, যারা গতকালও পরস্পরকে একবিন্দু বিশ্বাস করতো না, অথচ অভ্যুত্থানের পরীক্ষার আগুনে যখন তাদের উত্তপ্ত করা হলো, তখন তারাই পরিণত হয়েছে একে অপরের ভাই ও বোনে, যেন তারা একই দেহ তাদের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি এবং তাদের পাড়া পড়শিদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। যারা এই ক'দিন আগেও বেঁচে থাকতো কেবল মুঠোফোন, সীসা ও সিগারেটের জন্য, এই কঠিন অবস্থায় পড়ে আজ তারাই তাদের জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজি।

আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে বলেন:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"বলো, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত হতে কে বের করে এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বলো, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'"

(কুরআন, ১০:৩১)

আল্লাহই মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন। তিনিই আমাদেরকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরায় জীবিত করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যও ভাববেন না যে, এর কোনো এক মুহূর্তের ঘটনাও কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এসব ঘটছে। বরং এসব ঘটনার পেছনে রয়েছে সুগভীর, প্রগাঢ় এবং সুন্দরতম উদ্দেশ্য। যুগের পর যুগ মিসরের জনতা ভয়-ভীতির মধ্যে বসবাস করেছে। কিন্তু যখন আপনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভয়কে সুযোগ করে দেন, তখন আপনি দাস ছাড়া আর কিছুই নন। তাদের সবচেয়ে বড় ভীতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এবং তাকে পরাস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহপাক মিসরের জনগণকে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করেছেন। আল্লাহ মিসরবাসীকে মুক্ত

করেছেন, তাদের সুযোগ করে দিয়ে যে, তারা স্বৈরাচারের চোখে চোখ রেখে তাকে এবং গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়, মিসরের জনগণ ভয়ের মধ্যে বাস করে না। তাই মোবারক থাকুক বা না থাকুক, সে বাঁচুক অথবা না বাঁচুক, সেটা আর বিবেচ্য নয়। কারণ, মিসরের জনগণ ইতোমধ্যেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে।[৮০]

হুসনি মুবারক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সে একটা উপকরণ মাত্র। এমন এক উপকরণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ মিসরের জনগণ ও গোটা উম্মাহর জন্য নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মিসরের জনগণ এবং গোটা উম্মাহকে পরিশুদ্ধ, সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং স্বাধীন করার একটা হাতিয়ার মাত্র সে। আমরা মিসরে থাকি আর না থাকি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিসর আমাদের দেহের একটি অঙ্গ। মিসরের পরিশুদ্ধি মানে আমাদের উম্মাহর গোটা দেহেরই পরিশুদ্ধি। এটা আমার এবং আপনার পরিশুদ্ধি। এই পরিস্থিতি আমাদের নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিয়েছে যে, কিসের প্রতি আমরা আসক্ত-অনুরক্ত? কিসের ভয়ে আমরা ভীত? কিসের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, প্রচেষ্টা চালাচ্ছি? আমরা কোন নীতি আদর্শের পক্ষে? আমরা চলছিই কোন দিকে?

দেহ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বা অবচেতন হয়ে কোমাতে, তখন কেবল তাঁর অপরিসীম দয়া ও করুণায় তিনি আমাদের জেগে ওঠার ডাক দিয়েছেন। যেখানে এক সময় ছিল মৃত্যুর হিমশীতল নিশ্চলতা, সেখানে তিনি তাঁর অপার করুণায় আমাদের পুনরায় জীবন দান করেছেন। আমরা গাফেল-অমনোযোগী ছিলাম, তাই তিনি পাঠালেন সতর্কবার্তা। আমরা ছিলাম গভীর ঘুমে অবচেতন, তিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন। আমরা হয়ে ওঠেছিলাম দুনিয়া পূজারী। যে মুক্ত আত্মা আল্লাহর

[৮০] হুসনি মোবারকের পতনের পর জনগণের ভোটে মুহাম্মদ মুরসি ক্ষমতায় আসেন। পরবর্তীতে মুরসি ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বৈরাচারী শক্তি ক্ষমতায় ফিরে আসে। মুহাম্মদ মুরসি কারাগারে নির্যাতিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহপাক তাকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন। আরব বসন্তের দিনগুলিতে গোটা বিশ্বের ইসলাম প্রিয় মানুষের আবেগের প্রকাশিত হয়েছে। আরব বসন্ত বিশ্বের সব প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে নাড়া দেয়। বিশেষত, ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য যারা করেন, তাদের আরব বসন্ত শেষ হয়ে যায়নি। হক-বাতিলের সংঘাত চিরন্তন। এইসব উত্থান-পতন হকপন্থীদের আরও সুসংগঠিত করবে, নিজেদের দুর্বলতাগুলি উপলব্ধি করতে এবং আরও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে উপযুক্ত করে তুলবে। মহান আল্লাহ যেমন মুসা (আ.)-এর সাথে ছিলেন তেমনি তাদের সাথেও তিনি আছেন। অমানিশার অন্ধকারে তিনিই তাদের পথ দেখাবেন, সমুদ্র চিড়ে হলেও পথ করে দেবেন —"আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়ে আছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমরা বাহিনীই হবে বিজয়ী। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদের উপেক্ষা করো।" —(কুরআন, ৩৭:১৭১-১৭৪); আরও দ্রষ্টব্য কুরআন, ৫৮:১০-২২ —(সম্পাদক)।

সাথেই জুড়ে থাকে এবং কেবল তাঁকেই ভয় করে, তার চেয়ে আমরা পছন্দ করতাম দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীকে – তাই তিনি তা থেকে আমাদের মুক্ত করলেন।

ক'জন মানুষ তাদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষী হবে? আর ক'জন মানুষের কপালে সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার এমন ঘটনা ঘটবে, যখন তারা স্বৈরাচারকে এভাবে অবনমিত করা হবে, এভাবে পতনে বাধ্য করা হবে? আমরা কি নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করবো না যে, কেন আমাদেরকে এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য বেছে নেওয়া হলো? এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি, কি পরিবর্তন ও রূপান্তর আমরা নিজেদের জীবনে আনতে পারি, এই প্রশ্নগুলো কি আমাদের নিজেদেরকে করা উচিত নয়? কারণ, আমরা যদি মনে করি, এগুলো কেবল মিসরের জনগণের ব্যাপার, আমাদের জন্য এখানে কিছুই নেই, তাহলে পুরো বিষয়টির মর্ম বুঝতে আমরা নিদারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা ছিলাম ঘুমিয়ে, আর আল্লাহ আমাদেরকে জাগ্রত করেছেন।

আমরা ছিলাম মৃত, আল্লাহ চাইলেন আমাদেরকে প্রাণ দিতে।

আমাদেরকে এমন ঘোরের মধ্যে রাখা হয়েছে যে, আমরা ভাবি, আমরা বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত। আর সে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে এটাও একটা ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। শত্রু আমাদের নিজেদের মধ্যেই অবস্থান করছে। যাবতীয় বহিঃশত্রুগুলি আসলে আমাদের মধ্যস্থ রোগেরই বহিঃপ্রকাশ। তাই যদি বাহিরের এসব শত্রুকে জয় করতে হয়, তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে বসবাসরত শত্রুদেরকে জয় করতে হবে। এই কারণে কুরআন আমাদেরকে বলে দিচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"

(কুরআন, ১৩:১১)

সর্বপ্রথম আমাদেরকে লোভ, স্বার্থপরতা, *শির্‌ক*, চরম ভয়ভীতি, প্রেম-ভালোবাসা, আশা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরশীলতাকে জয় করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই *হুব্বুদ দুনিয়া* (তথা দুনিয়ার মহব্বতের) ওপর জয় লাভ করতে হবে। কারণ, আমাদের যাবতীয় রোগ এবং সকল নির্যাতনের মূল কারণ এটাই। বাস্তব জগতের ফেরাউনগুলোকে পরাস্ত করার আগে, আমাদের মাঝে বসবাসরত ফেরাউনগুলোকে আগে পরাস্ত করতে হবে। তাই মিসরের এই সংগ্রাম প্রকৃত অর্থেই মুক্তির সংগ্রাম। হ্যাঁ, কিন্তু কিসের থেকে মুক্তির সংগ্রাম? সত্যিকার অর্থে নির্যাতিত

কে? আপনি আর আমি কি আসলেই স্বাধীন ও মুক্ত? সত্যিকারের নির্যাতন কাকে বলে? এই প্রশ্নের জবাব ইবনে তাইমিয়া (র.) এভাবে দিয়েছেন, "সত্যিকার কারারুদ্ধ সে-ই, যার অন্তর আল্লাহর থেকে কারারুদ্ধ (অর্থাৎ সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে অক্ষম বা ব্যর্থ), আর প্রকৃত কয়েদি তো সে-ই, যার কামনা-বাসনা যাকে তার গোলাম বানিয়ে নিয়েছে।" (ইবনে কাইয়্যিম, আল-ওয়াবিল)

যখন আপনি আত্মিকভাবে স্বাধীন ও মুক্ত, তখন কাউকে আপনি এই স্বাধীনতা হরণের অধিকার ও সুযোগ দেবেন না। যখন আপনার আত্মা স্বাধীন, তখন আপনি হিম্মত রাখেন স্বৈরাচার ও তার সহযোগী পাণ্ডাদের উপেক্ষা করে সকল কিছুর প্রকৃত মালিক ও প্রভুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখতে। আপনি আত্মিকভাবে মুক্ত, তখন আপনাকে দাস বানানো অসম্ভব। কারণ, দাস বানানো যায় তাকেই, যার অন্তরে (দুনিয়ার প্রতি) মোহ ও আসক্তি রয়েছে। যে লোক সব সময় হারানো ভয়ে তাকে ভীত, তাকে ভয় দেখানো যায়। কারো ওপর তখনই আপনি নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যখন তার প্রয়োজনীয় কিংবা কামনাকৃত কোনো জিনিস কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। কিন্তু একটা জিনিস আছে, যা কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তিনি হলেন: আল্লাহ তা'আলা।

তাই আমরা যখন মিসরকে স্বাধীন ও মুক্ত করতে লড়াই করছি, তখন আরও বৃহত্তর পরিসরে এবং অধিকতর বাস্তব মাত্রায় এ লড়াই আমাদের নিজেদের মুক্ত করার লড়াইও বটে। এ লড়াই আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের নফসানিয়াত ও কামনা-বাসনার স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করার লড়াই। যেসব মিথ্যা, আসক্তি ও নির্ভরশীলতা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর আনুগত্য ও উপাসনা আমরা করি, সেসব থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই। এ লড়াই নিজেদের গোলামী থেকে নিজেদের মুক্ত করার লড়াই। আমরা মার্কিন ডলারের গোলাম হই কিংবা নিজেদের কামনা-বাসনা, পদ-মর্যাদা বা প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ অথবা ভয়-ভীতি যারই গোলাম হই না কেন – মিসরের পরিশুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে আমাদের সবার পরিশুদ্ধি।

তাই কুরআন আমাদের প্রকৃত সফলতার যে মূলসূত্র বাতলে দিয়েছে, তা দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: *সবর* (ধৈর্য, অধ্যবসায়) এবং *তাকওয়া* (শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(কুরআন, ৩:২০০)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সংগ্রামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

অতএব, মিসরে যা ঘটছে, তা যদি আমরা আমাদের সাথে সম্পর্কহীন কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনা হিসেবে দেখতে থাকি, আর নিজেদের ও নিজেদের জীবনকে সত্যিকার অর্থে পরিশুদ্ধ করা, তাকে পরীক্ষা ও বাস্তব পরিবর্তন করার কোনো উদ্যোগ না নেই, তাহলে এ পুরো ঘটনার মূল উদ্দেশ্যটাই আমরা আসলে উপলব্ধি করতে পারিনি।

সর্বোপরি, প্রতিদিন তো আর আমাদের চোখের সামনে সমুদ্রের বুক চিরে মুক্তির রাস্তা করে দেওয়া হবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেন:

"যখনই আমরা কোনো নবি কোনো জনপদে পাঠিয়েছি, তখনই আমরা সে জনপদের লোকদেরকে কষ্ট এবং দুর্ভোগে ফেলি, যাতে করে তারা বিনম্র হতে শিখে।" (কুরআন, ৭:৯৪)

বিনম্রতার এই শিক্ষা মানব আত্মাকে এতোটাই পরিশুদ্ধ করে যে, [স্বয়ং] আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে মুমিনগণকে আশ্বস্ত করেন এবং এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, এই জীবনে যে কষ্টেরই তারা মুখোমুখি হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য তাদেরকে সমৃদ্ধ ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা। তিনি বলেন:

"তোমরা যদি আঘাত পেয়ে থাকো, একই রকম আঘাত তো অপর লোকদেরও (অর্থাৎ মুশরিকদের) লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলো পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে করে আল্লাহ মুমিনদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে শহীদ (সত্যের সাক্ষী) হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।" (কুরআন, ৩:১৪০-১৪২)

আত্মশুদ্ধির এই সংগ্রামই আল্লাহর দিকে উত্তোরণের পথের সার নির্যাস। ত্যাগের মাধ্যমে এর সূচনা ঘটে আর সংগ্রামের ঘাম দিয়েই বাধিয়ে নিতে হয়। এটাই সে পথ, যে পথের বর্ণনা আল্লাহ এভাবে দেন:

"হে মানুষ! তুমি তোমার রবের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাকো, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।" (কুরআন, ৮৪:৬)

তোমার[৮১] উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

এই স্বাধীনতার অনুভূতি ব্যাখ্যা করে বুঝানো বেশ কঠিন। এটা খুবই গভীর এবং খুবই বাস্তব এক অনুভূতি। দ্বিধা-সংশয়, (মার্কেটিং-এর) শূন্য বাক্সগুলি আর অবাস্তব সব প্রতিমূর্তিগুলির দিকে আমি তোমায় দেখেছি – হে দুনিয়া। তুমি আমার চোখে পর্দার পর পর্দা চাপিয়ে গেছো। চেয়েছো আমায় জয় করতে, ধোঁকা দিতে, তোমার অগণিত মিথ্যার জাল আবদ্ধ করে তোমার দাসে পরিণত করতে।

বরং সত্য কথা হলো: তোমার দরজায় যখন এক ফোঁটা পানির জন্য কড়া নাড়ছিলাম, তখন তো তুমি আমাকে তা দিতে পারোনি। আমাকে পূর্ণ করার জন্য তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে কেবল ব্যর্থ মিনতিই করে গেছি আমি।

আমি এখন স্পষ্টভাবে দেখতে পারছি, তা কেবল অবিরাম নৈরাশ্যের আঘাতই খোদাই করতে সক্ষম। আর আমি বসে রই, তোমার সমর্থক পরিবেষ্টিত হয়ে, তোমার এই মিথ্যুকদের পাঠানোই হয়েছে আমাকে শেকলে বাঁধতে। কিন্তু আমি আর তোমার বন্দি থাকবো না। আমি আর ওই ছোট্ট বালিকা হবো না, শুয়ে শুয়ে সারারাত যে কেবল তোমার কথা ভাবে। আমি আর ওই মনভাঙা সেই ছোট্ট শিশু নই যে, তোমার জন্য কেঁদে নিজের চোখের জল নষ্ট করবো। আমার ব্যর্থ প্রেম আমাকে আর ভেঙে চুরমার করতে পারবে না। তুমি আমাকে ভাঙতে পারবে না। তোমার জাকজমক আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সামনে আমি মাথা নত করবো না। তোমার মেকি তখতের সামনে দাঁড়ানো অনুগত প্রজাটি আমি আর নই। আমার অশ্রুর ওপর আর তোমার নেই কোনো অধিকার। আমার হৃদয় আর তোমার বেদি নয়।

এখানে আর তুমি থাকতে পারো না।

---

[৮১] লেখিকা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করে – এ পত্র লিখেছেন – (সম্পাদক)।

বহু পথ পাড়ি দিয়ে আজ আমি এখানে পৌঁছেছি। কখনো আমি পাড়ি দিয়েছি মরুভূমির পর মরুভূমি, আর ওই কষ্টকর যাত্রাতে আমার প্রয়োজন ছিল কেবল এক ফোঁটা পানি, যা তুমি আমায় দিতে পারোনি। কখনো পড়েছি প্রবল ঝড়ে, যেখানে পথ চলার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল সামান্য আলো। বারবার চাওয়া সত্ত্বেও তুমি আমায় তা দিতে পারোনি। তোমার আছে কেবল প্রতারণাময় জাকজমক, দম্ভ আর অস্থায়ী সামগ্রী। আর তাই আমি নিজেকে পেয়েছি পানিহীন মরুভূমিতে, আলোহীন অন্ধকারে বারবার। কিন্তু আমি আর নই তোমার দাস। কারণ, আমাকে এসব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একজন এসেছিলেন। একজন, যিনি এসেছিলেন আমাকে দাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে। আর আমাকে সকল দাসের প্রভু যিনি, তাঁর দাসত্বে নিয়ে আসতে।

শোকাচ্ছন্ন আমি

মাথা উঁচু করে দেখলাম আমি
আরও একটি বার
শুধুই দু'চোখ মেলে দেখতে
সূর্যটা ডুবে গেছে
গাছগুলো সব ঘুমিয়ে পড়েছে
আর সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরছে

শুধুই শোকাচ্ছন্ন আমি
পরিষ্কার সেই আকাশ
আজ কুয়াশায় আচ্ছন্ন।
আমার পথ, আমি আজ আর দেখতে পাই না।
কেন এই বৃথা চেষ্টা ... সবই যখন ধূসর?
শোকাচ্ছন্ন আমি।

আজ আমি শোকাচ্ছন্ন
হারিয়ে গেছে যা, তার জন্য।
বিস্মৃত জাতি আমার
আজও হাঁটু গেড়ে বসে আছে
এই বসন্তে, এক তুষার দেবতার সামনে
শোকাচ্ছন্ন আমি।

তারা দু'আ করতে ভুলে গেছে
কার কাছে দু'আ করবে, তাও বিস্মৃত হয়েছে।
সারবস্তু হারিয়ে গেছে
জাগতিক আচার সর্বস্বতার ভিড়ে,
অর্থহীন প্রতীকের আড়ালে।
তাদের অন্তরগুলো ... আজ ভীষণ ক্লান্ত,
পরিশ্রান্ত ও জীর্ণ তারা

শোকাচ্ছন্ন আমি।

আমরা সেই জাতি
যারা পরাস্ত হতে পারে ... কিন্তু বশীভূত হবার নয়।
আর কোনো না কোনোভাবে
আমি আমার রক্তের মাঝে আলোড়ন অনুভব করছি আবার।
আমি ঘুড়ে দাঁড়াবো।
চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।
এবং আমার দুঃখকে উপেক্ষা করে
আমি দেখবোই ...
এমন এক জাতি আছে, যাকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।
আছে আনুগত্য ... যা তুমি কিনতে সক্ষম নও।
জমিন হয়তো দখল করা যায় ...
কিন্তু অন্তরকে কাবু করা সম্ভব নয়।
আমার সকল অশ্রু উপেক্ষা করে
আমি উপলব্ধি করবোই ...
আজ আমার লোকেরা কাঁদছে।
কিন্তু আগামীকাল ... মৃত্যুর মৃত্যু হবে।
আর তাদের অশ্রু জন্ম দেবে এমন জমিনের
যেখানে ... "তাদের থাকবে না কোনো ভয়
আর না তারা হবে বিচলিত।" (কুরআন, ২:২৬২)

ভাবনাগুলি মোর

আশ্চর্য এক করুন রাগিনীতে ভরে আছে আজ চারদিক। এমন এক বিষন্নতা, যা আপনাকে রিক্ত করে না, করে তোলে নিঃসঙ্গ। এমনকি দেয় না অসম্পূর্ণতার অনুভূতি। বরং তা সমস্ত উদ্বেগ-উদ্বিগ্নতা হরণ করে। উৎসারিত হয় গভীরতম উপলব্ধি, এমনকি স্বীকৃতির স্তর হতে।

আমি আজ এ ছবিখানির দিকে তাকালাম, আর যতবারই তাকালাম অশ্রু ভরে ওঠলো আমার চোখ দু'টিতে। সমুদ্র তীরের সূর্যাস্তের এক ছবি। অত্যাশ্চর্য তার রূপ। ওপরে লেখা আয়াতখানি, "*রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাক* (হে আমাদের রব, কিছুই আপনি অযথা বানাননি, সুবহানাক)।"

আর ব্যস, এতটুকুই। দুঃখ, দুর্ঘটনা, হাসি, শান্তি, যন্ত্রণা, প্রেম, ক্ষতি এবং উৎসর্গ থেকে শুরু করে কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। কোনো কিছুই নয় উদ্দেশ্যহীন। না কোনো ভুল বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অথবা উদ্দেশ্যবিহীন কিছু ঘটনা।

আমি সে ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং হঠাৎ-ই কেমন যেন স্মৃতিকাতরতায় ডুবে গেলাম। হারিয়ে গেলাম এমন সময়ে, যার কোনো স্মৃতিই আমার নেই।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

(কুরআন, ৭:১৭২)

"আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে আনলেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী থাকলাম।' এটা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা

তো এ ভিষয়ে অবহিত ছিলাম
না।' "

কারো অনুপস্থিতির বেদনা আমাকে আচ্ছন্ন করছিল। তাঁর অনুপস্থিতি, তাঁর সান্নিধ্যে না থাকার বেদনা। এমন এক সময়ের অভাব বোধ, যা এক সময় ছিল অথবা ভবিষ্যতে হবে। সে মুহূর্তটি এতই নিশ্চিত যে, যেন এটা ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই যতবার আল্লাহ কুরআনে আখিরাতের কথা উল্লেখ করেছেন, ততবারই তিনি অতীতকাল ব্যবহার করেছেন।

যখন আপনি কোনো শিল্পকর্মের প্রেমে পড়েন, তখন ওই শিল্পীর সাথে সাক্ষাত করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সূর্যাস্ত, সাগরের বুকে উকি মারা এক টুকরো পূর্ণিমার চাঁদ, বিমান থেকে দেখা মেঘমালা, রোলি (*Raleigh*)-তে শরতের বনের দৃশ্য এবং প্রথম পড়া তুষারের [চমৎকার দৃশ্য সম্বলিত] গ্যালারির [মনোযোগী] এক ছাত্র আমি।

আর এই শিল্পীর দেখার পাবার জন্য আমি চরমভাবে ব্যাকুল হয়ে আছি।

"ওই দিন কিছু চেহারা হবে আলোকজ্জ্বল, তাকিয়ে থাকবে তাদের রবের পানে।" (কুরআন, ৭৫:২২-২৩)

ভালোবাসার ভাবনা

এই সব প্রেম-ভালোবাসা। এর প্রতিটি অংশ। এই পৃথিবীর প্রত্যেক ধরনের ভালোবাসার প্রতিটি অংশ। যে প্রেম-ভালোবাসা কবিদের কবিতা লেখায়। মনোমুগ্ধকর কাহিনী নিয়ে রচিত সাহিত্য সমগ্রের ভালোবাসা। গানের মধ্যে ভালোবাসা। যে প্রেম তারা সিনেমাগুলোতে ধারণ করতে চায়। সন্তানের জন্য মায়ের ভালোবাসা। পিতার জন্য কন্যার ভালোবাসা। যে প্রেম মুক্তি দেয়। যে প্রেম দাসত্বে আবদ্ধ করে। যে ভালোবাসা আপনি অর্জন করেন। যে ভালোবাসা আপনি হারান। যে ভালোবাসার পেছনে আপনি ছুটেন। যে ভালোবাসার জন্য আপনি মরেন। যে ভালোবাসা, আপনি জানেন, তার জন্য আপনি মরতে পারেন। যে ভালোসার জন্য পুরুষেরা জীবন দেয়। যে ভালোবাসার টানে তরবারিগুলো কত মৃত্যুর কারণ হয়েছে। আছে রূপকথার ভালোবাসা বা ট্রাজেডির বেদনা-বিধুর ভালোবাসা। ...

এসবই হৃদয়ের উঠে আসা ভাব-চিন্তন।

একটি প্রতিধ্বণি; যা একটি উৎস থেকেই উৎসারিত। এমন এক প্রেম-মহব্বত, যা আপনি জানেন, আর আমিও জানি। জানি এ কারণেই যে, কোনোকিছু জানার আগ থেকেই একে আমরা জানি। আমরা ভালোবাসার আগেই তো আমাদের ভালোবাসা হয়েছে। কি দান করবেন বা দান করা জিনিসটাই বা কি, তা জানার আগেই তো আপনাকে দান করা হয়েছে। এটাই সে ভালোবাসা, যা জানার জন্য আপনার হৃদয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটাই সে ভালোবাসা, যার থেকে সকল প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি এবং যা তার সবকে ধারণ করে। এটাই সে ভালোবাসা, যা সবকিছুর আগে থেকেই ছিল – আর যা থেকে যাবে সবকিছু লয় পাওয়ার পরও।

এটাই সে ভালোবাসা, যা ছিল সকল কিছুর আগে ...... আর যা থেকে যাবে সকল প্রতিধ্বণি মিলিয়ে যাওয়ার পরও।

শান্তির জন্য আজ আমি প্রার্থনা করেছি

শান্তির জন্য প্রার্থনারত অবস্থায় আমি নিজেকে পেলাম আজ

নিজ অন্তরের ভেতরে-বাহিরে আনাগোনা হলো হাজারো বার।

আমি জানি, "তুমি শুনেছো আমায়।

জানি আমি, ছিলাম না আমি একাকি কক্ষে হেথায়।

ভীত হওয়ার ভয়ে কম্পিত হতে হতে

মর্মভেদী একাকিত্বের মাঝে।

হাত তুলে হাঁটু গেড়ে কাঁদছিলাম তোমারই পানে

বদনখানি মোর নত হয়ে জমিনের-ই পরে।

পারতাম যদি হতে আরও নত, কসম, হতাম তা-ই আমি।

কারণ, সব থেকে সত্যিকারের অসহায়ত্ব একেই বলে

এ সেই অসহায়ত্ব যে আর কিছুই চেনে না, জানে না, না একটা বৃক্ষপল্লব, না কান্না, না কোনো হাসি

অস্তিত্ববান নয় তাঁকে ছাড়া কিছুই।

আমি আজ কিছু শিখছিলাম।

আবারও।

এই তো দুনিয়া। আরে এই তো দুনিয়া, নয় কোনো আরামের স্থান, কেবলই মিছে চকমকি।

এই দুনিয়া এমনই এক ভূঁই, যেখানে শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত হতে হয়

এমনই এক আবাস, যেখানে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা রয়।

যেথায় শৈত্য বয়ে যায়।

এতদূর শীতল, যেন ভেতরটা কাঁপিয়ে দেয়।

এ এমন এক স্থান, যেখানে ভালোবাসার মানুষদের ছেড়ে যেতে হয়।

অত্যধিক সংযুক্তির স্থান নয় এটা, যদি হয়ে পড়ো কভু, থাকবে না তাতে স্থিতি, ছেড়ে যাবে তা যবে, কষ্টখানিই রয়ে যাবে।

এখানে আনন্দ-বিষন্নতা যাত্রা-পালার শিল্পী মাত্র তাদের

পরবর্তী সংলাপের জন্যে ...

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তারা মঞ্চে নিজেদের আসনের জন্য।

এখানে মধ্যাকর্ষণ তোমায় আছড়ে ফেলে, দুর্বলতা করে রক্তাক্ত।

এখানে দুঃখের আস্তানা। কেননা, তা-ই আবশ্যক।

বহমান অশ্রু তোমায় মনে করায় বিষাদহীন ঠিকানার কথা।

কান্না-বিষাদের নেই ঠাই।

আর সেটাই কি কাঙ্ক্ষিত আবাস নয়? জান্নাতই কি সে স্থান নয়?

তার পরিচয় রব্বে করিম আল্লাহ বারবার দিয়েছেন দুটি দিক থেকে:

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

থাকবে না তাদের কোনো ভয় ... আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে।

তবে আমি এখনো এখানেই আছি, তাই নয় কি?

দেহে আমার ক্ষতচিহ্ন তা-ই মনে করিয়ে দেয়।

বাহুতে তার রেখে যাওয়া পোড়া-ক্ষত, যা আমি ভালোবাসি। কারণ, তা-ও আমায় মনে করায় –আমার দুর্বলতা।

কতই না মানবীয়।

আমি অগ্নিবিদ্ধ হই। রক্তাক্ত হই। বিধ্বস্ত হই। আমি ক্ষম-বিক্ষত হই।

হ্যাঁ। আমি এখানেই অবস্থানরত। এই সেই স্থান, যেখানে আমি পতিত হই। ভেঙে পড়ি কান্নায়।

এখানেও সেই একইভাবে "তুমি" পূর্ণ করেছো সেই কক্ষখানে, বিনয়ে আমাকে উন্নত করেছো। দান করেছো আমার অক্ষমতার জ্ঞান আর "তোমার" অপরিহার্যতার মর্মভেদী অনুভূতি।

আর তারপর তার দেখভালের দায়িত্বও তুমি নিয়েছো।

নিশ্চিতই তুমি তা করেছো।

হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই (তুমি তার দেখভাল করেছো)।

নবি ইউনুসের মতো, আর নবি মুসা ও তার মায়ের মতো। তুমিই তার ব্যবস্থা করেছো।

তুমিই তো শান্তিময়তার প্রশান্তি।

তুমিই তো শক্তিমানের শক্তি।

তুমি তো মিথ্যার এই প্রলয়ে সত্যের একমাত্র আলোকবর্তিকা

আর তাই, শান্তির আশায় আমি আমায় পেলাম আজ প্রার্থনারত অবস্থায়।

জীবনের টানাপোড়ন

আমি আজ আমি "আপনার"[৮২] কথা ভেবেছি

আমি "আপনার" কথা ভেবেছি এবং আমায় "আপনি" বলেছেন, তা স্মরণ করেছি।

সব চেয়ে উত্তমভাবে

"আপনি" শান্ত করেছেন আমার ব্যাকুল হৃদয়খানি

"আপনি" আমায় বলেছেন ওই শব্দমালা, যা আমি আজও ধারণ করে আছি।

সেই শব্দমালা আমায় উচ্চ করে, পূর্ণ করে, আমার ক্লান্তি হরণ করে।

কারণ, যত না যন্ত্রণা তার থেকেও বেশি ক্লান্ত আমি

মনে হয়, আমি যেন হাজার বছর বাস করছি এই একই কাহিনীর মাঝে

আর এখন আমি ঘুমোতে চাই

ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আমি

কাহিনীর সমাপ্তির জন্য এখন আমি প্রস্তুত

"আপনার" সান্নিধ্যের প্রশান্তির জন্য আমি প্রস্তুত।

আর "আপনার" কণ্ঠের আওয়াজ

আমায় বলেছেন, তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তুমি সফল হয়েছো, তুমি তোমার আরাধ্যে উপনীত হয়েছো

কিন্তু আমি এই আবাস চিনি

---

[৮২] এখানে লেখিকা ইংরেজি *You* দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করেছেন। বাংলা ভাষায় *Capital Letter* না থাকায় অনুবাদ করতে গিয়ে যথাস্থানে "আপনি", "আপনার" শব্দাবলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে -(সম্পাদক)।

আমি আগেও এসেছি এখানে আমি

আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি

ঘুমাবো গভীর ঘুমে

দয়া করে, জিজ্ঞাসা করো না

দয়া করে, কোনো প্রশ্ন করো না

শুধুই ঘুমাতে দাও আমায়

জবানে আমার তোমার শব্দমালা নিয়ে কেবল ঘুমাতে দাও আমায়ঃ

"হে মানব, তুমি তোমার রবের নিকট পৌঁছা অবধি কঠোর সাধনা করে যাচ্ছো, অতঃপর তাঁর সাক্ষাতে তুমি উপস্থিত হবে।" (কুরআন, ৮৪:৬)

নৈঃশব্দ

ভোরের সূর্য সত্যই কি অপূর্ব। এটা গাছগুলিকে এমন কিছু দেয়, যা তুমি দিনের অন্য কোনো সময় দেখবে না। আমার মনে হয়, আমরা সবাই একই জিনিস কামনা করিঃ কোলাহলহীন, নিঃশব্দ, শান্তি। হয়তো এক মুহূর্তের জন্য হলেও চোখ দুটো বন্ধ করতে; আর তারপর প্রশান্তি।

এক মুহূর্তের জন্য হলেও অনুভব করতে চাই না কোনো কিছুর জন্য দুশ্চিন্তা বা হতে দুঃখিত কোনো কিছুর জন্য। যা নেই বা যা পাবো না, তা কামনায় কষ্ট পেতে। কেবলই ভাবনাহীন, দুশ্চিন্তাহীন উপস্থিতি। নিস্তরঙ্গ। নিঃশব্দ। অন্তরের গহীনে। হয়তো সেটাই দিনের এ সময়টার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্যঃ নৈঃশব্দ। আর আশা হয়তো আজকের দিন হবে ভিন্নতর কিছু।

মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করো

বলো আমায়, আমি হারিয়ে যাই

বলো আমায়, তোমার উপস্থিতিতে আমি হারিয়ে ফেলতে পারি নিজেকে

প্রকৃত আত্ম-সমর্পণের অভিভূতকারী মুহূর্তে

বলো আমায়, আমি চিরকাল দেউলিয়াই থেকে যেতে পারি

তোমারই মাঝে

তোমারই জন্য

তোমারই সাথে।

বলো আমায়, আমি এ অবস্থায় চিরকাল থেকে যেতে পারি

দূরে, যখন আমি এখানেই

নবি (ﷺ) কি বলেননি: "মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করো?"

প্রথমে আমি ভাবলাম, এটা বুঝি এক স্মরণিকা

মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার সাথে সাক্ষাতেরই কথা।

কিন্তু তারপর আমি ভাবলাম, মৃত্যুও আগে মৃত্যুর জন্য কতই না আমার কামনা:

এমন এক আত্মার অধিকারী হওয়া, যা আর দুনিয়ায় পড়ে নেই – যদিও দেহখানি দুনিয়াতেই রয়।

এমন এক হৃদয়, যা দুনিয়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, যদিও পাগুলিকে হাঁটতে হয় দুনিয়ার রাস্তা দিয়ে।

এমন নফসের অধিকারী হতে, যা স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে সন্তুষ্ট ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত, যদিও ভঙ্গুর খোলসখানি তখনো অটুট।

এমন আত্মা, যা ইতোমধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেছে – সেখানে পৌঁছার আগেই।

নির্লিপ্ত এক আত্মা।

অকৃত্রিম, গভীরতম, নিখাঁদ এক নফসে মুতমায়িন্না (কুরআন ৮৯:২৭)

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর প্রতি, যিনি বলেছেন, "যে এই জীবনের জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে আখিরাতেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

রক্ষা করো আমায়

তোমার করুণা ছাড়া আমার ভরসা করার কিছুই নেই – একদম কিছুই নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার দরজার সামনে ভাঙা-চোরা জঞ্জাল নিয়ে[৮৩] ... তা সত্ত্বেও তুমি উন্মুক্ত, অবারিত। রক্ষা করো আমায় এই ঝড়ের কবল থেকে। তোমার বান্দাদের মাঝে, আমিই যে সবচেয়ে অসহায়। আমি পথ হারিয়েছি, পথ ভুলে (দুনিয়া নামক) এই বনের মাঝে এদিক ওদিক ঘুরছি। কিন্তু সব গাছই আমার কাছে একই মনে হয়, সব রাস্তাই আমাকে কেবল রাস্তার শুরুতেই ফিরিয়ে আনছে। এই বনে যে পথ হারিয়েছে একবার, সে আর পথের দিশা পায় না, কেবল তারাই –যাদের তুমি রক্ষা করো, তারা ছাড়া। রক্ষা করো আমায়, কারণ, এ কথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, নিজেকে বাঁচাতে আমি অক্ষম।

[৮৩] ভাঙা-চোরা জঞ্জাল বলতে লেখিকা এখানে নিজের দুর্বল আমল-ইবাদত, দু'আ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন –(সম্পাদক)।

আমার হৃদয় উন্মুক্ত এক গ্রন্থ

আমার হৃদয় উন্মুক্ত এক গ্রন্থ,
আমার কাহিনী, যাকে অবারিত করেছে।
জানিয়ে দাও, তোমার শিক্ষা হয়েছে।
প্রতিবারই তুমি শিখতে থাকবে
অপূর্ণতার মাঝে যে তুমি পূর্ণতা পেতে চাও।

খড়কুটার ঘরে তুমি আশ্রয় তালাশ করো।
আর যখন ঝড় এলো
তুমি অরক্ষিত ও নিঃসঙ্গ
উন্মোচিত।
বছরের পর বছর তুমি গ্রাস করেছো ...
কিন্তু তা শূন্যতার বেশি কিছু ছিল না।
আর তুমি অবাক হলে, তা তোমার রিক্ত করে গেলো কেন।

তারা তোমাকে গল্পের পর গল্প বলেছে
আর তুমি তাদের বিশ্বাস করেছো ...
তারপর অপেক্ষায় ছিলে রূপকথার পরীর
তোমার মাঝে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য।

আর এখনো তুমি সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত
কাহিনীটাকে সত্য করার জন্য।
ছাড়ো এসব
এ থেকেও উত্তম কাহিনী যে আছে
তা যে কোনো অলীক গল্প নয়
বরং তা অকৃত্রিম, বাস্তব।

এ গল্পে নায়ক কখনো মরে না
রক্তাক্ত হয় না, কান্নায় ভেঙে পড়ে না
সত্য কাহিনীখানি খুঁজে নাও।
আত্মস্থ করো।
হৃদয়ের মনিকোঠায় লিখে রাখো।
আর তারপর
তা পড়তে দাও গোটা দুনিয়াকে।
[কেননা], তোমার হৃদয় যে উন্মুক্ত এক গ্রন্থ।

ছুরিকাঘাত

ছোরার আঘাতে দুঃখ করো না।

তোমাকে মুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

ওইসব শৃঙ্খল থেকে, যা বেঁধে রেখেছে তোমায় দুনিয়ার সাথে

মানুষের ছায়ায় আটকে রাখা জিঞ্জির হতে।

মরীচিকা পানি তোমার তৃষ্ণা মেটাবে না

যদিও তা তৃষ্ণার্তের কাছে পরম মনোহর।

আমার ভয় হয়। পরবর্তী জীবনকে কখনোই না জানতে পারার ভয়।

স্বতন্ত্র সে জীবন, পুরোপুরি ভিন্ন।

আমি যদি এ (নশ্বর) জীবন পরিত্যাগ করিঃ তবে কি তুমি আমায় (সন্ধান দেবে) মহোত্তর জীবনের?

(যে জীবন) বেদনা, কামনা ও হারানোর উর্ধ্বে।

আমি যা কিছু জানি, তার উর্ধ্বে।

আমাকে নিয়ে চলো আরও উঁচুতে, মুক্ত করো আমায় পৃথিবীর বাঁধন হতে,

এ তো ভ্যাকসিনের মতো, সবল করবে বলে কিছু সময়ের জন্য এটা তোমায় অসুস্থ করে।

ছোরার আঘাতের যন্ত্রণা ক্ষণিকের।

আর মুক্তি সে তো চিরকালের।

আমার অবস্থান

আমার অস্থিমজ্জা বিলীন হয়ে যেতে চায়

পেশীগুলি যেন হাল ছেড়ে দিতে চায়

এ দেহখানি যেন আর চলতে চাইছে না।

অবিরাম এই পথ চলা,

এই সংগ্রাম

এই অবিরাম দ্বন্দ্ব

নিশ্বাসের জন্য

জীবনের জন্য।

রং তুলি দিয়ে মন আমার জন্য (জীবনের) এক বর্ণিল ছবি এঁকেছিল,

কিন্তু এখন এর সবই যেন বিবর্ণ সাদা-কালো।

(জগতে) বৃক্ষরাজি সব আনত, পরিশ্রান্ত, সংকুচিত।

আমার অন্তরও তেমনই

তা সত্ত্বেও চিন্তাগুলো আমার উচ্চারণ অব্যাহত রাখে

অবিরাম পথ চলে

সংগ্রাম করতে থাকে

সংঘাতে লিপ্ত হয়

নিঃশ্বাসের জন্য

জীবনের জন্য।

এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ চিত্র তুমি কিভাবে মুছে দেবে?

এত বাস্তব?

আমায় বলো, কিভাবে নিজেকে আমি এ থেকে মুছে ফেলবো?

আর কিভাবে আমার এই শ্রান্ত-ক্লান্ত পদযুগলকে বিশ্রাম দেবো?

আমি দেখতে থাকি

কেবলই হোঁচট খাচ্ছি,

হাঁটছি না।

এলোমেলো উচ্চারণ

কথামালা নয়।

আমার বুকের মাঝে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা

নীরবতা, দুঃখ, অস্থিরতা হতে যার জন্ম

আমি ছাড়া আর কে আছে, যার আছে এর অধিকার?

আমি ছাড়া আর কে জানে নাম তার?

অনুতপ্ত আমি আমার উদাসীনতায়

প্রত্যুষের অবসন্নতায়

অরণ্য মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি

খুঁজে ফিরছি আমার অবস্থান।

পৌঁছালো কি আমার কাছে প্রেরণার কোনো বাণী?

এ কার কণ্ঠস্বর শুনি আমি?

আমার কণ্ঠস্বর, সেতো কর্কশ আর কান ফাটানো।

আর কে তবে জানবে আমার নাম?

শুধু তাঁরই মহান কৃপায়

আত্মা কথা বলে

দেহ ও মন যখন

আমার অনুভূতিহীন,

কোনোরকম মন্থর পথ চলছে।

দয়া করে এসো,

আমার চিন্তাগুলোকে শান্ত করতে হলেও এসো।

অরণ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি আমি

ডানায় ভর করে

খুঁজে বেড়াচ্ছি এখানো আমার অবস্থান।

আমি আর

চলছি না

সংগ্রাম করছি না

দ্বন্দ্ব-সংঘাতেও নেই আমি

নিঃশ্বাসের ওপর জয়ী হয়েছি[৮৪]

আমি আমার জীবনকে জয় করেছি।[৮৫]

[৮৪] নিঃশ্বাসের ওপর জয়ী হয়েছি – বলে লেখিকা এখানে জীবনের অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলির উর্ধ্বে ওঠার কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানে নিঃশ্বাস প্রতীকী। যেসব বস্তুগত বিষয়কে নিঃশ্বাসের মতো অপরিহার্য মনে করা হয়, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে – (সম্পাদক)।

[৮৫] এ কবিতাগুলি লেখিকা জীবনের উদ্দেশ্য এবং তা না জানার বেদনা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে লেখেন – (সম্পাদক)।

অবিরাম পথ চলা

প্রতিদিনই আমি নিকটবর্তী হচ্ছি আমাদের সাক্ষাতের ক্ষণটির
মনে হচ্ছে যেন এ পথে আমি হাজার বছর ধরে
তোমার পানে চলছি ...
আর তবুও আজও পৌঁছানো হয়নি সেখানে।
এত কাছে তবুও কত দূরে এখনো।

তবু আমি চলতে থাকি
ঝরে পড়ুক যতো অশ্রু,
বয়ে যাক যতো ঝড়ো হাওয়া,
ক্ষত-বিক্ষত জানুসন্ধি আর ভেঙে পড়া অস্থি-মজ্জা সত্ত্বেও
সেইসব যন্ত্রণা আর আঘাত সত্ত্বেও, যা এ অন্তরকে এনেছে আজিকার অবস্থায়,
আমি চলতে থাকি ...
তোমারই পানে।
একটিই মাত্র দিক আছে,
কেবল একটিই দিক:
শুধু তোমারই পানে।
তোমা হতে আগমন আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন
কিছুই নেই আমার।
একেবারে কিছুই নেই।
আমার ক্ষুদ্রতার পরিসীমা।
আমি চলতেই থাকি

কেননা, প্রতিটি সূর্যাস্তের পর আসে নয়া সূর্যোদয়;
প্রতিটি ঝড়ের পর থাকে আশ্রয়,
প্রতিটি পতনে থাকে ওঠে দাঁড়ানোর প্রেরণা,
প্রতিটি অশ্রুবিন্দুর পর আসে দৃষ্টির স্বচ্ছতা,

আর আঘাতে জর্জরিত আপনার প্রতিটি ক্ষতই সময়ে সেরে ওঠে সৃষ্টি হয়
উন্নতর-শক্তিশালী ত্বক আগের চেয়ে।

আমি চলতে থাকি
কারণ, কসম তোমার, হে আল্লাহ, তোমার দয়া ছাড়া
আমার আর কিছুই নেই।
তোমার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই
তোমার শব্দমালা
তোমার প্রতিশ্রুতিঃ

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ
رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

(কুরআন, ৮৪:৬)

“হে মানুষ! তোমাকে তোমার
রবের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত
কঠোর সাধনা করতে হবে, কঠিন
পরিশ্রম, অতঃপর তুমি তাঁর
সাক্ষাৎ লাভ করবে।”[৮৬]

[৮৬] “অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে” –এই বাকাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হলোঃ “তাঁর সাক্ষাৎ” দ্বারা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ বুঝানো হয়েছে। অপরটি হলো এর দ্বারা মানুষ তার আমলের সাক্ষাৎ লাভ করবে বলে বুঝানো হয়েছে। উভয়টিই প্রযোজ্য – (সম্পাদক)।